প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দুর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দুর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, 2018

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ বাংলা　　স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম : PGBG

পর্যায় : 1-4

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় **1**	অধ্যাপিকা রেখা মৈত্র	অধ্যাপক নির্মল দাস
পর্যায় **2**	অধ্যাপিকা মীনা দাঁ	অধ্যাপক নির্মল দাস
পর্যায় **3**	অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী	অধ্যাপক নির্মল দাস
পর্যায় **4**	ড. শিবানী ঘোষ	ড. মননকুমার মণ্ডল

পরিমার্জন, সংশোধন ও পুনঃসম্পাদনা ঃ

ড. সাইফুল্লা, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

ড. মননকুমার মণ্ডল, স্কুল অব হিউম্যানিটিস্, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG-2

ভাষা বিজ্ঞান ও সাহিত্যতত্ত্ব

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়
1

একক 1 ❑ ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস 7 - 32
একক 2 ❑ ভাষার শ্রেণিবিভাগ 33 - 39

পর্যায়
2

একক 3 ❑ প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান 40 - 60
একক 4 ❑ ধ্বনিবিজ্ঞান 61 - 85
একক 5 ❑ ধ্বনিতত্ত্ব 86 - 110
একক 6 ❑ রূপতত্ত্ব 111 - 139

পর্যায়
3

একক 7 ❑ অন্বয় ও অন্বয়তত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ ধারণা 140 - 147
একক 8 ❑ প্রথানুযায়ী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয়গত নানা দিক 148 - 159
একক 9 ❑ প্রথানুযায়ী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকার 160 - 174
একক 10 ❑ সঞ্জননীতত্ত্ব 175 - 186

একক 11 ❑ সঞ্জননী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয় 187 - 208
একক 12 ❑ সমাজভাষাবিজ্ঞান : প্রাথমিক ধারণা 209 - 215
একক 13 ❑ বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান 216 - 225
একক 14 ❑ উপভাষা তত্ত্ব 226 - 234
একক 15 ❑ ভাষা পরিকল্পনা 235 - 241
একক 16 ❑ বাংলা ভাষার সংস্কার ও পরিকল্পনা 242 - 253

পর্যায়
4

একক 17 ❑ রসবাদ, ধ্বনিবাদ ও বক্রোক্তিবাদ 254 - 266
একক 18 ❑ পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব 267 - 288

একক ১ ❐ ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ প্রাচীন যুগ

১.৪ মধ্যযুগ এবং প্রাক্-আধুনিক পর্ব

১.৫ আধুনিক পর্ব

১.৫.১ ঊনবিংশ শতক

১.৫.২ বিংশ শতাব্দী

১.৫.৩ আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা

১.৫.৪ নোয়াম চমস্কি

১.৬ অনুশীলনী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠ করলে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এই পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাচীন কালে গ্রিস ও ভারতের মতো প্রাচীন দেশগুলোতে ভাষা সম্পর্কে কী ধারণা ছিল সে সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা।
- এই এককে প্রাচীন যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে ভারত ও পাশ্চাত্ত দেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার একটা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে।
- এই এককের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা কীভাবে আধুনিক পর্বে প্রবেশ করল তা জানানো।
- এই এককের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক পর্বে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি ও প্রকরণে যত বৈচিত্র্য ঘটেছে তার পরিচয় দেওয়া।

১.২ প্রস্তাবনা

- শিক্ষার ভাষাবিজ্ঞান একালে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এই বিদ্যার চর্চা নিতান্ত আধুনিক নয় এর একটা ধারাবাহিক ও প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এই এককে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
- অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক দিক পরিবর্তন ঘটে। এই এককে এই দিক্ পরিবর্তনের আগেকার অবস্থাটা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসকে আমরা কয়েকটি যুগে ভাগ করতে পারি—(১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ এবং প্রাক্-আধুনিক পর্ব (৩) আধুনিক যুগ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী।

ভাষাবিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে মানুষের ভাষার অথবা বিভিন্ন ভাষাভাষীদের ভাষাগুলির সাধারণ রীতি বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করে। যে পদ্ধতিতে এই অনুসন্ধান চলে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক। বলা যায় Linguistics is the scientific study of language। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই ভাষাবিজ্ঞান সদা প্রগতিশীল (prograssive) এবং সদা সক্রিয় (dynamic) একটি বিদ্যা (discipline)। ভাষাবিজ্ঞান-আলোচনার পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল ঃ—

১) **তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Comparative Linguistics)** ঃ এখানে একাধিক ভাষার বৈশিষ্ট্য তুলনা করে দেখানো হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যের সম্পর্ক অনুসন্ধান করে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং বংশগত উৎসও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পথ ধরেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে।

২) **ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics)** ঃ এই পদ্ধতির দ্বারা কোনো ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ একটি ভাষার প্রাচীনতর সাহিত্য থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত লিখিত রচনার ভাষা বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়। তাই একে কালানুক্রমিক আলোচনা বা diachronic study বলা হয়।

৩) **বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Linguistics)** ঃ এই পদ্ধতির দ্বারা কোনো একটি ভাষাসম্প্রদায়ের সাধারণ ভাষার এককালের রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। তাই একে এককালিক আলোচনা বা Synchronic study বলা হয়। ব্যাপক অর্থে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান বা Structural Linguistics বলা হয়। কারণ ভাষার এককালের গঠন (structure) বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করাই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। তবে এখানে মনে করা হয়, ভাষার প্রত্যেকটি উপাদন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, সবাইকে নিয়ে ভাষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ারূপে কাজ করে, একারণে তার কোনো উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। কোনো একটি উপাদানে পরিবর্তন হলে তা ভাষার শরীরের অন্য উপাদানকে প্রভাবিত করে। ভাষাকে এইভাবে একটি সামগ্রিক অবয়ব (structure) রূপে দেখা হয় বলে এই শাখাটির আর একটি নাম হল অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান বা macro-linguistics। এই শাখাটির অপর বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভাষার অর্থের দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়।

১.৩ প্রাচীন যুগ

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্য দেশ গ্রিসে প্রাচীন যুগ থেকেই ভাষাবিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। গ্রিসে এর সূচনা হয়েছিল প্লেতোর (Plato) ৪২৫-৩৪৮/৪৭ খ্রিঃ পূর্বাব্দে প্লেতো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ Dialogues-এর ক্রাতিলুস (Cratylus) নামক অধ্যায়ে ভাষার ব্যবহৃত শব্দের উৎসের কথা আলোচনা করেছেন। আমরা ভাষায় কোনো ভাব বা বস্তুকে প্রকাশের জন্য নানা ধ্বনিসমষ্টি বা বিভিন্ন নামশব্দ ব্যবহার করি। সেই সব ভাব বা বস্তুর সঙ্গে ওইসব ধ্বনির কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক আছে কিনা—ভাষাবিজ্ঞানে এটি একটি বড়ো জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে দুটো বিরোধীপক্ষ গড়ে ওঠে। যাঁরা বলেন অর্থের সঙ্গে ধ্বনির, বস্তুর সঙ্গে তার নামের একটা অপরিহার্য সাদৃশ্য আছে। তাঁদের বলা হয় সাদৃশ্যবাদী (analogist) আর যাঁরা মনে করেন ভাব বা বস্তুর নাম আমরা ইচ্ছানুযায়ী দিয়ে থাকি, তাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের সম্পর্ক নেই তাঁদের বলা হয় যথেচ্ছাবাদী বা (anamolist)। এই 'কথোপকথনে' (Dialogum)ই প্লেতো বলেছেন—চিন্তা হল মানুষের নিজের সঙ্গে নীরব কথোপকথন। আর ধ্বনির সাহায্যে সেই চিন্তা থেকে যে প্রবাহটি আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাই ভাষা। তাই তাঁর মতে ভাষার সৃষ্টি প্রয়োজনের তাগিদে। প্লেতো গ্রিক ধ্বনিগুলির বর্গীকরণ করেছেন। ধ্বনির তিনধরনের শ্রেণিবিভাগ তিনি করেছেন—স্বরধ্বনি, অর্ধস্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। তাঁর পথ অনুসরণ করেই পরবর্তী বৈয়াকরণেরা বাক্যে ব্যবহৃত পদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্লেতোর শিষ্য আরিস্তাতল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) ছিলেন পুরোপুরি বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন। তিনি ভাষার বহিরঙ্গ গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তার জন্য আলাদা কোনো গ্রন্থ তিনি রচনা করেননি। কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি হল 'Poetics' যার আসল নাম পেরিপোইএতিকেস্ অর্থাৎ On the art of Poetry. তার মাত্র তিনটি অধ্যায়ে তিনি ভাষা সম্পর্কে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি ভাষাকে 1) Letter 2) Syllable 3) Conjucntion 4) Article 5) Noun 6) Verb 7) Case 8) Speech ইত্যাদি ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে Letter বা বর্ণই হচ্চে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান। এই বর্ণ হচ্ছে অবিভাজ্য ধ্বনি। বর্ণ হয় তিনরকম স্বর (vowel) ব্যঞ্জণ (mute) এবং অর্ধস্বর (Semivowel) । তিনি বলেছেন—বাক্যই হচ্ছে ভাষার বৃহত্তম একক অর্থাৎ Sentence is the unit of language। এই বাক্যকে বিভাজন করা হয় কতকগুলি শব্দ বা পদে। শব্দ বা পদকে আবার বিভাজন করা যায় অক্ষরে। আরিস্তোতল বিশেষ্য পদের কথা বলেছেন কিন্তু বিশেষণ (adjective) বা সর্বনাম (pronoun) সম্পর্কে কিছু বলেননি।

প্লেতো বা আরিস্তোতল কেউই ভাষাতত্ত্বকে একটা আলাদা শাস্ত্র (independent discipline) হিসাবে দেখেননি। ভাষাতত্ত্বকে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে হলেও এই আলাদা মর্যাদা যাঁরা দিলেন তাঁরা হলেন স্টোয়িক (Stoic) দর্শনগোষ্ঠীর লেখক। ৩০৮ খ্রিঃ পূর্বাব্দে এথেন্সে জেনো (Zeno) এই গোষ্ঠীর প্রবর্তন করেন। Stoic গোষ্ঠীর লেখকরা 'case' বা কারক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন কারকের যেসব নাম তাঁরা দিয়েছেন লাতিনভাষার মধ্য দিয়ে এখন ইংরেজি ভাষায় সেগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। 'case' শব্দটি লাতিন (casus) থেকে ফরাসিভাষার মধ্য দিয়ে আধুনিক ইংরেজি ভাষায় গৃহীত হয়েছে। শব্দটি গ্রিক ভাষার 'ptosis' থেকে অনূদিত হয়েছে, যার মানে "fall"। Stoc রা মনে করেন সব "case" ই মূল nominative case থেকে অর্থাৎ "fallen away" পতিত হয়েছে। গ্রিসে ভাষাতত্ত্ব-চর্চা সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছিল আলেকজান্দ্রীয় যুগে (Alexandrian Age literature) আনুমানিক ৩০০-১৫০খ্রিঃ পূর্বাব্দে। গ্রিক ভাষার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করেন দিওনিসিওণফ্রাক্স (Dionysion Thrax) খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তাঁর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণে তিনি গ্রিক ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। থ্রাক্স প্রথমে গ্রিক বর্ণমালার ধ্বনিগুলির উচ্চারণগত বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ বা অঘোষ-সঘোষ এইভাবে যে ধ্বনির পার্থক্য ঘটতে পারে তা উল্লেখ করেছেন। বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলিকে আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন তিনি।

লিঙ্গ, বচন, কারক সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, বচন ভাব (mood) তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেননি, যদিও বাক্যতত্ত্ব বোঝাতে syntax শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাক্যতত্ত্ব নিয়ে প্রথম বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন আপোলোনিওস দিসকোলাস্ (Apollonious Dysxolos) খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। থ্রাক্স এর ব্যাকরণকে অনুসরণ করে তিনি একাধিক ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু তার অধিকাংশই আজ আর পাওয়া যায় না।

গ্রিক ব্যাকরণের আদলে লেখা হল লাতিন ব্যাকরণ। গ্রিক সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের এক বিরাট প্রভাব পড়েছিল রোমানদের ওপর, যখন গ্রিসের উপরে রোমের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোল খ্রিঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যে। প্রথম যে লাতিন ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় তা হলো খ্রিঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীর বৈয়াকরণ ভারো (Varro) রচিত 'দে লিঙ্গুয়া লাতিনা' (De Lingua Latina)। গ্রিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও ভারোর লেখায় কিছু মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। লাতিন ভাষার অবিভক্তিক শব্দগুলির তিনি রূপতত্ত্বগত শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যে সমস্ত পদের সঙ্গে কারক বিভক্তি (Case inflexion) যোগ করা হয় সেগুলি বিশেষ্যপদ (Nouns) ; যে সমস্ত পদের সঙ্গে কাল-বিভক্তি যোগ করা হয় সেগুলি হল ক্রিয়াপদ ও যে সমস্ত পদের সঙ্গে কারক ও কালবিভক্তি (tense inflexion) দুই যোগ করা হয় তাদের বলা হয় কৃদন্ত-বিশেষণ (participles) এবং যে সমস্ত পদের সঙ্গে কোনো বিভক্তিই যোগ করা হয় না সেগুলি হল ক্রিয়াবিশেষণ (adverbs)। পরবর্তী লেখক কুইন্তিলিয়ান (Quintilian) (খ্রিঃ প্রথম শতাব্দী) তাঁর 'ইন্সতিতুতি ওরাতোরিও' (Institutuo Oratoria) গ্রন্থে ব্যাকরণ বিষয়ে অল্পই আলোচনা করেছেন। প্রধানত অলঙ্কার বিষয়েই আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর লেখায় গ্রিক বৈয়াকরণদের প্রভাব অনেক বেশি। লাতিন ভাষায় লেখা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হচ্ছে দোনাতুস (Donatus) এর লাতিন ব্যাকরণ (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) আর্স মাইনর (Ars Minor)। বইটি আর এক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, কাঠের টাইপে ছাপা এটি প্রথম বই। গ্রিক আদর্শে রচিত লাতিন ব্যাকরণের চরম বিকাশ হয়েছিল প্রিস্কিয়ান-এর 'ইন্সতিতুতিওনেস্ গ্রামাতিকা' (Institutiones Grammaticae) নামক রচনায় (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। যদিও তিনি মূলত গ্রিক বৈয়াকরণ থ্রাক্স এবং আপোলোনিওসকেই অনুসরণ করেছেন তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। যেমন, বাক্যতত্ত্ব বা Syntax-এর আলোচনা প্রিস্কিয়ান-এর নিজস্ব মৌলিক সংযোজন। পদবিভাগের ক্ষেত্রে থ্রাক্স Interjection এর উল্লেখ করেননি, কিন্তু প্রিস্কিয়ান করেছেন। আবার, থ্রাক্স পদের মধ্যে article কে ধরেছেন, প্রিস্কিয়ান বাদ দিয়েছেন। শুধু রোমে নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগ পর্যন্ত লেখা সমস্ত ব্যাকরণই প্রিস্কিয়ানকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে ভাষাজিজ্ঞাসার সূচনা দেখা যায় বৈদিক যুগেই আনুমানিক (খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ-৬০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ)। বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলিতে ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটা মূল ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলিতে বৈদিক সংহিতার কোনো কোনো সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা আছে। বিশেষ করে ধ্বনির উচ্চারণ, সন্ধির বিধান, পদবিভাগ, বিভক্তি, বচন এবং ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আছে। সেই হিসাবে প্রাচীন ভারতে ভাষাজিজ্ঞাসার প্রথম উন্মেষ এখানে ঘটে বলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যায়, 'বেদাঙ্গে'র মধ্যে। বেদাঙ্গগুলি ছিল বেদপাঠের সহায়ক গ্রন্থ। বেদাঙ্গ ছটি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। কল্প ও জ্যোতিষ বাদে বাকি চারটি 'অঙ্গে' ভাষার বিভিন্ন দিকের আলোচনা রয়েছে। যেমন, ধ্বনির প্রকৃতি, হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, মাত্রাভেদ, স্বরাঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে 'শিক্ষা'য়। আধুনিক কালে যাকে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) বলি বৈদিকযুগে 'শিক্ষা' বলতে তাই বোঝাত। এই 'শিক্ষা'র পরিপূরকরূপে কিছু গ্রন্থ রচিত হয় তাদের বলা হত 'প্রাতিশাখ্য'। বিভিন্ন বেদের ভিন্ন প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। 'নিরুক্ত' গ্রন্থে আছে শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের প্রয়াস। বৈদিক ভাষার অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দের একটি তালিকা করা হয়েছিল—তার নাম 'নিঘন্টু'। কিন্তু এই

তালিকার রচয়িতার নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে বুৎপত্তি নির্ণয়ের সার্থক নির্দশন পাওয়া যায় যাস্কের 'নিরুক্ত'-এর মধ্যে। এই 'নিরুক্ত'-এ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে ও অর্থ প্রতিপন্ন করতে বেদ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। বেদাঙ্গের যুগে রচিত কোনো ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মনে হয় তখন ব্যাকরণ বলতে প্রধানত রূপতত্ত্বকেই বোঝান হতো কারণ ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র শাখাই হল 'শিক্ষা' ও প্রাতিশাখ্য। ছন্দোবিজ্ঞান বেদাঙ্গের অন্যতম শাখা ছিল। কিন্তু সেখানে ছন্দের যে আলোচনা ছিল তা পূর্ণাঙ্গ নয়। ছন্দ সম্পর্কে প্রথম যথাযথ আলোচনা হয় পিঙ্গালের 'ছন্দঃসূত্রে'। কিন্তু বইটি বৈদিক যুগের পরবর্তীকালের রচনা।

প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যিনি প্রথম ব্যাকরণ রচনা করলেন তিনি পাণিনি। তাঁর ব্যাকরণের নাম অষ্টাধ্যায়ী অর্থাৎ আটটি অধ্যায় সম্বলিত পুস্তক। একথা সঠিকভাবে এখনও বলা যায় না যে পাণিনি নিজে এটা লিখেছিলেন অথবা মুখে মুখে বলেছিলেন। পাণিনির ব্যক্তিজীবনের কোনো তথ্যই তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনকাল নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনি ৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন—খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। এতে আছে বীজগণিতের সূত্রের মতন প্রায় চার হাজার সূত্র। এই সূত্রগুলির অভিনবত্ব হল যথাসম্ভব কম কথায় এগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে আর সূত্রগুলির বিন্যাসরীতিও পাণিনির নিজস্ব। এতে গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়েছে। তবে এটাও বলা যায় যে সূত্রগুলি এতটাই সংক্ষিপ্ত যে টীকাভাষ্যের সাহায্যে ছাড়া তাদের ব্যাখ্যা করা কঠিন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' হচ্ছে সেই টীকা যাকে বলা হয়েছে "Commentaries the commentaries"। সূত্রগুলি এতটাই সংক্ষিপ্ত যে প্রথমে এগুলিকে অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যাখ্যা করলে এর তাৎপর্য বোঝা যায়। এই অভিনবত্বের জন্য বিশেষ করে পাণিনি পাশ্চাত্য দেশের বিদগ্ধমহলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে রূপতত্ত্বে Zero-morpheme বা শূন্যবিভক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা তৈরি হয়েছে তার পূর্বাভাস রয়েছে অধ্যায়তে। পাণিনির মতে সব শব্দের মূলে একটা করে ধাতু রয়েছে। সব শব্দই, এমনকি নামশব্দও ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে বিভিন্ন শব্দের জন্ম হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, ধাতু থেকে জাত শব্দটির কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ সেখানে শূন্য বিভক্তি যোগ করে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা একে বলেছেন পাণিনির root-theory। পাণিনি সংস্কৃত ভাষার গঠনমূলক বিশ্লেষণই করেছেন আর এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন যুগে তিনি যে মণীষা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা অসামান্য। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আধুনিককালের অন্যতম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড বলেছেন 'The grammer of Panini...is one of the greatest monuments of human intelligence'।

১.৪ মধ্যযুগ এবং প্রাক্-আধুনিক পর্ব

এই পর্বে নতুন চিন্তা-চেতনার বিকাশ বিশেষ হয়নি। লাতিন ব্যাকরণের কাঠামোকে অনুসরণ করেই অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে। বিশেষ করে প্রিস্কিয়ানের ব্যাকরণই সেকালে ব্যাকরণ রচনার আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। লাতিন ব্যাকরণের কাঠামোই যেসব ভাষার ব্যাকরণের আদর্শ স্বরূপে এইরকম একটা ধারণা মধ্যযুগে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই ধারণার চরম পরিণতি দেখা গেল ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত "Port Royal Grammer" এ। পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে ব্যাকরণের ধারা ছিল দার্শনিক তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত, পরে তা হয়ে দাঁড়াল নির্দেশমূলক ব্যাকরণ বা normative grammer। মোটের উপর একথা বলা যায়, মধ্যযুগে যা কিছু লেখা হয়েছিল তার বিচার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি ছিল প্রাচীনযুগের মতোই, নতুন কোনো মাত্রা তাতে যোগ হয়নি। এযুগের তিনজন উল্লেখযোগ্য ভাষাবিজ্ঞানী হলেন লিবনিৎস (G. W. Leibniz), হার্ডার (J. G. Harder) এবং উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones)।

যদিও লিবনিৎস (1646-1716) তাঁর কালের একজন বিদগ্ধ দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ রূপেই বেশি খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তবুও সেকালে প্রচলিত প্রায় সব বিদ্যাতেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়েও তাঁর আগ্রহ কিছু কম ছিল না বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং তাদের ভাষাগত বংশতালিকা তৈরিতে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। সেসময় এরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে পৃথিবীর সব ভাষাই হিব্রুভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। লিবনিৎস তা মানতেন না। বরং তিনি বলেছেন, যেসব ভাষার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে খুব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তাদের পারস্পরিক তুলনা করে সম্ভাব্য মূল ভাষা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা যেতে পারে। তিনিই প্রথম বলেন যে, ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি ভাষারই উৎসভাষা এক এবং পরবর্তীকালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলভিত্তি এই ধারণার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লিবনিৎস ইউরোপ, এশিয়া ও মিশরের ভাষাগুলির যে শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন তা ছাপা হয়েছিল ১৭১০ খ্রিঃ অব্দে বার্লিন আকাদেমির পত্রিকায়। লিবনিৎস বলেছেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নিজের মাতৃতভাষায় শিক্ষাদান করা উচিত। তিনি নিজেও তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেছেন জার্মান ভাষায়, লাতিন অথবা ফরাসি ভাষায় নয়। এই দুটি ভাষা ছিল তখনকার বিদ্বৎসমাজের স্বীকৃত ভাষা।

অষ্টাদশ শতকের আর একজন উল্লেখযোগ্য ভাষাবিজ্ঞানী হলেন জে.জি. হার্ডার (1744-1803)। 1772 খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পান। প্রবন্ধটির নাম Concerning the origing of language। সে সময় পণ্ডিতমহলে এরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল—ভাষা সরাসরি ভগবানের দান। হার্ডার এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, ভাষা যদি ভগবানের দান হত তাহলে তা অনেকবেশি যুক্তিসম্মত হত। আবার মানুষই যে ভাষা আবিষ্কার করেছে তাও তিনি বিশ্বাস করেন না। বরং তিনি মনে করেন ভাষা একটা স্বাভাবিক সৃষ্টি যা ভ্রূণাবস্থা থেকে আস্তে আস্তে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তিনি আরও মনে করেন মানুষই একমাত্র পারে তার অনুভূতিকে যথাযথভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে। ভগবান মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আর মানুষ সেই শক্তিকে ভাষায় রূপান্তরিত করেছে। হিব্রু যে পৃথিবীর প্রথম ভাষা এই ধারণা তিনি সমর্থন করেছেন।

১.৫ আধুনিক পর্ব

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যিনি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি হলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স (1746-94)। উইলিয়াম জোন্স পেশায় ছিলেন একজন আইনজীবী। 1783 খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্য পর্যন্ত কলকাতার ব্রিটিশ কোর্টে জুরি হিসাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনের শেষ নয় বছর তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে গিয়ে তিনি যে শুধু ভাষাটিকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করেছিলেন তাই নয়, তিনি অনুভব করেছিলেন অন্য অনেক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার গভীরতর সাদৃশ্য আছে। তাঁর এই ধারণার কথা তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়। বলা যায় এই বক্তৃতা থেকেই সূচনা হল আধুনিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের। এখান থেকে ভাষাবিজ্ঞানেরও আধুনিক পর্বের সূত্রপাত। সংস্কৃত ভাষা যে গ্রিক, লাতিন, জার্মানিক ভাষার সমগোত্রীয় ভাষা সেকথা প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেন উইলিয়াম জোন্স-ই। এর আগে সংস্কৃত ভাষার কথা যে বিশ্ববাসীর জানা ছিল না তা নয়। কিছু কিছু লেখক সংস্কৃতভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় কোনো কোনো ভাষার যে সাদৃশ্য রয়েছে তা লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বিষয়ে বিশদ কিছু বলেননি। জোন্স-ই প্রথম বললেন, সংস্কৃত ভাষার গঠনশৈলী অপরূপ এবং গ্রিক এবং লাতিন ভাষার সঙ্গে এর গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও এদের থেকে সংস্কৃত ভাষা অনেক বেশি মার্জিত। এই তিনটি ভাষার মধ্যে এত গভীর সাদৃশ্য রয়েছে, যে সহজেই অনুমান করা যায় তারা একটা সাধারণ উৎসভাষা (some common source) থেকে জন্মলাভ করেছে, যে উৎসভাষাটির অস্তিত্ব এখন আর বর্তমান নেই। তিনি আরও বলেছেন, গথিক ও কেল্‌তিক ভাষাও এই একই উৎসজাত এবং

প্রাচীন পারসিক ভাষাকেও (old persion language) তিনি এই পরিবারের সদস্যভুক্ত করেছেন। এই বক্তৃতা দিয়েই শুরু হল তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং ঊনবিংশ শতকে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করল।

১.৫.১ ঊনবিংশ শতক

ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিকে যিনি প্রথম যথাযথভাবে প্রয়োগ করলেন তিনি হলেন আর. কে. রাস্ক (Rasmus Kristian Rask) - (১৭৮৭-১৮৩২)। ১৮১৪ খ্রিঃ অব্দে তিনি ড্যানিশ আকাদেমি অফ্ সাইন্স (The Danish Academy of Science) এ একটি প্রবন্ধ পাঠান। প্রবন্ধটির নাম "An Investigation into The Origin of the Old Norse or Icelandie Language." প্রবন্ধটির যে অংশে রাস্ক প্রাচীন আইসল্যান্ডিক ভাষার সঙ্গে স্ক্যান্ডিনেভীয় ভাষার এবং জার্মান উপভাষাগুলির কী সম্পর্ক দেখিয়েছেন এবং যে পদ্ধতির সাহায্যে তিনি এই ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ণয় করেছেন তা যথেষ্ট কৌতূহলদ্দীপক। আধুনিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে তিনি প্রথম প্রয়োগ করেছেন যথাযথভাবে।

যে ভাষাটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে তার সামগ্রিক গঠন total structure নিয়ে যথাযথ পরীক্ষানিরীক্ষা করা দরকার। শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু শব্দ তার প্রয়োগ নিয়ে সদৃশভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না—রাস্ক এই অভিমত পোষণ করেন। দুটি ভাষার মধ্যে যদি শব্দসম্ভারে যথেষ্ট মিল দেখা যায় তাহলেই তারা যে একই বংশোদ্ভূত এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা দুটি ভাষা যদি ভৌগোলিক দিক থেকে খুব কাছাকাছি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে শব্দের আদানপ্রদান হয় যাকে বলা হয় শব্দঋণ। এই মিল দেখে একথা বলা যাবে না যে তারা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ভাষা অর্থাৎ একই উৎসজাত ভাষা। যে দুটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হবে তাদের মধ্যে ব্যাকরণগত সাদৃশ্য (grammatical agreement) কতখানি তা আগে বিচার করতে হবে। অন্য ভাষা থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে একটি ভাষার শব্দসম্ভারে যত অনুপ্রবেশ ঘটে, ব্যাকরণগত সাদৃশ্য তত বেশি ঘটে না। দুই বা তার বেশি ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে রূপতত্ত্ব বা morphologyর আলোচনাই বেশি করা দরকার।

তুলনামূলক-পদ্ধতি প্রয়োগের নীতি কী হবে সে সম্বন্ধে রাস্ক যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এইরকম ঃ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে কিছু শব্দ আছে যাদের বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় অপরিহার্য শব্দ (essential and indispensable words)। যদি দুটি ভাষার এই অপরিহার্য শব্দের মধ্যে যথেষ্ট মিল দেখা যায় বা একটি ভাষায় ওই ধরনের শব্দের কোনো ধ্বনি নিয়মিতভাবে অন্যভাষায় অন্য একটি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে বলা যাবে যে, ওই দুটি ভাষা একই উৎসজাত এবং তাদের মধ্যে একটা মৌলিক সম্পর্ক আছে। ড্যানিশ আকাদেমি অফ সাইন্স-এ রাস্ক যে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন সেটা যদি ফরাসি অথবা জার্মান ভাষায় লেখা হত, তাহলে তিনি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা (founder of modern linguistics) এই আখ্যা পেতেন। এই সম্মান দেওয়া হয় জার্মান অধ্যাপক জ্যাকব গ্রিমকে (Jacob Grimm) যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে Girmm's Fairy Tales-এর সম্পাদকদের অন্যতম হিসাবে বেশি পরিচিত। গ্রিম জার্মান ভাষার একটি বিস্তৃত তুলনামূলক ব্যাকরণ লেখেন। (১৮১৯-৩৭)। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রাস্কের কাছে গ্রিম অনেকাংশে ঋণী। রাস্ক ধ্বনিগত পরিবর্তন সম্পর্কে যে তথ্য দেন, গ্রিম উদাহরণ ও সূত্রের সাহায্যে সেগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহযোগে পরিবর্তনের দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। গ্রিম তাঁর ব্যাকরণের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে বিভিন্ন ভাষা থেকে নেওয়া শব্দের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। সেখানে তিনি গ্রিক, লাতিন, জার্মান, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার ধ্বনির তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে জার্মান ও অ-জার্মান ভাষায় ধ্বনির পরিবর্তন অত্যন্ত নিয়মিত। জার্মান ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রিম দেখলেন এগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় সমপর্যায়ের ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে আর সে

পরিবর্তন অবশ্যই ধ্বনিগত (phonetic) এবং নিয়মমাফিক (regular)। গ্রিম এই পরিবর্তনের নাম দিয়েছেন sound shift গ্রিম নিজে অবশ্য কখনোই এই "Sound shift"-কে 'law' বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, "The sound shift is a general tendency, it is not followed in every case." পরবর্তীকালে তাঁর এই ব্যাখ্যা "গ্রিমের সূত্র" নামে পরিচিত হয়। গ্রিম দুধরনের সূত্রের পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে বলেছেন first sound-shift। আর জার্মান ভাষার তুলনায় ওল্ড-হাই-জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন তাকে বলা হয়েছে second sound-shift।

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন তাকে নীচের উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। এখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে প্রতিনিধিত্ব করছে গ্রিক এবং জার্মানিক ভাষাকে গথিক।

গ্রিক	গথিক	
poús	fōtus	"foot"
treis	preis	"three"
Kardià	hairtō	"heart"
—	—	
déka	taikun	"ten"
génos	kuni	"race"
pherō	bairan	"bear"
thygátér	dauther	"daughter"
chórtos	gards	"yard"

ওপরের উদাহরণগুলিকে গ্রিম যে ধ্বনি পরিবর্তন বা sound-shift লক্ষ্য করেছেন তা হল

গ্রিক	গথিক
p	f
t	d
k	x
—	—
d	t
g	k
f	b
d	d
x	g

তালিকার তিনটি স্তরের ব্যঞ্জনধ্বনির আলাদা নামকরণ করেছেন গ্রিম। (p,t,k)-এই দলের নাম দিয়েছেন যাকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় অঘোষ স্পর্শবর্ণ। (b,d,g)-এই দলের নাম দিয়েছেন যাদের আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় ঘোষ স্পর্শবর্ণ আর (f,d,x)-এদের বলা হয় উষ্মবর্ণ।

তালিকার দ্বিতীয় স্তরে প্রথম স্থানটি ফাঁকা রয়েছে। জার্মানিক ভাষার শব্দের গোড়ায় /p/ আছে এইরকম যেসব শব্দের উদাহরণ গ্রিম দিয়েছেন সেগুলো হয় ওই ভাষায় কৃতঋণ শব্দ অথবা তাদের সদৃশ কোনো শব্দ গ্রিক বা লাতিন ভাষায় পাওয়া যায়নি। তাই গ্রিম এরকম সিদ্ধান্ত করেছেন যে গোড়ায় /b/ আছে এইরকম শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেই ছিল না। শুধু গোড়াতে নয়, মাঝখানে /b/ আছে এইরকম শব্দও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় খুব কম পাওয়া যায়। একমাত্র উদাহরণ গ্রিম দিয়েছেন গ্রিক kannabis : Old Nose hampr/ গ্রিম নিজে কখনও ইন্দো-ইউরোপীয় এবং জার্মানিক ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির এই সাদৃশ্যকে "law" বলেননি। এমন কথাও বলেন নি যে এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না। বরং তিনি বলেছেন, "A sound-shift is generally valid, but never clean-cut." Second sound-shift ওল্ড-হাই জার্মান ভাষায়। অস্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের কিছু অংশ নিয়ে সমগ্র মধ্য ও উত্তর জার্মানিতে এই ওল্ড-হাই জার্মান ভাষা বলা হত। শব্দের মধ্যে বা শেষে জার্মান ভাষায় অঘোষ স্পর্শবর্ণ [p], [t], [k] ওল্ড হাই জার্মান ভাষার অঘোষ উষ্মবর্ণ [f], [θ], [x]-তে পরিণত হয়। আর শব্দের গোড়ায় বা ব্যঞ্জনবর্ণের পর থাকলে যথাক্রমে খ্রিস্টবর্ণ (affriacates) [pf], [ts], [kx]-তে পরিণত হয়। একটা তালিকার সাহায্যে এই ধ্বনি-পরিবর্তন দেখানো যেতে পারে।

জার্মানিক		ওল্ড হাই জার্মান	
opan		offan	'open'
etan	শব্দের	essan	'eat'
makon	মধ্যে	machon	'make'
শব্দের গোড়ায় ঃ—			
pund		pfunt	'pound'
tehan	শব্দের	zehan	'ten'
kō	মধ্যে	chō	'cow'

first sound shift এবং second-shift-কে একত্রে একটি বৃত্তের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেছেন Jacob Grimm। তাই তিনি এর নাম দিয়েছেন Kreislanf অর্থাৎ revolution বা circulation.

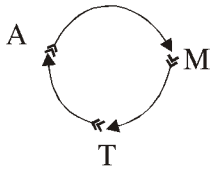

উপরের বৃত্তে ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে জার্মানিক এবং জার্মানিক থেকে ওল্ড হাই জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন দেখতে হলে এক ধাপ করে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দে যদি 'A' থাকে তাহলে জার্মানিক ভাষায় তা হবে 'M' আর ওল্ড-হাই-জার্মানিক ভাষায় হবে 'T'। A =/Aspiratae যাকে সহজভাষায় বলা যায় 'Spirnat' বা উষ্মবর্ণ ; (M = Medial) অর্থাৎ ঘোষ স্পর্শবর্ণ এবং T = Tamues অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণ। নীচে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। দুটিকে একত্রে এভাবে দেখানো যেতে পারে।

ইন্দোইউরোপীয়	T	M	A
জার্মানিক	A	T	M
ওল্ড হাই জার্মান	M	A	T

উদাহরণ ঃ—

গ্রিক	phrātōr	deka	thygater
গথিক	brōpar	taihen	dauhtar
ওল্ড হাই জার্মান	bruoder	zehan	tohter

ধ্বনি-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রিমের এই ব্যাখ্যা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। গবেষকরা অনুভব করলেন ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তন কখনোই এলোমেলোভাবে ঘটতে পারে না, সবসময়েই একটা নির্দিষ্ট নিয়মেই সেই পরিবর্তন ঘটে থাকে।

ফ্রানৎস্ বপ ঃ রাস্ক বা গ্রিম কেউই সংস্কৃত ভাষাকে তাদের আলোচনার মধ্যে আনেন নি। অথচ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক আলোচনা কখনোই সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। যিনি প্রথম এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখলেন, তিনি হলেন জার্মান অধ্যাপক ফ্রানৎস বপ (1791-1867)। ১৮৩৩ খ্রিঃ অব্দে তিনি লিখতে শুরু করেন Comparative Grammer of Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithanian, Gothic and German এবং শেষ করেন ১৮৫২-য়। ১৮৫৭ এবং ১৮৬৮ খ্রিঃ অব্দে পরবর্তী দুটি সংস্করণ বেরোয় এবং তখন বপ তাঁর ব্যাকরণে প্রাচীন স্লাভিক, কেলতিক এবং আলবেনীয় ভাষার আলোচনাকে জুড়ে দেন। তিনি প্যারিসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে লন্ডনে যান সংস্কৃত পুঁথি পড়তে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হল ১৮২১ খ্রিঃ অব্দে। বপের প্রধান আগ্রহ ছিল রূপতত্ত্বে (Morphology)। বপ শব্দের গঠনকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং শব্দের সাথে যে বিভক্তি যোগ করা হয় তাদের পৃথক করেছেন। পরে দেখেছেন এই বিভক্তিগুলির উৎস কি এবং তাদের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এটা মানতেই হবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বপ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থ নয় অর্থাৎ কখনো কখনো তিনি অসফল হয়েছেন। যেমন, সব ক্রিয়াপদের মধ্যেই তিনি "to be" ক্রিয়ার অস্তিত্ব কোনওভাবে রয়েছে বলে মনে করেন। একটা বাক্যের মধ্যে থাকে কর্তা ও কর্ম যাদের যোগ করে একটি ক্রিয়া। তাই ক্রিয়াকে তিনি বলেছেন সংযোজক। বপ সংস্কৃতভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। শব্দবিচারে ও বিশ্লেষণে তিনি সংস্কৃতি ব্যাকরণের পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন। বিশেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধির সাহায্যে শব্দের যে বিশ্লেষণরীতি অনুসরণ করা হয় তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। ইন্দো-ইউরোপী ভাষাগোষ্ঠীতে সংস্কৃত ও ইরানীয়ভাষার অন্তর্ভুক্তির ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা এই সময়ে এক নতুন মোড় নিল।

উইলহেম ভন হুমবোল্ট (Wilhelm Von Humboldt ১৭৬৭-১৮৩৫) ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। ভাষাবিচারে তিনি এক নতুন আদর্শ উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে ভাষা কোনো বস্তু নয়, বরং একটা সক্রিয়তা। (language is not a thing, but an activity) অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে মেধার সক্রিয় গঠনমূলক শক্তি। হুমবোল্ট অনেকগুলো ভাষা জানতেন, তার মধ্যে কিছু আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভাষাও ছিল। ভাষার বিচিত্র গঠন বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন—On the variety of human Language Structure। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে ভাষা সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা হয়। ভাষাকে শুধুমাত্র ধ্বনি, শব্দ বা বাক্যের একটা বহিরঙ্গ আচ্ছাদিত রূপ হিসেবে দেখেননি হুমবোল্ট। তাঁর মতে ভাষার একটা অন্তর্নিহিত গঠন (inner speech form) আছে এবং তার সঙ্গে মানবমনের গভীর যোগ আছে। তাই ভাষাকে তিনি

মানুষের অন্তর্নিহিত মূল সৃজনীশক্তির প্রকাশরূপে দেখেছেন। তাঁর মতে ভাষার ক্ষেত্রে শব্দগুলো হচ্ছে তার raw materials বা কাঁচামাল। সেগুলোকেই প্রত্যেক ভাষার গঠন এবং নিয়ম অনুযায়ী সুসংবদ্ধ করতে হয়। আর এই গঠন এবং তার নিয়ম একটা ভাষাকে অন্যটার থেকে পৃথক করে। এই চিন্তাধারা থেকে বা চরিত্র হিসেবে ভাষার শ্রেণিবিন্যাস করতে আগ্রহী হয়েছিলেন হুমবোল্ট এবং তাঁর origin of grammatical forms and their influence on the development of thought (1822) বইতে তিনি ভাষার কালানুক্রমিক শ্রেণিবিভাগ করেছেন। পৃথিবীর ভাষাগুলির যে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে তাদের মধ্যে একদিকে আছে চিনা ভাষা যা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক (analytic) এবং যাকে বিচ্ছিন্ন ভাষাও (isolating language) বলা যেতে পারে। আর অপরদিকে আছে সংস্কৃত ভাষা যা সম্পূর্ণ সবিভক্তিক এবং সংশ্লেষাত্মক (synthetic) ভাষা। এই দুই ধরনের ভাষার মাঝখানে আছে agglutinative languages বা সংযোগমূলক ভাষা। হুমবোল্ট প্রধানত সবিভক্তিক inflectional ভাষা নিয়ে বেশি আলোচনা বা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এই সমস্ত ভাষায় বিভক্তি যোগ করে শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। তাঁর মতে সংস্কৃত প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে সবথেকে উন্নত। সমস্ত ভাষাতেই শব্দ হচ্ছে চিন্তা বা মননের দৃষ্ট রূপ। সেই শব্দগুলো নির্দিষ্ট রীতিতে সাজানো থাকে একটা বাক্যের মধ্যে যেখানে বাক্যই হচ্ছে একটা একক (unit)। হুমবোল্ট মনে করেন ভাষার মাধ্যমেই মানুষের অন্তর্নিহিত মূল সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটে। আর মানুষের মধ্যে ভাষাসৃষ্টির এই অপরিসীম ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ সীমাবদ্ধ উপাদানের দ্বারা অগণিত বাক্য সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানে এই তত্ত্বের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাই শুধু তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নয়, পাশ্চাত্যে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও হুমবোল্ট একজন উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী ভাষাবিজ্ঞানী।

তুলনামূলক আলোচনায় সংস্কৃত ও ইরানীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তির দ্বার ফ্রানৎস বপ তুলনামূলক পদ্ধতির যে বিস্তৃতি ঘটান, তাকে আরও পরিপুষ্টি দান করেন উনিশ শতকের অন্যতম ভাষাতত্ত্ববিদ অগাস্ট শ্লেইশার (August Scheleicher১৮২১-৬৮)। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের ওপর তিনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন যার মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল Comendium of the comparative grammer of the Indogermeniei languages. (১৮৬১) যৌবনে তিনি অনেকগুলো ইউরোপীয় ভাষা শিখেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষ করে লিথুয়ানীয় ভাষা সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন এবং তাঁর লেখা Handbook of the Lithunian languages এ সম্বন্ধে প্রথম তথ্যবহুল গ্রন্থ যাতে ভাষাটি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আছে।

ভাষাতত্ত্ব ছাড়া শ্লেইসার আরও যে দুটি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন সেদুটি হল দর্শন (Philosophy) এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান (natural science)। হেগেলীয় দর্শনে বিশ্বাসী শ্লেইসার তাঁর পরিণত বয়সে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন চার্লস ডারউইন-এর দ্বারা। ডারউইন এর তত্ত্বের সঙ্গে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাদৃশ্য দেখেছিলেন তিনি। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বই Darwinian Theory and Linguistics.

ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্লেইশার এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তিনটি বিষয়ে (১) ভাষার সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব (Theory of language-relationship) (২) তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে মূলভাণ্ডার পূর্ণগঠন (his "comparative method" of reconstructing a parent language) এবং চরিত্রভেদে ভাষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of languages into types বা taxanomy)

শ্লেইশার মনে করেন ভাষা তার বিবর্তনের পথে স্বাধীন ও সজীবভাবে এগিয়ে চলে ঠিক যেমন একজন উদ্ভিবিদ মনে করেন উদ্ভিদ ও খুব স্বাভাবিক পথে ও স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে। যখন দুটো ভাষার মধ্যে সমশ্রেণির কিছু সংখ্যক সদৃশ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তখন উভয় ভাষাই একটা পারস্পরিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনি ভাষার প্রাচীন স্তর পর্যবেক্ষণ করেন,

কিন্তু এক পর্যায়ে তার চেয়ে পেছনে গিয়ে ভাষার উপশাখা-নির্ণয় আর সম্ভবপর হয় না। এভাবে তিনি একটি ভাষা-পরিবারের মূলভাষাকে নির্দিষ্ট করতে পারনে। বিশেষত "family tree" Theory বা 'পরিবার বৃক্ষ' নকশার সাহায্য ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নেন এবং বংশগত তালিকা তৈরি করে ভাষাগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট করেন। যে সমস্ত ভাষা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য বহন করছে তাদের সেই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উৎসভাষার একটা রূপ পুনর্গঠন করা হয়। শ্লেইশার-এর পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয়ে যে ওই উৎস ভাষার কোনও উপভাষা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাষা সম্প্রদায়ই উপভাষাহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও উৎসভাষাটি কালক্রমে দুই বা ততোধিক কন্যা-ভাষায় (daughter-language) রূপান্তরিত হয় এবং সেই জ্ঞাতিভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না। তারা নিজেদের পথে এগিয়ে যেতে যেতে এক একটি স্বতন্ত্রভাষায় পরিণত হয়। কিন্তু উৎসভাষার সঙ্গে তাদের একটা পরিচয়সূত্র থেকেই যায়। পরবর্তীকালে এই জ্ঞাতিভাষা গুলির মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করে অর্থাৎ তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ে উৎসভাষা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা তৈরি করে নেওয়া হয়।

হেগেলের দর্শনে বিশ্বাসী শ্লেইশার যেভাবে ভাষার রূপতত্ত্বগত শ্রেণিভাগ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। শ্লেইশারের মতে ভাষা তৈরি হচ্ছে শব্দ এবং অর্থ নিয়ে। অর্থহীন কোনো ভাষা হতে পারে না, এই শব্দ ও অর্থের প্রয়োগ অনুসারে শ্লেইশার তিন ধরনের ভাষার অস্তিত্বের কথা অনুমান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি হেগেলের triads বা 'ত্রয়ী' মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়। প্রথম ধরনের ভাষায় শব্দের ব্যাকরণগত উপাদানের কোনো অর্থই বাক্যের সামগ্রিক অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয় না। চিনা ভাষা এই ধরনের ভাষা। সেখানে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের অবস্থানই গুরুত্বপূর্ণ, কোন্ অবস্থানে শব্দটি বসেছে তাই নির্ধারণ করে দেবে তার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, তার আলাদা কোনো অর্থ থাকে না। শ্লেইশার এই ধরনের ভাষাকে বলেছেন বিচ্ছিন্ন ভাষা বা Isolating language।

দ্বিতীয় ধরনের ভাষায় ভাষিক উপাদানগুলি পরপর যুক্ত হয়ে একটি শব্দবাক্য তৈরি করে এবং সেখানে প্রত্যেকটি উপাদানেরই নিজস্ব অর্থ আছে এবং ব্যাকরণগত একটি ভূমিকাও আছে। এই ধরনের ভাষার নাম দিয়েছেন শ্লেইশার "agghutinative" languages বা সংযোগমূলক ভাষা। তুর্কি ভাষা এই ধরনের ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ভাষায় বা ভাষাগুচ্ছে মূল শব্দটি অপরিবর্তিত থাকে এবং তার সঙ্গে যে উপাদানগুলি যুক্ত হয় তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অর্থ আছে।

তৃতীয় ধরনের ভাষায় শব্দের অর্থ এবং গঠনের সমন্বয় ঘটেছে। এই ধরনের ভাষায় অনেকসময় শব্দমূলের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে (যেমন ইং sing-sang-sung) আবার শব্দমূলের আগে, পরে অথবা মধ্যে উপসর্গ, অনুসর্গ ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে। এই সংযোগের ফলে শব্দটির অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটাও মনে রাখা দরকার, এই উপসর্গ বা অনুসর্গগুলির নিজস্ব অর্থ ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। এই ধরনের ভাষাকে শ্লেইশার বলেছেন "inflectional language" বা সবিভক্তিক ভাষা। গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত এই ধরনের ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের ছাত্র শ্লেইশার জানতেন যে, সমস্ত কোষবদ্ধ জীবেরই জন্ম-বৃদ্ধি-বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু অনিবার্য। এর সঙ্গে তিনি মিলিয়েছিলেন হেগেলের সেই তত্ত্বকে যেখানে তিনি বলেছেন সমস্ত রকম প্রগতি মানে একটা বিপরীত শক্তির (যাকে বলেছেন dialectic) অবিরাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শ্লেইশার ভাষার ক্ষেত্রেও এই তিনটি শব্দকে প্রয়োগ করেছেন। ভাষা যখন প্রথমে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির (isolating nature) ছিল তখন ছিল thesis। তারপর একটু জটিল প্রকৃতির হল অর্থাৎ যে পৌঁছালো সংযোগমূলক পর্যায়ে বা agglutinative

stage-এ ; এই পর্যায়কে তিনি বলেছেন antithesis। সবশেষে এসে পৌঁছালো সবিভক্তিক পর্যায়ে, যে পর্বকে তিনি বলেছেন synthesis। এরপরেই প্রশ্ন ওঠে আমরা তাহলে ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষার কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছি। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর হল সবিভক্তিক পর্যায়ে। শ্লেইশার সবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রাচীন ইন্দো-উইরোপীয় ভাষাগুলি বিভক্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত ভাষার শব্দরূপ বা ধাতুরূপের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

শ্লেইশারের অনুসৃত তুলনামূলক পদ্ধতি তাঁর পরবর্তী ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকাংশেই অনুসরণ করেছেন। এমনকি, বেশির ভাগ তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর "Proto-Indo-European" বা প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুনর্গঠনকে মেনে নিয়েছেন। একটা ভাষা তার জীবনপর্যায়ে বিবর্তনের যে স্তরকে অতিক্রম করে বলে তিনি মনে করেন তার অনেকাংশই সমর্থনযোগ্য, যদিও সর্বাংশে নয়। ভাষা একটি জীব নয়, তার ধ্বংস নেই কিন্তু তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

শ্লেইশারের 'পরিবার-বৃক্ষ' তত্ত্ব বা 'family tree' theory প্রয়োগ করে যিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি তুলনামূলক অভিধান রচনা করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি হলেন অগাস্ট ফিক (August fick ১৮৩৩-১৯১৬) তাঁর লেখা অভিধানটির নাম Comparative Dictionary of the Indo-European language, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। অভিধানটির তৃতীয় সংস্করণ আরও বৃহৎ প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-৭৬ খ্রিস্টাব্দে। চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯০ তে প্রকাশিত হতে শুরু হয় কিন্তু শেষ হয়নি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলিকে তিনি প্রধান দুটি শাখায় বিন্যস্ত করেছেন—১) ইন্দো-ইরানীয় এবং ২) সাধারণ ইউরোপীয় ভাষা। পরে ফিক সাধারণ ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে দুটি শাখায় বিভক্ত করেছেন ১) দক্ষিণ ইউরোপীয় (গ্রিস-ইতালিক) এবং উত্তর ইউরোপীয় (জার্মান-বালতিক-স্লাভিক)। যে সমস্ত শব্দ ইন্দো-ইরানীয় এবং সাধারণ ইউরোপীয় ভাষার যে-কোনো শাখাতেই বর্তমান রয়েছে শুধুমাত্র তারাই-মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত ছিল দাবি করেন ফিক।

প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি (Phonology) ও তার পুনর্গঠন নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর লেখা A study of the primitive Vowel System of the Indo-European Lnaguages. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে যে গুণ-বৃদ্ধি সম্প্রসারণ ঘটে অর্থাৎ স্বরধ্বনির যে গুণগত (qualitative) ও মাত্রাগত (quantitive) পরিবর্তন হত সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সোস্যুর।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ডেনিস ভাষাতত্ত্ববিদ কার্ল বেরনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন "An exception to the first consonant shift" মূল প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় লেখা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে জ্যাকব গ্রিম তাঁর এ যে ধ্বনি পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন, গ্রিক Pater (সংস্কৃত pita(r) গথিক fadar -এখানে দেখছি শব্দের গোড়ায় অঘোষ স্পর্শ বর্ণ অঘোষ উষ্ম বর্ণে পরিণত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী আঘোষ বর্ণ /t/ ঘোষ উষ্ম বর্ণ /d/-এ পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রিম এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেও তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। সেই ব্যাখ্যা দিলেন কার্ল বেরনের তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে। তিনি বললেন, যদি প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যঞ্জনের ঠিক পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির ওপর ঝোঁক না পড়ে, তাহলে জার্মানিক ভাষার অঘোষ স্পর্শ বর্ণ ঘোষ উষ্ম বর্ণে পরিণত হয় এবং ইন্দোইউরোপীয় ভাষার /ৎ/ ধ্বনি জার্মানিক ভাষায় /z/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ

গ্রিক patēr,	সংস্কৃত pitá :	গথিক fadar, OHG, fater
গ্রিক heptá,	সংস্কৃত Saptá :	গথিক sibun, OHG, Sibun
গ্রিক hekura,	সংস্কৃত śraśrús :	প্রাচীন ইং sweger, OHG, Swigur

আবার, গ্রিক muós (dauther-in-law) সংস্কৃত Snusá :

প্রাচীন ইংরেজি snoru, OHG, snura এখানে মনে রাখতে হবে ইন্দো ইউরোপীয় /s/ জার্মানিক ভাষায় /z/ এ পরিণত হয়েছে এবং এই /z/ প্রাচীন ইংরেজি বা ওল্ড হাই জার্মান ভাষায় /r/ এ পরিণত হয়েছে।

গ্রিমের সূত্র প্রয়োগ করে সর্বক্ষেত্রে জার্মান ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়নি। যেসব জায়গায় ব্যতিক্রম দেখা গেল, সেই ব্যতিক্রমগুলির পেছনেও যে একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে তা দেখালেন কার্ল বেরনের। অর্থাৎ কোনো ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের পেছনেই কোনো না কোনো কারণ আছে, তাই ধ্বনিসূত্রের কোনো ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে, তাও যে একটা নিয়মের ফসল—এই মতবাদ নিয়ে ঊনবিংশশতকে জার্মানিতে একত্রিত হন একদল নতুন বৈয়াকরণ। প্রাচীনপন্থী বৈয়াকরণেরা এঁদের ব্যঙ্গ করে বলতো নব্য বৈয়াকরণ বা "neogrammarians" (Junggrammatiker ছোকরা বৈয়াকরণ)। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এঁদের একজন সদস্য অগাস্ট লেসকিন্ (August Leskein) বিখ্যাত উক্তিটি করলেন, "Sound-laws have no exception" অর্থাৎ ধ্বনিসূত্রের কোনো ব্যতিক্রম নেই। ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন কখনোই বিশৃঙ্খলভাবে বা আকস্মিকভাবে ঘটতে পারেনা। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলিকে ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে সেগুলিও কোনও না কোনও নিয়মের ফসল। প্রত্যেক পরিবর্তনের পেছনেই একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে, শুধু প্রয়োজন সেই কারণটিকে অনুসন্ধান করে বের করা। নব্যবৈয়াকরণদের মতানুসারে যে সমস্ত কারণ ধ্বনিপরিবর্তনের ব্যতিক্রম ঘটাতে ক্রিয়াশীল তাদের অন্যতম হচ্ছে সাদৃশ্য বা analogy, মনস্তাত্ত্বিক মতে সাদৃশ্য হচ্ছে ভাষাতত্ত্বে একটা সহজ অনুষঙ্গ। সাদৃশ্যের কারণে ভাষার অনেক সময় ধ্বনির (pheneme), রূপের (morph) এমনকি অন্বয়েরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেই পরিবর্তনকে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। ভাষার ইতিহাসে ধ্বনিগত ও সাদৃশ্যগত পরিবর্তন নব্যবৈয়াকরণদলের কাছে প্রধান বিষয়রূপে গৃহীত হয়। এই দলের ভাষা বিশ্লেষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা ও ভাষার শারীরিক প্রকৃতির প্রেক্ষিতে পরিবর্তন নির্দেশ করা। সাদৃশ্যের দ্বারা ভাষায় কাছাকাছি দুটি শব্দের মধ্যে ধ্বনির অথবা প্রত্যয়/বিভক্তির অথবা অর্থের বা অনেক সময় অন্বয়েরও সাদৃশ্য ঘটানো হয়। লাতিনে একজোড়া শব্দ 'gravis' (heavy) এবং 'levis' (light)-যারা অর্থের দিক থেকে বিপরীতধর্মী। পরবর্তীকালে 'gravis' শব্দটি 'levis' এর সাদৃশ্যে হোল* 'gravis' আর তার থেকে প্রাচীন ফরাসি ভাষায় (old french-এ) শব্দটি দাঁড়ালো 'gref'-যার থেকে ইংরাজি শব্দটি grief এসেছে।

গ্রিকে এই রকমই বিপরীত অর্থের দুটি শব্দ হোল 'prosthen' (infront) এবং 'opisthen' (in back) এখানে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত, কেননা শব্দটি মূলত ছিল 'opithen'।

সাদৃশ্য ছাড়াও অনেকসময় অন্যকারণেও ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যায়। যেমন, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় স্বরধ্বনির পরবর্তী /s/ লাতিনে যদি দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে বসে তাহলে /r/ তে পরিবর্তিত হয়। যেমন ই-ইউ flōs "flower" লাতিনে সম্বন্ধের একবচনে হয় 'floris' genus "race" ষষ্ঠীর একবচনে হয় লাতিনে generis। কিন্তু লাতিনে এমন অনেক শব্দ আছে যেখানে দুটি স্বরমধ্যবর্তী /s/ বজায় আছে, যেমন m*i*si (I sent) বা causa (cause)। আপাতদৃষ্টিতে এদের ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। কিন্তু ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে শব্দটি মূলত এসেছে *m*i*ssi (মূল শব্দ m*it*si) থেকে। আর লাতিনে স্বরধ্বনি বা যৌগিকস্বরের পর long consonant অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি একই ব্যঞ্জন থাকলে তারা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। কাজেই এই শব্দদুটিকে কোনোভাবেই নিয়মের ব্যতিক্রম-বাহক বলা যায় না।

ভাষাঋণ ঃ অন্য ভাষা থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে অনেকসময় গ্রহীত ভাষায় মৌলিক শব্দের নানারূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তনের এটাও একটা কারণ। যেমন, লাতিন ভাষায় 'philosophus',

'genesis' প্রভৃতি শব্দে দুটি স্বরের মধ্যবর্তী [s] বজায় আছে। দুটি শব্দই গ্রিক ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ। কাজেই এই ধরনের শব্দে যে ব্যতিক্রম ঘটেছে তা আদৌ ব্যতিক্রম নয়। এটা স্বীকার করতেই হবে যে ভাষার ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা যে দেওয়া হচ্ছে তা নয়। তবুও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা যেমন মনে করেন, যে তুলনামূলক পদ্ধতিই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি ভাষাবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, সেইরকম নব্যবৈয়াকরণরাও মনে করেন ধ্বনিসূত্রের আপাত কোনো ব্যতিক্রম নেই। যেখানে ব্যতিক্রম আছে মনে হচ্ছে সেটাও অন্য একটি নিয়মের আওতায় পড়ে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাবে ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ঘটে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় হেরমান পল (Hermann Paul)-এর লেখা Principles of Linguistic History-র প্রথম সংস্করণ। ভাষাগত পরিবর্তনের বিশদ সমীক্ষা করা হয়েছে এই বইটিতে। ভাষার ধ্বনিগত, সাদৃশ্যজনিত এবং অর্থগত-সব ধরনের পরিবর্তন নিয়েই আলোচনা আছে বইটিতে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল কার্ল ব্রুগমান (Karl Brugmann) এবং বের্থোল্ড ডেলব্রুক (Berthold Delbruck) এর লেখা শীর্ষস্থানীয় বই Comparative Indo-European Grammer। এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বই হেরমান হার্ট (Hermann Hirt) এর Indogermanic Grammer। বইটি সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তবে এই পর্বে সর্বাধিক খ্যাতিমান ভাষাতাত্ত্বিক হলেন সরবোন অধ্যাপক আন্তোনিও মাইয়ে (Antoine Meillet)। তাঁর লেখা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক সমীক্ষার ভূমিকা অর্থাৎ Introduction to the Comparative Study of Indo-European তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে ধ্রুপদী মর্যাদার অধিকারী। ইন্দো-ইউরোপীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বইটিতে আলোচিত হয়েছে।

১.৫.২ বিংশ শতাব্দী

উনিশ শতককে যদি বলা হয় ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ তাহলে বিংশশতক হচ্ছে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের গৌরবময় যুগ। উনিশ শতকের ভাষাচর্চায় ভাষাতাত্ত্বিকরা মনস্তত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবকে একেবারে এড়াতে পারেননি। কিন্তু বিংশ শতকে ভাষাতাত্ত্বিকরা স্বতন্ত্র একটা শৃঙ্খলার সাহায্যে ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। ভাষাতত্ত্বের আদর্শ অন্যান্য তত্ত্বীয় শাস্ত্রের ওপরেও সমপরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে। উনিশশতকের ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষাচর্চার মুখ্যত ইন্দোইউরোপীয় ভাষার ওপর প্রাধান্য দিলেও বিংশ শতকের ভাষাতাত্ত্বিকরা সমকালীন ভাষার বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণে আসক্তি দেখালেও ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব বিচারেও ভাষার সামগ্রিক বিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিংশ শতকে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক আলোচনার চেয়ে বুৎপত্তিতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, রূপমূলকতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সেমিওলজি, শব্দপরিসংখ্যানতত্ত্ব, মনঃসমীক্ষতত্ত্ব, রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ ও প্যারালিংগুয়িস্টিক্স-এর বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। বিংশ শতকে ভাষাবিজ্ঞানচর্চার যে ধারার সূত্রপাত হয় তাকে বলা হয় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান Deseriptive Linguistics। এই "deseriptive" বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে W.V. Humboldt বলেছেন, "The analysis of language as an internally articulated organims." ভাষাবিশ্লেষণের এই নতুন পদ্ধতির নাম গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ববিদরা মূলধ্বনি বিচারের সূত্রপাত করেন বলে এই শ্রেণির পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও প্রসারের ইতিহাসের মধ্যে মূলধ্বনির তাত্ত্বিক ও রূপগত দিকটি স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। ১৯৩০ সালের আগেই ইউরোপ ও আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞাত তথ্যের ওপর নির্ভর করে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞাত তথ্যাবলির নিয়মের মধ্যে

সেগুলির ক্রিয়াগত দিক এর পুনর্বিচার প্রাধান্য পায়। এছাড়াও, গঠনবিদ ভাষাতাত্ত্বিকরা ঐতিহাসিক ও সমকালীন ভাষাতত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করেন। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনা দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯২৩)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোস্যুরের মৃত্যুর পর তাঁর বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন তাঁর দুই ছাত্র শার্ল্ বাল্লি ও আল্বেয়র্ শেসেই (Charles Bally and Albert Sechehaye)। জেনেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর নতুন মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বক্তৃতাগুলি দেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েড বাস্কিন (Wade Baskin) বইটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন নিউইয়র্ক থেকে Course in General Linguistics নামে। সোস্যুরে প্রথমেই কালানুক্রমিক ও এককালিন ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল পার্থক্য তা ব্যক্ত করেন এবং প্রধানত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি সূত্রবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার বিভিন্ন উপাদান খণ্ড খণ্ড করে আলোচনা করতেন অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান বিশ্লেষণের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। সোস্যুরই প্রথম বলেন যে, ভাষার খণ্ড খণ্ড উপাদান একসঙ্গে মিলে এক অখণ্ড রূপের সৃষ্টি হয় আর সেই অখণ্ড রূপেই ভাষার সামগ্রিক তাৎপর্য বিদ্যমান। ভাষার উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সার্থকতাই বহন করে না। তাঁর প্রবর্তিত এই রীতিকে তাই অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান (Macro-Linguistics) এর রীতি বলা যায়। এই অখণ্ড ভাষা দৃষ্টির প্রতিষ্ঠাই সোস্যুরের মৌলিকতম অবদান।

সোস্যুরের প্রধান কীর্তি হল ভাষার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ। তিনি প্রথমে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চেয়েছেন এই মীমাংসায় যে, 'ভাষা' বলতে সঠিক কী বোঝায়। তাঁর মতে 'ভাষা' হচ্ছে দুটি মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। সেই শব্দগুলি শ্রোতার কানে পৌঁছানোর পর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এইভাবে ভাষা হয়ে ওঠে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। ভাষা চিন্তাও তার প্রকাশের মধ্যে একটা সেতুস্বরূপ বিদ্যমান। এই ধারণা (concept) ও প্রকাশ (expression) এর একটা আলাদা নাম দিয়েছেন সোস্যুর। Concept বা ধারণাকে তিনি বলেছেন 'signified' আর expression কে বলেছেন 'signifier' বক্তার মনের ধারণা বা ভাবনা রূপ পায় তার মুখে উচ্চারিত ধ্বনিতে আর সেই ধ্বনিসমষ্টির বা শব্দাবলির একটা নিজস্ব অর্থ আছে ; সেই অর্থে ধারণ করেই তা পৌঁছে যায় শ্রোতার কাছে, এই ভাবে চলে ভাবের আদানপ্রদান। কাজেই 'অর্থ' বা meaning এখানে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে যে শব্দাবলি সোস্যুর তাদের নাম দিয়েছেন "linguistic sign" বা ভাষিক চিহ্ন। প্রকৃতপক্ষে ভাষাবিজ্ঞান বা linguistics হচ্ছে এই প্রতীকেরই বিস্তৃত পাঠ। এখন এই গুলির অর্থাৎ শব্দের প্রকৃতি (nature) কী হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সোস্যুর। প্রথমত তিনি অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে বলেছেন যে, এই চিহ্নগুলি হচ্ছে বিধিবহির্ভূত (arbitrary)। ভাষার এই চিহ্নগুলি অর্থাৎ শব্দগুলি হল আসল সম্পদ আর তারাই গড়ে তোলে একটা ভাষার বিশাল শব্দভাণ্ডার। কিন্তু উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে এই যে প্রত্যেক ভাষারই উৎস নিহিত আছে অতীতের কোনো ভাষার মধ্যে। কাজেই বক্তা যে শব্দাবলী ব্যবহার করে তাতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আর সে পরিবর্তন আকারেও হতে পারে, অর্থেও হতে পারে। কারণ হিসেবে সোস্যুর বলেছেন শব্দ এবং তার অর্থের মধ্যে যে যোগসূত্র সেটা অনেকটাই দুর্বল। যে-কোনো কারণেই তা শিথিল হতে পারে। শব্দের অর্থ অনেকটাই নির্ভর করে তার প্রতিবেশের ওপর। একটা concept বা ধারণাকে আমরা প্রকাশ করি একটা বাক্যে আর সেই বাক্যে-ব্যবহৃত শব্দাবলির প্রত্যেকটির অর্থের সামগ্রিক যোগফল হচ্ছে সেই বাক্যটির অর্থ।

ভাষার, প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সোস্যুর 'পাসল' (psole = উক্তি) এবং লাঁগ (langue = ভাষা) এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ভাষার দ্বিধারিত অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রথমে রয়েছে জীবন্ত ভাষাটির প্রবাহ। এই জীবন্ত ভাষা ব্যবহার করছে প্রত্যেক বক্তা। ব্যবহারের সময় একজনের ভাষা অপরজনের থেকে আলাদা হয়ে

যাচ্ছে। প্রত্যেকের ব্যবহৃত ভাষার নাম তিনি দিয়েছেন 'পালস' (pasole) আর সামগ্রিক ভাষার যে রূপ যা এই সমস্ত বা ব্যক্তিভাষার সামগ্রিক যোগফল তাকে সোস্যুর বলেছেন লাঁগ (langue); যেমন, জার্মান ভাষা, ইংরাজি ভাষা, বাংলা ভাষা ইত্যাদি। এই ভাষা কোনো একজনের ভাষা নয়, তা হচ্ছে নির্বস্তুক ভাষাগত গঠন-প্রক্রিয়া, যার অস্তিত্ব ব্যক্তি মানুষের ভাষা থেকে স্বতন্ত্ররূপে সংরক্ষিত। এই লাঁগ সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে একটি সামাজিক ব্যাপার।

ভাষা সমাজেরই প্রতিফলন। তাই এই ভাষার সমীক্ষা কোন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটছে তার ওপর নির্ভর করে সোস্যুর 'সমকালীন' 'অতীতকালীন' এই দুই ধরনের ভাষা-সমীক্ষার কথা বলেছেন। একটা নির্দিষ্ট সময়সীমায় যদি ভাষার সমীক্ষা চলে তাহলে তাকে তিনি বলেছেন সমকালীন পর্যবেক্ষণ বা synchonic study। আর যদি অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত কোনো ভাষার বিবর্তনের রূপরেখাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেই পর্যবেক্ষণকে তিনি বলেছেন অতীতকালীন পর্যবেক্ষণ বা diachronic study। সমকালীন ভাষাতত্ত্বকে বর্ণনামূলক ও অতীতকালীন ভাষাতত্ত্বকে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বরূপে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সোস্যুর স্পষ্টরূপে নির্দেশ করেন যে দুটো ভাষাতত্ত্বীয় আদর্শ দুটো অক্ষের ওপর দণ্ডায়মান, তাই একই পদ্ধতির প্রয়োগে তাদের বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় এবং উভয় শ্রেণির ভাষারীতির সমীক্ষার সীমানা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা উচিত। যেমন, ধ্বনি-পরিবর্তনের আলোচনাকে তিনি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণরূপে চিহ্নিত করতে চান। ধ্বনিগত পরিবর্তন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, আর এই পরিবর্তন বিভিন্নযুগের ভাষাভাষীদের অজান্তেই ঘটে থাকে।

সোস্যুরের মতে একটা বাক্য হচ্ছে কতকগুলি শব্দের সমষ্টি—যে শব্দগুলিকে তিনি বলেছেন linguistic signs। অর্থ এবং প্রয়োগের দিক থেকে এই শব্দগুলির দুধরনের সম্পর্কের কথা বলেছেন সোস্যুর (১) syntagmatic relationship বা পদবিন্যাসগত সম্পর্ক এবং paradigmatic relationship বা ব্যাকরণগত বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

Syntagmatic relationship একটা বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেই সম্পর্কটি স্থিরীকৃত হয় প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব structure-এর ওপর। একটা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির পারস্পরিক পদবিন্যাসগত যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে বলা হয় syntagmatic relationship। 'আমি কাল যেতে পারি' এই বাক্যের প্রতিটি শব্দ বা 'sign' পরস্পরের সঙ্গে এক সুশৃঙ্খল সম্পর্কে যুক্ত। ভাষার গঠন-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করে এদের এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—সর্বনাম + কালগত ক্রিয়াবিশেষণ + প্রধান ক্রিয়া + সহায়ক ক্রিয়া। প্রত্যেক ভাষার পদবিন্যাসগত নির্দিষ্ট রীতি আছে তাকে বলে অন্বয়রীতি বা syntax। এই বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ একটি নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত শ্রেণির সদস্য। যেমন, 'আমি'—সর্বনাম পদ। এই বাক্যে ব্যবহৃত শব্দটির সঙ্গে ওই সর্বমান শ্রেণির অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ, তাকে বলা হয় paradigmatic relationship অর্থাৎ 'আমি'র সঙ্গে আপনি/তুমি/তুই এর যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় paradigmatic relationship আবার 'কাল'-এর সঙ্গে 'আজ' 'পরশু' প্রভৃতি শব্দের paradigmatic relationship রয়েছে। বাক্যের মধ্যে যে শব্দটি রয়েছে তার সঙ্গে ওই সদস্যপদের অন্যান্য শব্দের যে সম্পর্ক তাকেই বলা হয় paradigmatic relationship।

সোস্যুর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতি প্রয়োগ করে ভাষাতত্ত্বচর্চায় অগ্রসর হন। ভাষাবিশ্লেষণে তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। (১) ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যের নির্দেশ, (২) বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে ভাষাবিচার এবং (৩) ভাষাতাত্ত্বিকের তথ্য নির্দেশ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা। সোস্যুরকে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎ বলা হয়।

সোস্যুরের 'Course in Uniqui Linguistics' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে ভাষাগত আন্দোলনটি গড়ে ওঠে তা প্রাগ-দল (প্রাগ্-স্কুল Prague School) বা প্রাগ চক্র বা প্রাগ সার্কল (Prag Circle) নামে পরিচিত। এই

আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন নিকোলাস এস. ক্রুবেৎস্কয় (১৮৯০-১৯৩৮) প্রাগদলের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। প্রাগদল প্রথমদিকে ধ্বনিতত্ত্বীয় গবেষণায় বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। এ প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় ক্রুবৎেসকয়-এর 'Principles of Phonology' (Prague 1939) গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইটির একটি ফরাসি সংস্করণও প্রকাশিত হয়, তার নাম Princips de Phonologic [Paris, 1949]।

প্রাগস্কুলের সদস্যরা phonology বলতে 'the study of the function of speech-sounds' কেই বুঝিয়েছেন, তাই তাঁদের বলা হয় 'functionalists'। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় তাঁরা ধ্বনি-বৈপরীত্যের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেন। যদি ভাষায় দুটি শব্দের মধ্যে ন্যূনতম পার্থক্য ঘটে দুটিমাত্র ধ্বনির দ্বারা, অর্থাৎ ওই দুটি একই অবস্থানে বসার ফলে শব্দ দুটির মধ্যে অর্থ পার্থক্য ঘটছে তাহলে বলা যায় ওই ধ্বনি দুটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে এবং শব্দদুটি ন্যূনতম শব্দ জোড় (minimal pair) তৈরি করছে। যেমন বাংলার 'তালা' এবং 'থালা' এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য ঘটছে '/ত/' ও '/থ/' বাংলার দুটি ধ্বনি একই অবস্থানে রয়েছে কিন্তু শব্দদুটি অর্থ ভিন্ন। তাই শব্দদুটি ন্যূনতম শব্দজোড় এবং '/ত/' ও '/থ/' বাংলার দুটি মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্প (phoneme) । ভাষায় এই মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্পের (phoneme) সন্ধান ও সংখ্যা নিরূপণের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তার একটা হচ্ছে ন্যূনতম শব্দজোড়ের পরীক্ষা minimal pair test । যেমন বাংলার 'গান' শব্দের /গ/ এর জায়গায় যদি /প/, /দ/, /ধ/ বসানো যায় তাহলে তারা প্রত্যেকেই অর্থবহ হবে এবং তখন বলা যাবে /গ/, /প/, /দ/, /ধ/ বাংলার বিভিন্ন (phoneme) বা মূলধ্বনি। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যে ভাষায় যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি (Phonetically similar) তাদের মধ্যেই বিভ্রান্ত ঘটে বেশি আর সেজন্যই ন্যূনতম জোড় খোঁজা দরকার হয়। অবশ্য আর এক ধরনের পরীক্ষাও করা যায় তা হল প্রতিবেশ অনুসারে পরীক্ষা। প্রতিবেশ দুরকম—(১) ধ্বনি প্রতিবেশ বা phonological context অর্থাৎ একই মূল ধ্বনি দুটি আলাদা প্রতিবেশে সেই প্রতিবেশ অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন, বাংলা 'আলতা' আর 'পাল্টা' এই দুটি শব্দে /ল/ ধ্বনি /ত/ এর সান্নিধ্যে 'দন্ত ল' আর দ্বিতীয় শব্দের /ল/ ধ্বনি /ট/ এর সান্নিধ্যে 'মূধন্য ল' ; তাই এরা দুটি পূরকধ্বনি, বিস্বন allophone বা ধ্বনিকল্প আর /ল/ হল মূলধ্বনি বা phoneme।

(২) অবস্থান প্রতিবেশ বা positional context অর্থাৎ একই ধ্বনির দুটি পূরকধ্বনির একটি যে অবস্থানে থাকে অন্যটি যে অবস্থানে কখনোই যেতে পারে না। যেমন, বংলা /ড/ ধ্বনি শব্দের গোড়ায় বসে, যেমন ডাব, কিন্তু /ড়/ ধ্বনি কখনও শব্দের গোড়ায় বসে না যেমন, মোড়। Phonological oppositions বা ধ্বনিগত বিরোধ কতরকমের হতে পারে সে সম্বন্ধে ক্রুবেৎস্কয় যে ধারণা দিয়েছেন তা হল—

১) **Bilateral Opposition বা দ্বিপক্ষীয় বিরোধ**—যে দুটি ধ্বনির মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে তাদের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য (phonetic characterstic) যদি দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় এক হয় তাহলে বলা যায় ওই দুটি ধ্বনির মধ্যে দ্বিপাক্ষীয় বিরোধ তৈরি হয়েছে। যেমন /p ও b/, /t ও d/, /k ও g/ জার্মান ভাষার /k ও x/।

২) **Multilateral Opposition বা বহুপক্ষীয় বিরোধ**—যে দুটি ধ্বনির মধ্যে বিরোধ রয়েছে তাদের মধ্যে যদি উচ্চারণগত দিক থেকে অমিল অনেক বেশি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে বহুপক্ষীয় বিরোধ তৈরি হয়ে বলা যায়। যেমন, বাংলার /p ও k/, /b ও d/ স্বরধ্বনি /a ও i/-র মধ্যে বহুপক্ষীয় বিরোধ তৈরি হয়েছে বলা যায়।

৩) **Proportional Opposition বা আনুপাতিক বিরোধ**—এই ধরনের বিরোধ জোড়ায় জোড়ায় ফুটে ওঠে। যেমন বাংলার /p, b/ ও /t, d/ এদের মধ্যে যে বিরোধ তা আনুপাতিক বিরোধ অর্থাৎ এদের মধ্যে অঘোষ বনাম ঘোষ এই বৈশিষ্ট্যে বিরোধ রয়েছে। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এর বিরোধ রয়েছে /k, kh/, /p, ph/-এর মধ্যে।

৪) **Isolated Opposition বা বিচ্ছিন্ন বিরোধ**—যে বিরোধ ভাষার সমস্ত ধ্বনি থেকে একটা জোড়াকে বিচ্ছিন্ন করে আনে সেখানে বিচ্ছিন্ন বিরোধ ঘটেছে বলা হয়। যেমন, স্পেনীয় /r ও ṙ/ ধ্বনির মধ্যে কম্পনজাত ধ্বনির স্থিতি এই ভাষার আর কোনো শব্দজোড়ের মধ্যে দেখা যায় না। তাই এই বিরোধকে বলে বিচ্ছিন্ন বিরোধ।

৫) **Private Opposition বা ঐকিক বিরোধ**—যখন ধ্বনি লক্ষণের উপস্থিত বা অনুপস্থিতির কারণে দুটি সমশ্রেণির ধ্বনির মধ্যে বিরোধ তৈরি হয় তখন ঐকিক বিরোধ ঘটেছে বলা হয়। যেমন /p/ ও /ph/ এর মধ্যে মহাপ্রাণতার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি /k/ ও /g/ এর মধ্যে ঘোষবত্তার অনুপস্থিতির ও উপস্থিতি, /b/ ও /m/ এর মধ্যে অনুনাসিকতার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি যে ধরনের বিরোধ সৃষ্টি করেছে তাকে ঐকিক বিরোধ বলা যায়।

৬) **Neutralization বা একরূপণ**—ফোনিমে ফোনিমে যে বিরোধ সেটা কোনও একটা বিশেষ প্রতিবেশে অদৃশ্য হতে পারে। যেমন, ইংরেজি /k/, /b/, /s/ ধ্বনির পরে থাকলে বিরোধ সৃষ্টি করে না। স্পেনীয় ভাষায় /r/, /ṙ/ শুধুমাত্র দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে থাকলে বিরোধ তৈরি করে, অন্যত্র করে না। যেমন /peṙo/ ও /pero/ (perro) বিরোধের এই বৈশিষ্ট্যকে বলে একরূপণ এই শ্রেণির নিরপেক্ষ বা পরিবেশের সাহায্যে নির্দিষ্ট বৈসাদৃশ্যের একটা স্বতন্ত্র নামকরণ করেছেন ক্রুবেৎস্কয়-আর্কিকোনিম (archiphoneme) অর্থাৎ অপ্রচলিত নয় কিন্তু সাধারণভাবেও ব্যবহৃত হয় না এমন মূলধ্বনি।

যে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের থাকার ফলে দুটি মূলধ্বনি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে, ক্রুবেৎস্কয় তাকে বলেছেন পারস্পরিক সম্পর্ক। ভাষায় একই পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত একাধিক জোড় থাকতে পারে। যেমন, /p/ - /b/, /t/ - /d/, /k/ - /g/, এরা পরস্পরের মধ্যে অনুসরণশীলতার (sonority) সম্পর্কে সম্পর্কিত। আবার একই মূলধ্বনি একাধিক ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে। যেমন, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি একই সঙ্গে অনুরণশীলতা (sonority) এবং মহাপ্রাণতার (aspiration) সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে। বাংলা সৃষ্ট ধ্বনিগুলো পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। এর মধ্যে প্রথম পারস্পরিক সম্পর্ক ঘোষতা এবং দ্বিতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক মহাপ্রাণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর ফলে বাংলা মূলধ্বনি দুটো বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত রূপের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশে সক্ষম।

ক খ	ট ঠ	ত থ	প ফ
গ ঘ	ড ঢ	দ ধ	ব ভ

এক্ষেত্রে মূলধ্বনির একই উচ্চারণ স্থান ছাড়াও উচ্চারণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কবেৎস্কয় এই শ্রেণির বৈশিষ্ট্যকে "পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টি" বা "bundle of correlations" বলে চিহ্নিত করেন।

ইয়েল্‌মস্লেভ—সোস্যুরের ভাষাসমীক্ষার দ্বারা পরবর্তীকালে যিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন, তিনি হলেন লুই ইয়েল্‌মস্লেভ। তিনি ছিলেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক এবং 'কোপেনহেগেন দলের' পরিচালক। তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বের নির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধকরণ দেখা যায় তাঁর Prolegomena to Theory of language (1953) বইতে। এই বইটি মূল থেকে অনুবাদ করেন ইংরেজিতে Francis J. Whitfield। তাঁর তত্ত্ব "গ্লসমেটিক্স" (glossematics) নামে পরিচিত। গ্লসমেটিক্স বিতর্কমূলক হলেও আধুনিক গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের একটা প্রধান অবদান। গ্লসমেটিক্স-এর আভিধানিক অর্থ হল গ্লসিমের বিভাজন ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ। গ্লসিম অর্থে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান, যা অর্থগত দিকে পরিস্ফুট করে। ইসেল্‌মস্লেভ ভাষার একটা তত্ত্ব গঠন করার চেষ্টা করেন, যা একই সঙ্গে স্বীকৃতি দেয় যে ভাষা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়াগত বিন্যাস। এই প্রক্রিয়াগত বিন্যাসের প্রকৃতি ও অস্তিত্বের কয়েকটা পন্থা প্রতিপাদন করতে তিনি চেষ্টা করেন।

সেই পন্থাগুলি তিনি অনেকগুলো যুক্তিগত প্রতিপাদন-সম্ভব প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করেন। যখন এই প্রক্রিয়া তথ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তা মূলপাঠ উৎপাদন করে। মূলপাঠ বিশ্লেষণে গ্লসমেটিক ব্যাখ্যা যুক্তিগত দিক থেকে অভ্রান্ত। ইয়েল্‌মস্লেভ মেটাল্যাঙ্গুয়েজ সৃষ্টিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষাশাস্ত্র আলোচনার প্রথম থেকেই তিনি যুক্তিশাস্ত্রীয় ব্যাকরণে উৎসাহ দেখান। যুক্তিশাস্ত্রীয় ব্যাকরণ বলতে তিনি স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, স্পষ্ট, যুক্তিনির্ভর ব্যাকরণ যা বীজগণিতের মতন তাই বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যাকরণের এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনে তিনি গাণিতিক তত্ত্ব ভাষাতত্ত্বে প্রয়োগ করেন।

১.৫.৩ আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা

আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ফ্রান্জ বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২), এডওয়ার্ড সাপির (১৮৮৪-১৯৩৯) ও লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড (১৮৮৭-১৯৪৯)।

ফ্রানজ বোয়াস—বোয়াস ছিলেন একাধারে নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। বোয়াসের মতে ভাষা উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি এবং বাক্‌অঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ যোগাযোগের মাধ্যমরূপেই ব্যবহৃত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণগত প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। তিনি এরকমও মন্তব্য করেন যে, এক ভাষার রূপ অন্য ভাষার ওপর আরোপ করা সম্ভব নয়। এজন্য কোনো ভাষার ব্যাকরণগত রূপ যেভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। তাঁর মতে ভাষাবর্ণনায় ভাষার রূপমূলের সাহায্যে বিচার করাই একান্ত অভিপ্রেত। অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় বিশেষ্যের শ্রেণিকরণে লিঙ্গের দিকটি অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু লিঙ্গের বর্জন বিশেষ্য বিচারে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

এডওয়ার্ড সাপির—মূলত বোয়াসকে অনুসরণ করেই সাপির কোয়াকিয়ুতল, চিনুক, ইয়ানা, নুতকো, উতে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয় দিকই লক্ষ করা যায়। সাপির ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ Language is a purely human and non-instictive method of communincating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produceded symbols । ভাষার শ্রেণিবিন্যাসে তিনি সাধিত, যৌগিক, বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষত্মক অনুক্রমের সাহায্যে বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি নির্দেশ করেন।

সাপির ও তাঁর ছাত্র বেঞ্জামিন লি. উর্ফ (Benjamin Lee Whorf) মনে করেন যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষার কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে। 'সমাজ যেভাবে চিন্তা করে ও আচরণ করে'—সংস্কৃতির সংজ্ঞা এভাবে নির্দেশ করে বলা যায় যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির চিন্তার দিক তাদের ভাষা দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তীকালে সাপির-উর্ফের ভাষাসম্পর্কিত ব্যাখ্যা **সাপির-উর্ফ-হাইপোথেসিস** রূপে পরিচিত লাভ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষাগত পার্থক্য আপেক্ষিকতার সাহায্যে একটা নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করে।

লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড—আমেরিকায় ভাষাতত্ত্ব বিষয়টিকে যাঁরা দৃঢ়মূল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড। তাঁর প্রামাণ্য Text বই 'Language' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩-এ। এটিকে বলা যায় তাঁর আগের লেখা 'Introduction to the study of language' (1914) এর নতুন সংস্করণ। ৩০ এবং ৪০-এর দশকে আমেরিকার ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই 'Language' বই এবং তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্ব ও প্রয়োগকৌশলগুলি দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'Language' ছাত্রদের কাছে Text বই ছাড়াও ছিল আরও অনেক কিছু। তাই আমেরিকার ভাষাতত্ত্বে এই কালকে বলা হয় Bloomfieldian Era। বলা যেতে পারে, 1933 থেকে 1957 এই সময়ের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাষাতত্ত্ব নিজের স্থান বেশ কায়েমি করে নিয়েছিল এবং যাঁর প্রভাবে ও দাক্ষিণ্যে এই বিষয়টি বিদ্বৎসমাজে একটা সুদৃঢ় আসন লাভ করেছিল তিনি হলেন ব্লুমফিল্ড। তৎকালীন ভাষাতত্ত্বকে তাই বলা হয় 'Bloomfiedl Linguistics' এই সময় ভাষাতত্ত্ব-

অনুশীলনে যা করা হয়েছিল সেটা হল ভাষার সাংগঠনিক বিশ্লেষণ (formal analysis) এর ওপর নজর দেওয়া হল বেশি। এই ধরনের বিশ্লেষণে দুটি মৌলিক এককের ধারণা কার্যকর হল—সে দুটি ধারণা স্বনিম (pheneme) এবং রূপিম (morpheme) সম্পর্কে ধারণা। ব্লুমফিল্ড শব্দের প্রথাগত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাকে ব্যাকরণগত একক বা grammatical unit বলেছেন, যদিও তাঁর পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যাকরণগত বর্ণনার ওপর ততটা জোর দেননি। বাক্যের গঠন কীরকম হবে তা নির্ধারণ করার জন্য অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ বা immediate constituent analysis-এর সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার সংগঠন-র নিয়ম অনুসারে রূপিমগুলি পরপর সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। বাক্যের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে ব্যাকরণগত দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত তার আলোচনার ওপর অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংগঠন অন্বয়ের দিক থেকে স্থূলভাবে অব্যবহিত উপাদানের যে-কোনো একটির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হয় কিনা তার উপর ভিত্তি করে ব্লুমফিল্ড endocentric এবং excentric এই দুরকম মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে phoneme sequence-ই হোক আর morpheme-group-ই হোক phoneme এর morpheme-এর ধারণা প্রকাশ করা হয় distributional relations বা পরিবেশগত বর্ণনার দ্বারা। তাই এসময়ের কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানীকে distributionalists-ও বলা হয়।

১৯১৭-য় ব্লুমফিল্ডর Tagalog Texts with Grammatical Analysis প্রকাশিত হয়। যদিও শিক্ষক হিসাবে তিনি জার্মানিক ভাষাতত্ত্ব পড়িয়েছেন কিন্তু তাগালোগ (Tagalog) এবং মেনোমিনি (Menomini) ভাষার ওপর তাঁর গবেষণা তাঁকে structural analysis (গঠনমূলক বিশ্লেষণ) বিশেষ করে phonemic analysis-এ অনুপ্রাণিত করে এবং পথ দেখায়। Regularity of phonemic change বা ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মানুবর্তিতাই যে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মূল কথা—একথা বলেছেন ব্লুমফিল্ড। সোস্যুর যে structuralism-এর সূচনা করেন তার পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন তিনিই। ভাষার বাহ্য-আবরণ অর্থাৎ তার দেহের ধ্বনি-শব্দ-বাক্যের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন অর্থাৎ ভাষাকে তিনি একটি যান্ত্রিক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাষার sound-pattern সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিয়মমতোই পরিবর্তিত হয়, শুধুমাত্র সেই pattern টিকে সুনির্দিষ্ট পথে খুঁজে বের করতে হয়। ধ্বনিপরিবর্তনের এই সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতিই ভাষাবিজ্ঞানের মূল কাঠামো।

শব্দার্থ ভাষার আলোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন, সোস্যুর বলেছেন ভাষা হচ্ছে মনের ধারণা (concept) ও তার প্রকাশের (expression) একটা যোগসূত্র। অর্থাৎ Language is a system of signs, a joining of the signifier and the signified of from and meaning এখানে বোঝানো হচ্ছে শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট, সেকারণেই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হয়। প্রাগ স্কুলের সদস্যরাও বলেন, দুটি শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য থাকে বলেই একই পরিবেশে থেকে দুটি ধ্বনি কোনো ভাষায় দুটি স্বনিম (phoneme) হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্লুমফিল্ড ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সহমত হতে পারেন নি। তিনি মনে করেন কোনো ভাষা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি অ-ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে হতে পারে না। এ সম্পর্কে ব্লুমফিল্ডের মতামতকে আমরা তুলে ধরতে পারি Meaning must be investigated through formal (structural) differences in a language, since it is just these formal differences that determine diffeireinces in meaning, ব্লুমফিল্ডের মতে ভাষায় ধ্বনি উচ্চারিত হয় একটা প্রতীক হিসেবে। আর সেই উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের অর্থ বলতে বোঝায় সেই অবস্থাকে (situation) যে অবস্থায় বক্তা সেটা উচ্চারণ করে আর শ্রোতার কাছে ঠিক তার প্রতিক্রিয়াটি পৌঁছায়। এই অবস্থা বলতে বোঝায় বক্তার নিজস্ব বিশ্বের প্রতিটি বস্তু এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়া যা তাঁকে—ওই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে প্ররোচিত করে। আমেরিকায় ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্লুমফিল্ডের অবদান যে কতখানি তা 'ল্যাঙ্গুয়েজ' সম্পাদক বানার্ড ব্লুখের নিম্ন-উদ্ধৃত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়—

It is not too much to say that every significant refinement of analytic method produced in this country since 1933 has come as a direct result of the impetus given to linguistic research by Bloomfield's book. If today our methods are in some ways better than his, if we see more elearly than he did himself curtain aspects of structure that he first revealed to us, it is because we stand upon his shoulders. [Language, 25:92].

ব্লুমফিল্ডের 'ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে তিনি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তেমন আলোচনা করেন নি। এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে এগিয়ে আসেন কেনেথ এল. পাইক ও ইউজিন এ. নিডা (Eugene A. Nida)। পাইক বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুখণ্ড ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics : 1942) ও মূলধ্বনিতত্ত্ব (Phonemics : 1943) বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি উচ্চারণীয় পরিভাষার যথাযথ বর্ণনার সাহায্যে ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন, যা ইউরোপীয় ধ্বনিতাত্ত্বিকদের নজরে আসেনি। পাইকে উৎসাহ ছিল আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ধ্বনি বিশ্লেষণে। আমেরিকার গঠনবিদদের কাছে তখন আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ধ্বনির উচ্চারণে পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে তিনি মনে করেন। ধাপে ধাপে বর্ণনার মাধ্যমে তিনি মূলধ্বনির বিশ্লেষণ করেন এবং এই কাজে তিনি বিভিন্ন আদিম ভাষার উদাহরণ ব্যবহার করেন। তাই তাঁর প্রদত্ত উদাহরণ থেকে আমেরিকার বিভিন্ন আদিম ভাষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে কত গভীর তা বোঝা যায়। তাঁর দুটি বই Summer Institute of Linguistics-এ প্রশিক্ষণ গ্রন্থরূপে বহুল ব্যবহৃত।

নিডার (E. A. Nida)-র রূপমূলতত্ত্ব বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগেই রচিত এবং এই বইটিও ভাষাপ্রশিক্ষণের কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। তাঁর Morphology : The Deseriptive Analysis of Words প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। ১৯৪৯-এ বইটির পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আবার প্রকাশিত হয়। সেসময় গ্রন্থকার মেক্সিকোর ভারতীয় ভাষা থেকে প্রচুর উদাহরণ কাজে লাগিয়ে বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন।

১.৫.৪ নোয়াম চম্‌স্কি

আধুনিক বর্ণনামূলক এবং গঠনসর্বস্বতাবাদী ভাষাবিজ্ঞানের (descriptive and structural linguistics) ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের সূচনা করেন আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স ইন্সটিটিউট অব্ টেকনোলজির (Masschusetts Institute of Technology) অধ্যাপক নোয়াম্ চমস্কি (Noam Chomsky) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Syntactic Sructures' প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের জগতে ভাষা সম্পর্কে এক নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। চম্‌স্কি জন্মসূত্রে ছিলেন ইহুদি। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয় প্রধানত আমেরিকায়। পেন্‌সিল্‌ভেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি সেখানে পড়েছিলেন অঙ্ক ও দর্শনশাস্ত্র। তাঁর ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তাভাবনায় তাই অঙ্কশাস্ত্রের যথাযথতা ও দর্শনশাস্ত্রের গভীরতার ছাপ পড়েছে।

ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে চম্‌স্কি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন Syntactic structures (1957), Current Issues is Linguistic Theory (1964), Aspects of the theory of Syntax (1965), Topics in the theory of Generative Grammar (1966), Cartesian Linguistics : A Chapter in the History of Rationalist Thought (1966) Language and Mind (1968); Studies on Semanties in generative grammar (1972), On Wh-movement (1977), Lectures of Government and binding (1981), Knowledge of language : Its natures, origins and use (1986).

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Aspects of the Theory ' প্রকাশিত হলে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক তত্ত্ব 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব' (Transformational Generative Grammar) প্রতিষ্ঠা

লাভ করে। কেউ কেউ একে 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের' তত্ত্বও বলেছেন। এই তত্ত্ব এতটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আধুনিক ভাষাগুলির বিশ্লেষণে ও ব্যাকরণরচনায় এই তত্ত্বকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এমনকি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে ও ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই নতুন তত্ত্বকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আবার শুধু ভাষাবিজ্ঞান নয়, অন্যান্য বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বকে কাজে লাগানো হচ্ছে। যে কারণে এই তত্ত্ব এত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা হল তার রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্বের। মূল কথাই হল, ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ সৃজনশীলতা রয়েছে, তাই ভাষার সঙ্গে মানুষের সৃজনী চেতনার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কে চমস্কি বলেছেন ঃ "... ... One of the qualities that all languages have in common is their creative 'aspects'... ... The grammer of a particular language, then, is to be supplemented by a universal grammar that accommodates the creative aspect of language use"—Aspects of the Theory of Syntax, P. 6।

আসলে চমস্কি ভাষার সৃজনশীলতার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছেন, তাই ভাষার দেহগত নয়, মনোগত দিকটিকেই বেশি প্রাধান্য দিলেন তিনি। এইজন্য তাঁর তত্ত্বকে মনস্তত্ত্বপ্রধান তত্ত্ব (mentalistic theory) বলা হয়। একজন মানুষ যখন তার মাতৃভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে তখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা উপলক্ষে তাকে বহুপ্রকারের অসংখ্য বাক্য ব্যবহার করতে হয়। অনেক সময় প্রয়োজনে তাকে নতুন বাক্য তৈরি করে নিয়ে বলতে হয়। এই ব্যবহৃত সব বাক্যই নিশ্চয়ই সে আগে থেকে শিখে রাখে না, তা সম্ভবও নয়। ভাষাপ্রক্রিয়া সেরকম কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। আসলে একজন ভাষী (speaker) তার মাতৃভাষার মূল নিয়মগুলো নিজের সহজ বোধ ও বোধির সাহায্যে আয়ত্ত করে থাকে। তারপর সেই মূলনীতিটুকু প্রয়োগ করে ভাষার সীমাবদ্ধ উপকরণকে নিজের সৃজনীক্ষমতা দিয়ে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন বাক্য সৃজন (generate) করে চলে। এই বাক্যসৃজনের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে বলেই চমস্কির ব্যাকরণকে সৃজনমূলক ব্যাকরণ বা generative grammar বলে। মাতৃভাষার ব্যাকরণের মূলনিয়মগুলো মানুষ তার সহজবোধের সাহায্যে আপনা থেকেই শিখে নেয়। তারপর ভাষার সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডার থেকে উপাদান আহরণ করে তাতে ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ করে সেই শব্দগুলিকে সাজিয়ে নতুন নতুন বাক্য সৃষ্টি করে চলে। ভাষীর এই যে সৃজনীক্ষমতা এর দুটো দিক আছে। একটা বাস্তব ব্যবহারের দিক যাকে চমস্কি বলেছেন performance আর ভাষার পরিপূর্ণতার যেটুকু অংশ আদর্শ বা ideal রূপে থেকে যায় তাকে বলে সম্ভাবনা (competence)। একজন ভাষাতত্ত্ববিদ ভাষার বাস্তবরূপ (performance) বিচার ও বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ রচনা করেন, কিন্তু ভাষার আদর্শ সম্ভাবনা বা সম্পর্কে কোনো Perspective grammar তিনি রচনা করতে পারেন না। ভাষা যেমন সৃজনশীল প্রক্রিয়া, ব্যাকরণও হল তেমনি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা, কিন্তু তা কোনো যান্ত্রিক বিধান নয়।

গঠন-সর্বস্বতাবাদীদের মতো চমস্কি ভাষাকে শুধু বহিরঙ্গের গঠন বলে গ্রহণ করেন নি। এই বহিরঙ্গ গঠনের অন্তরে যে গভীর দিক রয়েছে তাকেও তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষার দুটি দিক তিনি স্বীকার করেছেন—বহিরঙ্গ গঠন বা surface structure এবং অন্তরঙ্গ গঠন বা deep structure। ভাষার বহিরঙ্গ গঠনটি আমাদের ধ্বনিপ্রবাহ sound structure দিয়ে গঠিত আর অন্তরঙ্গ দিকের সঙ্গে রয়েছে অর্থের যোগ। চমস্কির ব্যাকরণে এই বহিরঙ্গ গঠন ও অন্তরঙ্গ গঠন, এই ধ্বনি ও অর্থের যোগটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, তাতে ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি পরিষ্কার হয় এবং বাক্যের অস্পষ্টতা (ambiguity) ধরা পড়ে। যেমন, 'তিস্তা প্রথম মাখন দিয়ে ভাত খেল।' এই বাক্যের একাধিক অর্থ হতে পারে—(১) তিস্তা এই প্রথম মাখন দিয়ে ভাত খেল, আগে কখনও খায়নি। আর (২) তিস্তা অন্য কিছু দিয়ে খাওয়ার আগে সবার প্রথমে মাখন দিয়ে ভাত খেল। বাক্যটির এই একাধিক অর্থ হওয়ার কারণ হল—'প্রথম' শব্দটির সঙ্গে বাক্যের কোন্ শব্দের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক তা স্পষ্ট নয়। যদি 'মাখন'-এর সঙ্গে সম্পর্ক সবচেয়ে নিকট হয় তাহলে প্রথম

অর্থটি পাওয়া যাবে। আর যদি 'খেল'-এর সঙ্গে সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হয় তাহলে দ্বিতীয় অর্থটি পাওয়া যাবে। 'প্রথম' শব্দটির পদ-পরিচয় ঠিকমতন ধরা যাচ্ছে না বলে প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যের অন্য কোন্ শব্দের সঙ্গে 'প্রথম' শব্দটির সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক আছে তা স্পষ্ট হচ্ছে না। তাহলে বলা যায়, একটি বাক্যে শব্দগুলির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য আছে। এই তারতম্য নির্দেশ করার জন্য চম্স্কি একটি বাক্যের পদগুলিকে যে পরম্পর্যের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন তাকে একটা বৃক্ষানুরূপ চিত্রের (tree-diagram) সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারি। এখানে বাক্যকে প্রথমে দুটি বৃহত্তম এককে ভাগ করা হয়েছে—NP অর্থাৎ Noun Phrase এবং VP অর্থাৎ Verb Phrase। এবার Noun Phrase ও Verb Phrase-এর অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের তারতম্য বৃক্ষানুরূপ চিত্রের সাহায্যে এভাবে নির্ণয় করতে পারি। একটি সরল বাক্য নেওয়া যাক ঃ আমি লাল গোলাপ ভালোবাসি।

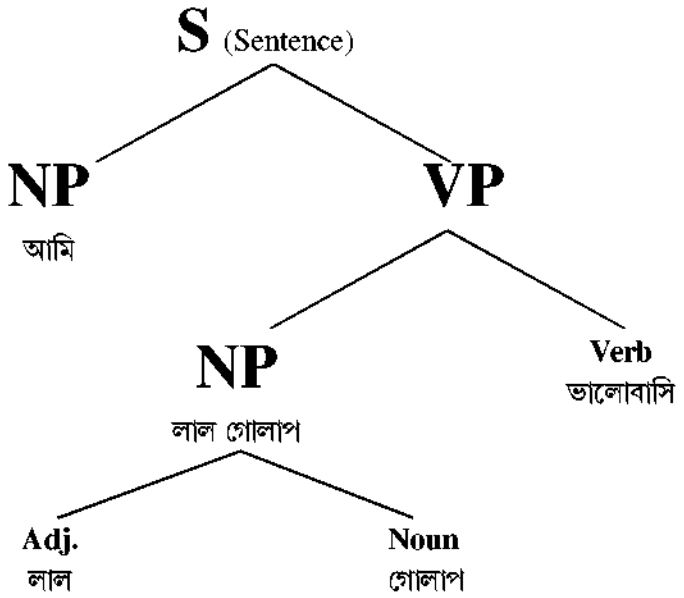

এই চিত্রের সাহায্যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্য শব্দের সম্পর্ক কত দূরর বা কত কাছের। যেমন 'লাল'-এর সঙ্গে সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক 'গোলাপ'-এর। 'আমি'-র সঙ্গে 'লাল'-এর সম্পর্ক অনেক দূরের। এই হল চম্স্কির বাক্য-বিশ্লেষণ-রীতির সহজ পরিচয়।

চম্স্কির ব্যাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল, ভাষাগত বিশ্বজননীর (Linguistic Universals) তত্ত্ব। একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব গঠন বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক ভাষার স্বনিমসংখ্যা ভিন্ন, স্বনিমের ক্রিয়াপদ্ধতি আলাদা, এমনকি শব্দরূপ-ধাতুরূপের বিধান এবং বাক্যগঠনের রীতিও পৃথক। তবুও সব ভাষার ব্যাকরণের মধ্য কিছু মূলীভূত ঐক্য আছে। জাতিতে জাতিতে যত পার্থক্যই থাকুক, মানুষ মূলত এক। তার দেহযন্ত্র বাগ্যন্ত্র থেকে তার উচ্চতর মানবিক অনুভূতি মূলত এক। এই কারণেই সব জাতির ভাষাপ্রক্রিয়ায় এবং ব্যাকরণে একটা মূলগত ঐক্য আছে। এই মানবিক ঐক্যের ওপর ভিত্তি করেই বিশ্বজনীনতা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানে যে মূল ঐক্য তাকে বলা হয় substantive universals। বাইরের রূপে একটা ভাষার বাক্যগঠন অন্য ভাষার বাক্যগঠনের চেয়ে কিছু আলাদা হতে পারে। কিন্তু দুই ভাষার বাক্যগঠনের গভীর স্তর (deep structure) পর্যালোচনা করলেই একটা অন্তর্লীন ঐক্য ধরা পড়বে। যেমন, ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষার দুটি বাক্য বিশ্লেষণ করা যাক—

বাংলা - আমি লাল গোলাপ ভালবাসি।

ইংরাজি - I like red roses

বাক্য দুটির গঠন বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াবে —

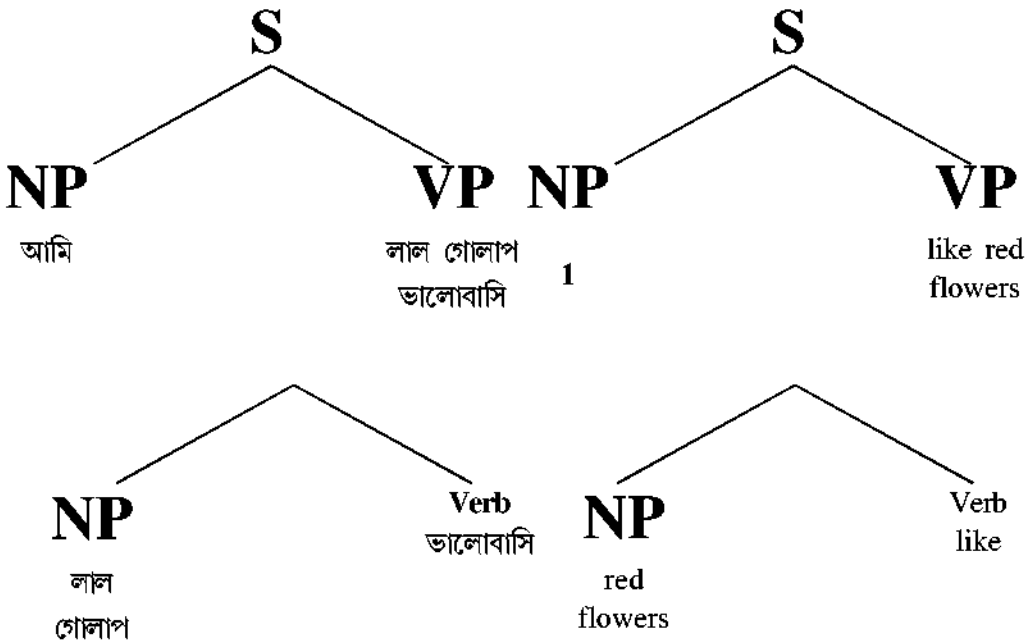

এখানে দেখা যাচ্ছে—বাংলায় object, Verb-এর আগে বসেছে আর ইংরাজিতে Object, Verb-এর পরে বসেছে। কাজেই দুই ভাষার মধ্যে বাক্যের গঠনে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুই ভাষাতেই NP, VP আছে এবং দুইভাষার বাক্যেই Verb ও Object আছে। এই NP, VP এই Verb, Object ইত্যাদির ধারণা স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে সব ভাষাতেই থাকে। এই ধারণাগুলিই হল Linguistic Universals। অনেক ভাষাতে হয়তো বাহ্যগঠনে NP, VP ইত্যাদি ধরা পড়ে না। কিন্তু আন্তর গঠনে এগুলি থাকেই। যেমন, 'চলে এসো'। এই বাক্যে শুধু VP আছে কিন্তু NP 'তুমি' এখানে উহ্য আছে। কাজেই একথা বলা যায়, Linguistic Universals গুলি সমসময় ধরা পড়ে না। কিন্তু ভাষার অন্তর গঠনে তাদের অস্তিত্ব থাকেই।

১.৬ অনুশীলনী

১। প্রাচীন যুগে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে পরিচয় যায় সে সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখুন।

২। প্রাচীন যুগে গ্রিস ও রোমে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা কীভাবে হয়েছিল তার পরিচয় দিন।

৩। মধ্যযুগে এবং প্রাক্-আধুনিক পর্বে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের সেই চর্চার সাধারণ পরিচয় দিন।

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ পাণিনি, লিব্‌নিৎস, হার্ডার, উইলিয়াম জোন্স।

৫। গ্রিমের সূত্র কী ? উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে সূত্রটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। জার্মানিতে ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে রাস্ক, বপ ও হুমবোল্টের অবদান সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ আর. কে. রাস্ক ; ফ্রানৎস বপ ; হুমবোল্ট ; কার্ল ভের্নের।

৮। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অগাস্ট শ্লেইশার এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯। নব্য বৈয়াকরণ বলতে কী বোঝায় ? তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০। গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় ? এই ধারার প্রবর্তন করেন কে ? তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ পাসল (pasole) ও লাঁগ (langue) ; সমকালীন ও অতীতকালীন ভাষাসমীক্ষা (Synchronic ও diachronic study); Syntagmatc ও Paradigmatic relationship।

১২। ধ্বনিগত বিরোধ সম্পর্কে ক্রবেৎস্কয়ের আলোচনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন।

১৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ ইয়েল্‌মস্লেভ, ফ্রান্জ বোয়ার্স, এডওয়ার্ড সাপির।

১৪। আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড-এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৫। নোয়াম চমস্কির 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের' (Transformation Generative Grammar) তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ—আধুনিক ভাষাতত্ত্ব।

৩। R. H. Robins—A short History of Linguistics.

৪। John. T. Waterman—Perspectives in Linguistics.

৫। David Crystal—Linguistics.

৬। Emmon Bach—An Introduction to Transformation Grammar, 1964.

৭। C. L. Baker—Introduction to Generative Transformational Syntax. 1978.

একক ২ ❐ ভাষার শ্রেণিবিভাগ

গঠন

২.১ **উদ্দেশ্য**

২.২ **ভাষার বংশগত শ্রেণিবিভাগ**

২.৩ **ভাষার রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ**

২.৪ **অনুশীলনী**

২.৬ **গ্রন্থপঞ্জি**

২.১ উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ভাষা প্রচলিত। কয়েকটি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু মূলগত পার্থক্য থাকে। পৃথিবীতে যত রকমের ভাষা আছে তাদেরকে আমরা দুই শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যেমন, ভাষার বংশগত শ্রেণিবিভাগ এবং ভাষার রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে একথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীর ভাষাগুলি কয়েকটি আদি উৎসভাষা থেকে জন্মলাভ করেছে। যে সমস্ত ভাষা একই উৎসজাত তাদের ভাষার মূল ধ্বনি, ভাষার শব্দভাণ্ডার, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠনরীতির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে তাদের মূল শব্দভাণ্ডার basic vocabulary যেমন, সংখ্যাশব্দ, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কবাচক শব্দে, গৃহপালিত পশুর নামে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মবাচক শব্দে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক ভাষাপদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে যে এই আদি উৎসগুলিই হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ। পৃথিবীর প্রায় চারহাজার ভাষাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাষাবংশের বংশধর বলে মনে করা হয় ঃ—

১) ইন্দো-ইউরোপীয়

২) সেমেটিক বা সেমীয়

৩) হেমেটিক

৪) আলতাই বর্গ অথবা তুর্ক-মঙ্গোল-মাঞ্চু

৫) ফিন্নো-উগ্রীয়

৬) ককেশীয়

৭) ভোট চীনীয়

৮) দ্রাবিড়

৯) অস্টিক

১০) পাপুয়াবর্গ

১১) বান্টু

১২) উত্তর-পূর্ব-সীমান্তীয় ভাষা

১৩) এস্‌কিমো

১৪) আমেরিকার আদিম ভাষা সমূহ

এছাড়া আর কতকগুলি ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে যাদের কোনো গোষ্ঠীবন্ধনে আনা সম্ভব হয়নি, তাদের বলা হয় গোষ্ঠীবহির্ভূত ভাষা। যেমন (১) কোরীয়-জাপানি, (২) আইবেরীয়-বাস্ক, (৩) আন্দামানী, (৪) পাপুয়ান, (৫) তাস্‌মানীয়, (৬) সুদানী-গিনীয়, (৭) বুশমান-হটেন্টট, (৮) বুরুশাস্কী, (৯) লাতি (La-Ti), (১০) অস্ট্রেলীয় ইত্যাদি। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী এদের মধ্যে কয়েকটিকে স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী।

পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। এই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় লেখা কোনো গ্রন্থ বা প্রত্নলিপি পাওয়া যায়নি। তাই এই ভাষার আদিরূপ কেমন ছিল তা জানার কোনো উপায় নেই। এই মূলভাষা থেকে যেসব ভাষার জন্ম হয়েছে যেমন, প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত, আবেস্তীয়, গ্রিক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে মূল ভাষার একটি অনুমানসিদ্ধ রূপ (reconstructed language) তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। তাই এই ভাষাকে বলা হয় অনুমানসিদ্ধ ভাষা বা hypothetical Form এই আদিরূপটি যারা বলত তাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তাও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। কিছু ভারতীয় পণ্ডিতের ধারণা ভারতবর্ষই প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পীঠস্থান আবার কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ ছিল এই জাতির আদি বাসস্থান। আবার কারোর মতে রাশিয়ার উরাল পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশ বা উত্তর-পশ্চিমের কিরখিজ তৃণভূমিতে ছিল এদের আদি বাসস্থান। এই তিনটি মতের মধ্যে তৃতীয় মতটিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—

১) **ইন্দো-ইরানীয়** ঃ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় যে শাখাটি ভারতবর্ষ ও ইরানে প্রবেশ করে সেই শাখাটিকেই ইন্দো-ইরানীয় শাখা বলা হয়। ইন্দো-ইরানীয় শাখার যে উপশাখাটি ইরানে চলে যায় তা থেকে ক্রমে দুটি প্রাচীন ভাষার জন্ম হয় — আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসিক। আবেস্তীয় ভাষা হল জরাথুশ্‌-এ মতাবলম্বী পারসিকদের মূল ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তার' ভাষা। আর প্রাচীন পারসিক থেকে মধ্যযুগে পহ্লবী ভাষার এবং তা থেকে আধুনিক যুগে ফারসির জন্ম।

ইন্দো-ইরানীয় শাখার যে উপশাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাকেই আমরা ভারতীয় আর্যভাষা বলে থাকি। এই ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি প্রধান স্তর—(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৬০০ পর্যন্ত), (২) মধ্যভারতীয় আর্য (আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিঃ পর্যন্ত), (৩) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)। বাংলা নব্যভারতীয় আর্যভাষা। এই ভাষার জন্ম কোথা থেকে হয়েছে বলতে গেলে আমরা বলবো মাগধী প্রাকৃতের পূর্বী শাখা থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত বাংলাভাষার জননী নয়।

২) **বাল্‌তো-স্লাবিক** ঃ এই শাখার দুটি উপশাখা বাল্‌তিক ও স্লাবিক। বাল্‌তিক উপশাখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষা হল লিথুয়ানীয়ার ভাষা লিথুয়ানীয়। এই শাখার সাহিত্য সমৃদ্ধ ভাষা হল রুশ ভাষা।

৩) **আল্‌বানীয়** ঃ এই ভাষার প্রাচীন ইতিহাসকে সঠিক জানা যায় না। এই শাখার ভাষা আধুনিক আল্‌বানীয় আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে প্রচলিত। আর্মেনীয় ভাষার মতন এই ভাষাতেও লাতিন, গ্রিক, স্লাবিক এবং তুর্কি ভাণ্ডার প্রভাবের ফলে শব্দভাণ্ডার প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে।

৪) **আর্মেনীয়** ঃ আধুনিক আর্মেনীয় ভাষার দুটো শাখা ; (ক) পূর্বী শাখা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইরানে বলা হয় ; (২) পশ্চিমী শাখা বলা হয় তুরস্কে। আর্মেনীয় ভাষার ওপর ইরানীয় ভাষার প্রচুর প্রভাব পড়েছে। প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষা সংস্কৃত এবং লাতিনের মতন এখনও ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

৫) **গ্রিক** ঃ প্রাচীন সাহিত্যে সমৃদ্ধ গ্রিক ভাষার প্রাচীন রূপ গ্রিস দেশে, এশিয়া মাইনরে, সাইপ্রাস ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। গ্রিক ভাষার উপভাষা হল আত্তিক-ইওনিক দোরিক, আর্কাদিয়ান-সাইপ্রিয়ান, আয়োলিক, উত্তর-পশ্চিম গ্রিক ইত্যাদি। আয়োলিক উপভাষায় হোমারের ইলিয়াদ-ওদিসি এবং আত্তিক উপভাষায় পরবর্তী কালের উন্নত নাট্যসাহিত্য ও ক্লাসিকাল গদসাহিত্য রচিত হয়েছিল।

৬) **ইতালিক** ঃ এই শাখার প্রধান ভাষা লাতিন মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে লাতিন। রোমের বাইরে ব্যাপক ক্ষেত্রে লাতিনের বিস্তার ছিল। মধ্যযুগে পেরিয়ে ইতালিক ভাষা যখন আধুনিক যুগে পৌঁছায় তখন আধুনিক রোমান্‌স (Romance) ভাষাগুলির জন্ম হয়। এদের মধ্যে প্রধান হল—আধুনিক ইতালির ভাষা ইতালীয়, ফ্রান্সের ভাষা ফরাসি, স্পেনের ভাষা স্পেনীয়, পোর্তুগালের ভাষা পোর্তুগিজ ইত্যাদি।

৭) **কেল্‌তিক** ঃ ইতালিকের সাথে খুব সাদৃশ্যযুক্ত। এই শাখার প্রধান আধুনিক ভাষা হল আয়ার্ল্যান্ডের ভাষা আইরিশ্‌।

৮) **জার্মানিক** ঃ তিনটি আঞ্চলিক রূপ (ক) উত্তর জার্মানিক, (খ) পূর্ব জার্মানিক ও (গ) পশ্চিম জার্মানিক। উত্তর জার্মানিক শাখার আধুনিক ভাষা হল সুইডেনের ভাষা সুইডিশ, আইস্‌ল্যান্ডের ভাষা আইস্‌ল্যান্ডিক ইত্যাদি। পূর্ব জার্মানির শাখার কোনো আধুনিক ভাষা নেই। পশ্চিম জার্মানির শাখার আধুনিক ভাষা হল ইংরেজি, জার্মান এবং ওলন্দাজ ভাষা (Dutch)।

৯) **তোখারীয়** ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখাটি এখন লুপ্ত। এই শাখা থেকে জাত কোনো আধুনিক ভাষা নেই। চিনের অন্তর্গত তুর্কিস্থান থেকে এই ভাষার প্রাচীনতম নির্দশন কতকগুলি পুঁথি ও প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়।

১০) **হিত্তীয়** ঃ এশিয়া মাইনরের কাপাদোকিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত বাণমুখ লিপিতে অনেকগুলি প্রত্নলেখ এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এগুলি খ্রিঃ পূঃ বিংশ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হয়েছিল মনে হয়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন হিট্টি, সাম্রাজ্য, আনুমানিক ১৭৯৯ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বে সমৃদ্ধিলাভ করে। খননের ফলে এই সময়কার বহু দলিল আবিষ্কৃত হয়। বাণমুখ লিপিতে লেখা বলে সহজেই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। এছাড়াও অনেক নথি এ্যাকোডিয়ান ও সুমেরিয়ান ভাষায় লিখিত। ১৯১৫ সালে বি. হ্রোজনি হিট্টি ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলে শনাক্ত করেন। হিট্টি ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় কণ্ঠ ধ্বনি সংরক্ষিত। হিট্টি ভাষার ব্যাকরণও ইন্দো-ইরানীয় ও গ্রিক ভাষার তুলনায় অনেক সরল। হিট্টি ভাষার নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব তিনহাজার শতকে ছিল বলে ভাষাতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন।

২.৩ ভাষার রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ

বংশগত শ্রেণিবিন্যাস ছাড়া পৃথিবীর ভাষাগুলিকে আর একভাবে বর্গীকরণ করা হয় তা হল রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিন্যাস (Morphological classification of language)। রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিন্যাসে ভাষার রূপমূলের অন্তর্নিহিত গঠনপ্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাষাকে একই শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে কতকগুলি ভাষায় রূপমূলের গঠন, রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয়বিভক্তি সংযোগের আদর্শ, রূপমূলের পরিবর্তন, রূপমূলের অর্থগত দিক ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিন্যাসে ভাষার গঠনগত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয় সেজন্য এক্ষেত্রে ভাষারূপের অন্তর্নিহিত উপাদানের বৈশিষ্ট্যই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

রূপতত্ত্বানুগতভাবে পৃথিবীর ভাষাগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) অশৃঙ্খলিত বা অজৈব ভাষা (Inorganic languages) (২) শৃঙ্খলিত বা জৈব ভাষা (Organic languages)।

১) অশৃঙ্খলিত বা অজৈব ভাষা - এই ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়েও বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়। স্থানবিশেষে একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া এবং ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র রূপমূলের অবস্থান দ্বারা তার অর্থ এবং ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। এই জাতীয় ভাষার কোনো নিয়মতান্ত্রিক ব্যাকরণ নেই। চীনা ভাষা এই শ্রেণিভুক্ত। সুর চীনাভাষার খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কারণ এর পরিবর্তনে অর্থের পার্থক্য ঘটে। আদর্শ চীনা ভাষা থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে Wó Dá NI-(ওর্স র্তা নি) = আমি মারি তোমাকে। প্রথম শব্দটি কর্তা এবং তৃতীয় পদটি কর্ম। এই দুটি শব্দের অবস্থান বদল করলে এইরকম দাঁড়াবে Ni Dó Wō-(নি র্তা ওঅ) = তুমি মারো আমাকে। এই কারণে এদের অবস্থাননির্ভর ভাষা বা Positional Language ও বলা হয়ে থাকে।

২) শৃঙ্খলিত বা অজৈব ভাষা - এই শ্রেণির ভাষার বৈশিষ্ট্য হল যে, শব্দের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দ্বারা কিংবা শব্দের সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয়। পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষাই এই শ্রেণিভুক্ত। এদের তিনটি উপরিভাগ রয়েছে— (ক) সংযোগমূলক বা সমবায়ী (Incorporating), (খ) যৌগিক বা সমাতসাত্মক (Agghetinating) (গ) সমন্বয়ী, সাধিত বা সবিভক্তিক (Inflecting)।

(ক) সংযোগমূলক ভাষা ঃ এর আবার শ্রেণিভেদ রয়েছে—

অ) পূর্ণযোগমূলক ভাষা - এই শ্রেণির ভাষার বিভিন্ন শব্দের যোগে যে বাক্য গঠিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে একটি শব্দবাক্য (sentence-word)। প্রত্যেকটি শব্দের এক বা একাধিক অক্ষর বিলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র বৃহৎ শব্দে পরিণত হয় এবং তাই বাক্য। গ্রিণল্যান্ডের ভাষা এই শ্রেণিভুক্ত। এই ভাষা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে aulisariartorasunpok—'সে তাড়াতাড়ি করছে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য'। এটি একটি শব্দবাক্য। এই বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি হচ্ছে—aulisar 'মাছ ধরতে যাওয়া', peartor 'নিযুক্ত' এবং pinnesuarpok 'সে তাড়াতাড়ি করছে'। এই তিনটি রূপমূল একত্রিত হয়ে যখন একটি মাত্র বাক্য গঠন করছে তখন প্রত্যেকটি ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকার রেডইন্ডিয়ানদের অধিকাংশ ভাষাই পূর্ণসংযোগমূলক ভাষা। মেক্সিকোর আজটেক ভাষা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

ticoka = 'তুমি কাঁদছ'

nancokah = 'তোমরা সবাই কাঁদছ'

ticokas = 'তুমি কাঁদবে'

ticokaya = 'তুমি কাঁদছিলে'

আ) আংশিক সংযোগমূলক ভাষা ঃ এই ধরনের ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির আংশিক সংযুক্তিকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাষাতেও কোনো কোনো সময় বিভিন্ন ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহত্তর রূপমূলের সাহায্যে বাক্যগত অর্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ; রাস্ক ভাষায় কর্তা ও কর্মে সর্বনামের উপরিউক্ত সংযুক্ত বিদ্যমান। এই ভাষায় সর্বনামীয় পূরক ছাড়া ক্রিয়ার কোনো অস্তিত্ব নেই। যেমন dakarkiogt আমি এটা তার কাছে নিয়ে যাই,' nakarsu 'তুমি আমাকে বহন কর', hakart 'আমি তোমাকে বহন করি' ইত্যাদি আবার, বান্টু ভাষায় সর্বনামীয় কর্ম ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যেমন, simtanada 'আমরা এটা ভালোবাসি।' কিন্তু 'আমরা তাদের ভালোবাসি'।

খ) যৌগিক ভাষা ঃ যৌগিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শব্দের উপাদানগুলো এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় যে, এদের বিচ্ছিন্ন করলেও এদের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেকটি উপাদানের অর্থবহতা বজায় থাকে। এরা পরস্পর মিলিতভাবে কখনও শব্দবাক্য গঠন করে না। উদাহরণস্বরূপ তুর্কি ভাষার উল্লেখ করা যেতে পারে। তুর্কি ভাষায় পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক রূপ sev-mek 'ভালোবাসা' নঞর্থক রূপ হচ্ছে sev-me-mek 'না ভালবাসা', আত্মবাচক রূপ sev-in-mek 'নিজেকে ভালোবাসা', sev-ish-mek 'পরস্পরকে ভালবাসা' ইত্যাদি। যৌগিক ভাষা আবার চারটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত—

অ) উপসর্গ-যৌগিক

আ) অনুসর্গ-যৌগিক

ই) উপসর্গ-অনুসর্গ যৌগিক

ঈ) আংশিক যৌগিক

অ) উপসর্গ যৌগিক ঃ এই ভাষায় প্রত্যয়ের পরিবর্তে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। উপসর্গ বা পদের মূলসূচক চিহ্নগুলি অতিশয় শিথিলভাবে পদের আগে যুক্ত হয়। আফ্রিকার বান্টু গোষ্ঠীর ভাষা এই শ্রেণিভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ কাফির ভাষা থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। umuntu = মানুষ (একবচন) ; abantu = মানুষেরা (বহুবচন)। omuchle = সুদর্শন (একবচন) ; anachle (বহুবচন)। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একবচন বা বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়গুলি শব্দের আগে যুক্ত হচ্ছে।

আ) অনুসর্গ-যৌগিক ঃ এই ভাষায় পদের মূল্যসূচক চিহ্ন বা প্রত্যয় শব্দের শেষে শিথিলভাবে যুক্ত হয়। পৃথিবীর অনেক ভাষাই এই শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উরাল, আলতাই ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলো। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কানাড়া ভাষা থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ—

কর্তা - সেবকরু = সেবকেরা

কর্ম - সেবকরন্নু = সেবিকাদিগকে

করণ - সেবকরিন্দ = সেবকদের দ্বারা

সম্বন্ধ - সেবক-র = সেবকদিগের

বহুবচনের 'র' স্থানে 'ন' বসালেই একবচনের রূপ পাওয়া যায়। তাই এটি অনুসর্গ-যৌগিক ভাষা।

ই) উপসর্গ-অনুসর্গ-যৌগিক ঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই সব ভাষায় শব্দের পূর্বে বা পরে অথবা মধ্যে নানাপ্রকার প্রত্যয় অবাধে ব্যবহৃত হয়। মালয়ী ভাষা এই শ্রেণির ভাষার অন্যতম নিদর্শন।

ঈ) আংশিক-যৌগিক ঃ পলিনেশীয় ভাষাগুলো এই শ্রেণিভুক্ত। এই ভাষাগুলি মূলত ছিল যৌগিক। কিন্তু যখন এরা অন্য ভাষার সংস্পর্শে এল, তখন ক্রমশ এরা আংশিক যৌগিক ভাষায় পরিণত হল। নিউজিল্যান্ড তথা হাওয়াই দ্বীপের ভাষা আংশিক যৌগিক।

গ) সাধিত বা সবিভক্তিক ভাষা ঃ অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠী থেকে এই ভাষাবর্গের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির সম্পর্ক বিভিন্ন বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহায্যে স্থিরীকৃত হয়। এই প্রত্যয়গুলি শব্দের অপরিহার্য অংগ এবং অনেকসময় শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, এই প্রত্যয়গুলি কোনো বিশেষ শব্দ বা শব্দের অংশ। কিন্তু এরা এমনভাবে শব্দের সঙ্গে মিশে যায় যে এদের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণির ভাষার দুটি বিভাগ—

১) যেসব ভাষার ব্যাকরণের উপাদানগুলি বা বলা যায়, বিভক্তিগুলি অন্তর্ভাগীয় উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয় ; সেজন্য তারা শব্দের মধ্যে মিশে থাকে। সেমেটিক-হেমেটিক ভাষাগোষ্ঠী এই শ্রেণিভুক্ত। আরবি ভাষার মূল ধাতু 'qtl' থেকে আগত বিভিন্ন রূপ, যেমন qitl = শত্রু, qital = আঘাত, qatil = হত্যা করেছিল, qtila = সে নিহত হয়েছিল ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে ধাতুমূল গঠিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশের দ্বারা ব্যাকরণগত সম্পর্ক নির্দেশিত হয়েছে।

২) যেসব ভাষায় ব্যাকরণের উপাদানগুলি শব্দের বাহিরে যুক্ত হয় অর্থাৎ এখানে বহির্ভাগীয় উপসর্গ ও প্রত্যয়গুলি মূল শব্দের সংগে যুক্ত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির রূপমূল-গঠনে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সাধিত ভাষা। সংস্কৃত ও গ্রিকে 'অস' ধাতু (ইংরেজি verb 'to be') বর্তমানকালে প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তমপুরুষে হয় ঃ—

সংস্কৃত	গ্রিক	ইন্দো-ইউরোপীয়
অস্তি (asti)	esti	* esti
অস্তি (asi)	essi	*esi
অস্মি (asmi)	eimi	* esmi

এখানে মূল ধাতু সংস্কৃত 'অস' (গ্রিক - 'es') এর সঙ্গে প্রথম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ, উত্তমপুরুষে যথাক্রমে -ti, -si, -mi ইত্যাদি ধাতুবিভক্তিগুলো যুক্ত হয়েছে।

২.৪ অনুশীলনী

১। ভাষার বংশগত শ্রেণিবিভাগ বলতে কী বোঝায় ? বাংলা ভাষা কোন্ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ? ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। ভাষার রূপতত্ত্বাগত শ্রেণিবিভাগ বলতে কী বোঝায় ? রূপতত্ত্বানুগতভাবে পৃথিবীর ভাষাগুলিকে কতভাগে ভাগ করা যায় ? প্রত্যেকটি বিভাগের বিস্তারিত আলোচনা করুন ?

২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-আধুনিক ভাষাতত্ত্ব।

২। ডঃ রামেশ্বর শ'—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৩। Winfred P. Lehmann–Historical Linguistics : an Introduction.

একক ৩ ❐ প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ ব্যাকরণের সূত্রপাত

৩.৪ ব্যাকরণের সমস্যা

৩.৫ পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ

৩.৬ প্রাচ্যে ব্যাকরণ

৩.৬.১ বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণ

৩.৬.২ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব

৩.৬.৩ ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাব

৩.৭ প্রথাগত থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

৩.৮ গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব

৩.৮.১ ধ্বনিতত্ত্ব

৩.৮.২ রূপতত্ত্ব

৩.৮.৩ বাক্যতত্ত্ব

৩.৮.৪ অন্যান্য

৩.৮.৫ সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব

৩.৯ বাংলা ব্যাকরণ

৩.১০ কালানুক্রমিক বাংলা ব্যাকরণ

৩.১০.১ অষ্টাদশ শতাব্দী

৩.১০.২ ঊনবিংশ শতাব্দী

৩.১০.৩ বিংশ শতাব্দী

৩.১১ তুলনামূলক ঐতিহাসিক বাংলা ব্যাকরণ

৩.১২ বর্ণনামূলক বাংলা ব্যাকরণ

৩.১৩ সংবর্তনী সঞ্জননী বাংলা ব্যাকরণ

৩.১৪ উপভাষা তত্ত্ব ও সমাজ ভাষাতত্ত্ব

৩.১৫ বাংলা ভাষাতত্ত্ব

৩.১৬ এক নজরে বিংশ শতাব্দী

৩.১৭ সারাংশ

৩.১৮ অনুশীলনী

৩.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানতে পারবেন—

* ব্যাকরণ চর্চার সূত্রপাত।
* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্ভব
* প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যা
* প্রথাগত ব্যাকরণ থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে উত্তরণ
* আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিবর্তন
* অষ্টাদশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ চর্চার বিবর্তন।

৩.২ প্রস্তাবনা

রামেশ্বর শ বলেন - ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যথেচ্ছভাবে নির্বাচিত বাক্যমধ্যে বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত এমন কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিগত প্রতীক যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে।

এই ভাষাকে ঘিরে মানুষের জিজ্ঞাসার সূত্রপাত বহু প্রাচীন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে। ভাষা জিজ্ঞাসা-দ্যোতক একাধিক শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে—যেমন শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি। এরই মধ্যে ভাষাজিজ্ঞাসা অর্থে ব্যাকরণ বা ব্যাকরণ মানে ভাষাজিজ্ঞাসা—এই ধরনের একটি সমীকরণ বহু প্রাচীন যুগ থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ধারার ভাষাজিজ্ঞাসাতেই সহজলভ্য।

এই এককে আমরা ব্যাকরণ শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করব এবং আমাদের বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকরণের দুটি প্রধান ভাগ করব—প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান।

প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষাজিজ্ঞাসার সূচনা যুগ থেকে গ্রিক, লাতিন বা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের ছকে ফেলে ভাষাচিন্তার বা ব্যাকরণচিন্তার বিভিন্ন বিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে আলোচিত হবে ভাষাবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ভাষাবিশ্লেষণ বা ব্যাকরণ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিবর্তন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলি হল তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সঞ্জননী সংবর্তনী তত্ত্ব। আমাদের আলোচনায় ইতিমধ্যেই ভাষাবিজ্ঞানের এইসব প্রসঙ্গ এসেছে। এই আলোচনা পূর্ণসত্তার জন্য বর্তমান এককে তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি হবে। (দ্রষ্টব্য ঃ পর্যায় ৩ ঃ একক ১, ২, ৩)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান একাধিক তত্ত্বসমৃদ্ধ হলেও আমাদের বর্তমান পাঠক্রম যেহেতু বাংলার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ কেন্দ্রিক সেহেতু আমাদের আলোচনাতেও বর্ণনামূলক তত্ত্বই অধিক গুরুত্ব পাবে, এই এককে এবং এর পরবর্তী এককগুলিতেও অর্থাৎ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বলতে আমরা মূলত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকেই বোঝাব।

এ ছাড়াও আমরা ধরে নেব যে প্রথাগত ব্যাকরণই হল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পূর্বসূরী। প্রথাগত ব্যাকরণের বিভিন্ন সদর্থক-নঞর্থক পটভূমিকে ব্যবহার করে সূচনা সম্ভবপর হয়েছে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণের।

আমরা এখানে প্রথমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণচিন্তা ও তার সীমাবদ্ধতার কথা বলব ও তারপর আধুনিক ব্যাকরণের গঠন ও আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করব।

৩.৩ ব্যাকরণের সূত্রপাত

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তু ভাষা। ভাষা কী ? না, ভাষা এক অর্থে প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষের পড়ে পাওয়া সম্পত্তি। প্রতিটি মানুষই তার শিশুবয়সে স্বাভাবিকভাবে আপনা আপনিই তার নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে প্রচলিত ভাষাটি শিখে যায়। পবিত্র সরকারের কথা—"স্কুলে আসার আগেই আমরা যে যার ভাষা বলতে শিখে যাই। যে-কোনো মানবশিশু তিন বৎসর বয়সে তার ভাষা, অর্থাৎ পরিবেশে যে ভাষাটি বলা হয়, সেটি মোটামুটি বলতে শিখে যায়। ফলে শিশু যখন স্কুলে আসে তখন সে বলার ভাষাটিকে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে, কথা বলতে তার কোনো অসুবিধা হয় না ...। ... এই রকম একটা ভাষার 'অধিকার' নিয়েই সে স্কুলে পড়তে আসে।" (ভাষা জিজ্ঞাসা)

এই ভাষার অধিকার মানবশিশুকে বা মানুষকে কী দেয় ? ব্যাপকার্থে বলা যায় ভাষা তাকে মানবগোষ্ঠীর একজন বলে স্বীকৃতি দেয়—কারণ মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর ভাষা নেই। আর খুব সুনির্দিষ্ট অর্থে ভাষা তাকে একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে সেই ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে সেই ভাষার মাধ্যমে ভাবভালোবাসা, ধ্যানধারণা বিনিময় করে তাকে তার জীবনযাপন করার সুযোগ সুবিধে দেয়। এই সঙ্গে এও বলা যায় যে যার ভাষা ব্যবহার যত নিপুণ তার সামাজিকতাও তত নিপুণ—ফলে তার জীবনযাপনও উন্নততর। উন্নততর এই অর্থে যে সে তার চারপাশটাকে বুঝতে ও বোঝাতে পারে বেশি ভালো করে। আর যেখানেই এই ভাষার ভালো আর বাঁচার ভালোর মধ্যে একটা সরাসরি যোগাযোগ ঘটে যায় সেখানেই সচেতন মানুষের মনে ইচ্ছে জাগে ভাষাটাকে কীভাবে আরো ভালোভাবে, আরো ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যায় তা খতিয়ে দেখা। আর এই ইচ্ছেটাকে ঘিরে জেগে ওঠে ভাষা সম্বন্ধীয় নানান বিশ্লেষণাত্মক মৌলিক প্রশ্ন—আমরা কী বলি, কীভাবে বলি, কেন বলি ইত্যাদি। এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতেই তৈরি হয় ভাষার ব্যাকরণ। বি + আ + ✓ কৃ + অনট্ = ব্যাকরণ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ব্যাকৃত করা অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করা—ভাষার গঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা।

সুতরাং বলা যায় যে সামাজিক মানুষের আত্মসচেতনার অন্যতম প্রতিফলন হল কোনো ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন।

৩.৪ ব্যাকরণের সমস্যা

আত্মসচেতনতা বা আত্মজিজ্ঞাসা থেকে ব্যাকরণের সূত্রপাত হলেও ব্যাকরণের ধারাবাহিকতার দিকে তাকালে অনেক সময়েই দেখা যায় যে ব্যাকরণ ভাষার বাস্তব অবস্থাটাকে ঠিক ঠাক ধরতে পারছে না। ব্যাকরণের নিয়মকানুনের জালে পড়ে আমাদের রোজকার চেনাপরিচিত ভাষাও যেন কেমন অচেনা জটিল ঠেকছে। অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু হলেও উত্তর খোঁজার পদ্ধতিটা খুব সহজ সরল হচ্ছে না, ফলে ব্যাকরণটাও হয়ে উঠেছে জটিল, সমস্যা সংকুল।

এর অন্তত দুটো কারণ দেখা যায় ঃ

(ক) অন্য কোনো ভাষার ব্যাকরণকে আদর্শ বা মডেল করে সেই ছকে নিজের ভাষার ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা এবং

(খ) নিজের ভাষারই কোনো প্রাচীনরূপ বা পূর্বসূরীর ব্যাকরণের আদর্শে আধুনিক ভাষার ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা।

প্রথমটির সঙ্গে তুলনীয় অন্যের জুতো বা জামায় নিজের পা বা গা গলানো আর দ্বিতীয়টি যেন নিজের শৈশবকালের জুতো বা জামায় বর্তমান কালে পা বা গা গলানো। দুক্ষেত্রেই যেমন খোলসের সঙ্গে শরীরের মাপের অসামঞ্জস্য থাকে ঠিক সেরকমই উপরোক্ত দুরকম ব্যাকরণিক চেষ্টার মধ্যেই ব্যাকরণের ছকের সঙ্গে ভাষার বাস্তব অবস্থাটা ঠিক খাপ খায় না। এবং জোর করে খাপ খাওয়াতে গেলে ব্যাকরণ অযৌক্তিক জটিলতায় ভারাক্রান্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের কথা। এই ব্যাকরণ কিছুটা সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছুটা ইংরেজি ব্যাকরণের আদলে লেখা। সংস্কৃত বাংলার পূর্বপুরুষ আর ইংরেজি হল অন্যভাষা যার সঙ্গে বাংলার আড়াইশো বছরের ওপর চেনাজানা। অর্থাৎ কিনা বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকে উপরোক্ত দুটি কারণই প্রভাবিত করেছে। ফলে এই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের বিবরণের সঙ্গে আমাদের মুখের বাংলা ভাষা বা মান্য বাংলার চেহারার মিলটা প্রায়শই অস্বচ্ছ। স্বচ্ছতা অর্জনের জন্য মডেল নির্ভরতা বর্জন করে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ প্রণয়ন প্রয়োজন। প্রবাল দাশগুপ্তর ভাষায়—"প্রথাবদ্ধ সংস্কৃত আর ইংরিজী ব্যাকরণের ভাণ্ডার থেকে এটা-সেটা ধার করে এনে জোড়া তালি দিয়ে তৈরি করা যে কাঠামো এখনকার বিদ্যালয় পাঠ্য 'বাঙলা ব্যাকরণ'-এ উপস্থাপিত সেই দুঃস্বপ্ন থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। উত্তীর্ণ হতে হবে বাংলা ভাষার প্রকৃত জ্ঞানের জগতে।" (কথার ক্রিয়াকর্ম)

ব্যাকরণের এই সমস্যা অবশ্য কোনো আধুনিক সমস্যা নয়, বা শুধুমাত্র বাংলা ভাষা-কেন্দ্রিকও নয়। এই সমস্যা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বহু ভাষার ব্যাকরণেই দেখা যায়। এই ধরণের সমস্যাসংকুল ব্যাকরণকে প্রথাগত ব্যাকরণ এবং সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার সচেতন চেষ্টায় প্রণীত ব্যাকরণকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত ব্যাকরণ আখ্যা দিয়ে আমরা এই দুই ধারার আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে প্রথমে পাশ্চাত্যে লাতিন ব্যাকরণের প্রভাব ও তারপর প্রাচ্যে বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃত ও ইংরেজির প্রভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। ব্যাকরণের এই প্রথাগত ধারার পর আলোচনা করব আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের।

৩.৫ পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে দু-জায়গাতেই ভাষা সম্বন্ধীয় ভাবনা চিন্তার সূত্রপাত প্রথমে ধর্মীয় ও পরে দার্শনিক চিন্তার হাত ধরে। তারও পরে ক্রমশ তা স্বতন্ত্র ভাষাচিন্তার রূপ নেয় ও স্বতন্ত্র ব্যাকরণের জন্ম দেয়।

ইউরোপে প্রথম স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনার গৌরব গ্রিকদের। প্রথম তিন গ্রিক বৈয়াকরণ হলেন দিওনুসিওস্ থ্রাক্স (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী), আপোলোনিওস্ দুস্কোলোস্ (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) ও তাঁর পুত্র হেরোদিয়ানুস্।

দিওনুসিওস্ থ্রাক্স প্রধানত রূপতত্ত্বের মূল কাঠামোর বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন। তিনি বাক্যের আট রকম পদবিভাগ করেন—noun, pronoun, article, verb adverb, participle, preposition ও conjunction ।

এর পরবর্তী সময়ে আপোলোনিওস্ দুস্কোলোস্ এর সঙ্গে যোগ করেন বাক্যতত্ত্বের বিধিবদ্ধ আলোচনা। তারপর হেরোদিয়ানুস্ গ্রিক ভাষার স্বরাঘাত-বিধি ও বিরাম-বিধি নিয়ে আলোচনা করেন।

এই তিন বৈয়াকরণের হাতে গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং এই পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের ছাঁদই ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে আদর্শ বা মডেল বলে গণ্য হয়। লাতিন ভাষার বৈয়াকণিকরা এই ছাঁদ অনুসরণ করে লাতিন ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং তাঁদের অনুকরণে এই ছাঁদ বা কাঠামো দীর্ঘকাল পর্যন্ত আধুনিক আর্যভাষাসমূহের ব্যাকরণ রচনায়ও অনুসৃত হয়েছে।

গ্রিক ব্যাকরণের তিনটি সীমাবদ্ধতা ছিল ঃ (ক) এই ব্যাকরণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বেশি।

(খ) গ্রিকরা ভাবত তাদের ব্যাকরণের কাঠামো সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—অর্থাৎ তা সর্বজনীন।

(গ) এই ব্যাকরণের আলোচ্য ভাষা কথ্য ভাষা নয়, সাহিত্যের ভাষা।

গ্রিক আদর্শে রচিত লাতিন ব্যাকরণের চরম বিকাশ হয়েছিল প্রিস্কিয়ানুস্-এর লাতিন ব্যাকরণে (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। তিনি ক্লাসিকাল লাতিন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত বাক্যের আট প্রকার পদ হল—noun, pronoun, verb, participle, adverb, preposition ও conjunction ।

মধ্যযুগে বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধ ব্যক্তির আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল ক্লাসিকাল লাতিনের চর্চা ও তার সহায়ক প্রিস্কিয়ানুস্-এর ব্যাকরণ অনুসরণ। এমনকি পরবর্তী যুগের লাতিন ব্যাকরণ সমূহও মূলত এই ব্যাকরণেরই অনুসারী। শুধু তাই নয়, এই লাতিন ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠেছিল যে লাতিন ভাষার ব্যাকরণের কাঠামো সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, এই ধারণার জন্ম গ্রিক ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা থেকেই। এর ফলে কোনো কোনো লাতিন ব্যাকরণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে ওই লাতিন ব্যাকরণটি প্রাচীন ইংরেজি ভাষারও ব্যাকরণের ভূমিকারূপে গৃহীত হতে পারে।

শুধু ইংরেজি নয়, পরবর্তীকালে ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ইত্যাদি আধুনিক ইউরোপীয় আর্যভাষার ব্যাকরণও রচিত হয় মূলত প্রিস্কিয়ানুস্-এর লাতিন ব্যাকরণের কাঠামো অনুসরণ করে, এমনকি ইংরেজি, জার্মান, আইরিশ প্রভৃতি যে সব ভাষা লাতিন ভাষা থেকে আসেনি তাদের ব্যাকরণেও লাতিনের প্রভাব খুব বেশি। এ সবেরই কারণ মধ্যযুগের সেই বদ্ধমূল ধারণা—লাতিন ব্যাকরণের কাঠামোই সব ভাষার সাধারণ ব্যাকরণের আদর্শ কাঠামো।

এর ফলে যা হল তা রামেশ্বর শ এর বর্ণনায়—"এই ধারণার ফলে ক্রমশ এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে, যা এই ব্যাকরণের নিয়ম মানে না সেই প্রয়োগ অশুদ্ধ। ফলে কোনটি শুদ্ধ, কোনটি অশুদ্ধ, এই বিচারই ব্যাকরণে স্থান পেতে থাকে এবং মনগড়া শুদ্ধ প্রয়েগের নির্দেশ দিতে থাকায় ব্যাকরণ ক্রমশ নির্দেশমূলক ব্যাকরণ হয়ে ওঠে।.....সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলতে পারি, পাশ্চাত্য দেশে ব্যাকরণের ধারাটি ছিল প্রথম দার্শনিক, পরে হয়ে উঠল নির্দেশমূলক। প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ মূলত মধ্যযুগীয় লাতিন

ব্যাকরণের আদর্শে রচিত নির্দেশমূলক ব্যাকরণই ছিল, একালে ইংরেজি ভাষার বহুপ্রচলিত নেসফিল্ড ব্যাকরণ তার প্রধান নিদর্শন।"

ইংরেজি প্রথাগত ব্যাকরণের আটটি পদ Part of speech বা এর অস্তিত্ব—nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions ও interjections।

এই আটটি শ্রেণির চরিত্র বড় বহুমুখী, ফলে তাদের বৈধতার মানদণ্ডও সমান বহুমুখী। অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে এদের বৈধতা বা সিদ্ধতার বিচার করা যায় না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল এই আটটি শ্রেণির সংজ্ঞা কোথাও পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় (ovelapping), কোথাও, বা পরস্পর বিরোধী (conflicting) আবার কোথাও বা যথেষ্ট অস্পষ্ট (vague)। অর্থাৎ যথেষ্ট অবৈজ্ঞানিক।

এই অবৈজ্ঞানিকতার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রথাগতভাবে Parts of speech-এর শ্রেণিকরণ অর্থভিত্তিক। যেমন, noun হল ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ, কার্য, সম্পর্ক ইত্যাদির নাম adjectives গুণ নির্দেশ করে ; Verb কাজ, অবস্থা, অনুভূতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে। এবার কয়েকটি উদাহরণের দিকে তাকানো যাক।

১) The tall boy is coming.

২) Tallness is desired.

৩) I always walk fast.

৪) I am going for a walk.

১ম বাক্যে tall (লম্বা) হল, অর্থাৎ সংজ্ঞা অনুযায়ী গুণনির্দেশক শব্দ, আর ২য় বাক্যে tallness (লম্বাত্ব/দীর্ঘতা) হল, অর্থাৎ সংজ্ঞা অনুযায়ী গুণনাম কিন্তু এখানে মুশকিলটা এই যে tall কেন গুণনির্দেশক এবং কেনই বা tallness গুণনাম তার হদিশ কিন্তু সংজ্ঞায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তার হদিশ পাওয়া যায় শব্দ দুটির চেহারায় কিছুটা এবং বাক্যে তাদের ব্যবহারে বাকিটা, এসবের নির্দেশ কিন্তু সংজ্ঞায় দেওয়া নেই। সংজ্ঞা অর্থনির্ভর এবং অর্থের দিক দিয়ে শব্দদুটির মধ্যে প্রভূত মিল। অর্থাৎ সংজ্ঞা শ্রেণিকরণের মূলসূত্রটিকে ধরতে পারেনি।

৩য় বাক্যে walk (হাঁটা) হল, সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজ ও ৪র্থ বাক্যে (walk) (পায়চারি হল) noun, সংজ্ঞা অনুযায়ী কার্য-নাম। এই উদাহরণ দুটিতে সংজ্ঞার মুশকিলটা আরও ভালোভাবে পরিস্ফুট। এখানে বাক্য দুটির উপস্থিতি বা পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া দুটি walk এর কোনটি verb আর কোনটি noun তা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সংজ্ঞা এখানে শব্দের শ্রেণি চেনাতে পুরোপুরি ব্যর্থ। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রথাগত ব্যাকরণের parts-of-speech-এর সংজ্ঞার বৈধতার প্রশ্ন ওঠেই। এছাড়াও সংজ্ঞায় ইত্যাদি প্রভৃতি (etc)-র অস্তিত্ব, লজিকের নিয়ম অনুযায়ী, সংজ্ঞার গুরুত্ব খর্ব করে।

এতো গেল প্রথাগত ব্যাকরণের একধরনের সীমাবদ্ধতার কথা। এছাড়াও নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান এই সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে অর্থকে নয়, শব্দের গঠন ও বাক্যে তার ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে parts-of-speech এর সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করে। এর একটি অতি সরলীকৃত উদাহরণ হল—ইংরেজিতে adjective বলে গণ্য হবে সেই শ্রেণিভুক্ত শব্দরা যারা প্রথমত er ও est প্রত্যয় গ্রহণ করে, যেমন—

tall	rich	strong	weak
taller	richer	stronger	weaker
tallest	richest	strongest	weakest ইত্যাদি

দ্বিতীয়ত যারা বাক্যে adjective এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহৃত হবে, যেমন The tall man is coming.

এই নিয়ম অনুযায়ী handsome শব্দটি ১ম শর্ত পূরণ না করলেও (ইংরেজিতে handsomers বা শব্দ handsomest হয় না) ২য় শর্ত পূরণ করে। কারণ ইংরেজিতে বলা যায়।

The handsome man is coming.

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত ইংরেজি ব্যাকরণ আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়। সমস্যা ও সমাধান বোঝাবার জন্য পায়ে পায়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর জটিলতায় না জড়িয়ে প্রসঙ্গান্তর থেকে ফিরে যাই ল্যাতিন অধ্যুষিত পাশ্চাত্য প্রথাগত ব্যাকরণে এবং এই আলোচনার ইতি টানি রামেশ্বর শ-এর অনুসরণে।

"মধ্যযুগের নির্দেশমূলক ব্যাকরণের অবদান বিচার করতে গেলে মনে হয়, এই বৈয়াকরণরা সমাজে প্রচলিত ভাষার বাস্তবরূপ না দেখে ঐতিহ্যগত বা মনগড়া তত্ত্বের মানদণ্ডে ভাষার তথাকথিত শুদ্ধরূপ ধরে রাখার জন্য নির্দেশমূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, তাতে ভাষার জীবন্তরূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল। এতে লাতিন ভাষা ক্রমশ ব্যাকরণের জালে বাঁধা পড়ে কৃত্রিম হয়ে মৃত ভাষায় পরিণত হয়ে যায়, অন্যদিকে লোকমুখে ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ব্যাকরণের শাসন উপেক্ষা করে চলতেই থাকে। এর ফলে জীবন্ত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে এবং লাতিন ব্যাকরণ কৃত্রিম ভাষার ব্যাকরণে পর্যবসিত হয়।"

এই হল পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ধারণা।

৩.৬ প্রাচ্যে ব্যাকরণ

প্রাচ্য, বিশেষত ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে, লাতিন ব্যাকরণের স্থান গ্রহণ করে সংস্কৃত ব্যাকরণ। বস্তুত কালের বিচারে লাতিন ব্যাকরণের তুলনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন।

যেহেতু বর্তমান পাঠ্যক্রমের যাবতীয় আলোচনাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কেন্দ্রিক তাই আমরা প্রাচ্য ব্যাকরণের আলোচনা শুরু করব বাংলার পূর্বসূরী ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাকরণের প্রেক্ষাপটে এবং পৌঁছব বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায়। আলোচনা এই পরিসরেই সীমিত থাকবে। আর এই পরিসরের একটি তুলনামূলক ছবি পাওয়ার জন্য তো আমরা ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য ব্যাকরণ ধারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে বহু শ্রুত, বহু পঠিত ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে বহুল প্রচারিত হল পাণিনির অষ্টাধ্যয়ী ব্যাকরণ। পাণিনি ও তাঁর অষ্টাধ্যয়ীর কালনির্ণয় আজও অমীমাংসিত। বিভিন্ন মতের অন্যতম হল ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।

পাণিনির ব্যাকরণ গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী অনেক বৈয়াকরণের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যার ভিত্তিতে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়—(ক) ভারতীয় ব্যাকরণের ঐতিহ্যের ধারা পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন, এবং (খ) ভারতীয় ব্যাকরণের ঐতিহ্য পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের তুলনায় বহু প্রাচীন।

ব্যাকরণের ভারতীয় ঐতিহ্যের শুরু যেমন পাণিনির আগে তেমনই পাণিনির পরবর্তী সময়েও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত। এই অত্যন্ত সমৃদ্ধ ব্যাকরণ ধারার কয়েকজন বৈয়াকরণের নাম—পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, জয়াদিত্য, বামন, কৈয়্যট, ভট্টোজি দীক্ষিত, হেমচন্দ্র, শর্ববর্মা, অনুভূতি স্বরূপাচার্য বোপদেব, ক্রমদীশ্বর, রূপগোস্বামী, কোন্ডভট্ট, জগদীশ, তর্কালংকার, গঙ্গাধর ইত্যাদি।

ভারতবর্ষব্যাপী সংস্কৃত ব্যাকরণের এই সমৃদ্ধে ঐতিহ্য যে পরবর্তীকালে পালি প্রাকৃত ব্যাকরণ সমূহকে এবং আরও পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ব্যাকরণকে প্রভাবিত করবে তা বলাই বাহুল্য।

৩.৬.১ বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণ

বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আমরা বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকে বেছে নিচ্ছি কারণ এই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত এবং এই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণগুলিই আমাদের সামনে বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যাগুলো তুলে ধরে।

বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ বিষয়ে উল্লেখ্য যে এই ব্যাকরণগুলির ওপর দুটি প্রধান ব্যাকরণিক প্রভাব দেখা যায়। (ক) সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব—যার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। (খ) ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাব—যার কারণ এদেশে ইংরেজের দীর্ঘকালীন উপনিবেশ এবং তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার চর্চা।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আমাদের ৩ অংশে উল্লিখিত ভাষার ব্যাকরণে জটিলতা আমদানির দুটি কারণই বাংলা ব্যাকরণে উপস্থিত। প্রথম কারণ অনুযায়ী অন্য ভাষা ইংরেজির ব্যাকরণকে মডেল করে বাংলা ব্যাকরণের কোনো কোনো অংশ প্রণীত, আর দ্বিতীয় কারণ অনুযায়ী পূর্বসূরী সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে বাংলা ব্যাকরণের কোনো কোনো অংশ প্রণীত।

এখন আমরা বাংলা ব্যাকরণের এই দ্বিবিধ কারণ জনিত দ্বিবিধ সমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

৩.৬.২ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব

এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ বাংলা ব্যাকরণের দু-একটি অংশের উল্লেখ করব।

প্রথমত বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের আলোচনায় অবশ্যম্ভাবীভাবেই আসে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় বিশ্লেষণ। প্রতিটি তৎসম শব্দের, তা বাংলায় যতই কম ব্যবহার হোক না কেন, সংস্কৃত কৃৎ তদ্ধিত প্রত্যয়ের রীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন—

নয়ন = ✓ নী + ল্যুট্ / অনট্	মৃত = ✓ মৃ + ক্ত
ভীষণ = ✓ ভীষ্ + ল্যুট্ / অনট্	নত = ✓ নস্ + ক্ত
বিধান = ✓ বি- ধান + ল্যুট্ / অনট্	উক্ত = ✓ বচ্ + ক্ত
	ছিন্ন = ✓ ছিদ্ + ক্ত
	রূঢ় = ✓ রুহ্ + ক্ত
কৃতি = ✓ কৃ + ক্তি	জিজ্ঞাসা = ✓ জ্ঞা + সন্ + টাপ্
শান্তি = ✓ শম্ + ক্তি	সহিষ্ণু = ✓ সহ + ইষ্ণু
সুপ্তি = ✓ স্বপ্ + ক্তি	জিষ্ণু = ✓ জি + ষ্ণুক
গ্লানি = ✓ গ্লা + ক্তি	ইত্যাদি।

শব্দ বিশ্লেষণের এই রীতি কিন্তু সাধারণ বাংলাভাষীর কাছে যথেষ্ট অস্বচ্ছ। বাংলা ব্যাকরণে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণহীন অবস্থায় এই সংস্কৃত প্রত্যয়গুলির সংযুক্তি মনে কোনো সম্পূর্ণ ধারণা জন্ম দেয় না। এবং এদের

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও বাংলা ব্যাকরণের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। অর্থাৎ সাধারণ বাংলা ব্যাকরণে এই সংযুক্তির কোনো সার্থকতা নেই। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে ওপরের শব্দগুলো এবং এরকম অনেক তৎসম শব্দই সম্পূর্ণ গঠিত শব্দরূপেরই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। তাছাড়াও যে ধাতুগলি থেকে শব্দগুলি তৈরি হয়েছে (যেমন—নী, ধা, সৃ, বচ্, জ্ঞা, কৃ, গ্লা ইত্যাদি) সেই ধাতুগুলি বাংলা নয়, বাংলায় তাদের অস্তিত্ব নেই। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে, যেমন শব্দের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ জানার এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ দেখাই বিধেয়। বাংলা ব্যাকরণকে অযথা জটিলতা ভারাক্রান্ত করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃতের অনুসরণে কারকের সংখ্যা দেখানো হয় ছয়-কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পবিত্র সরকার পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে বাংলায় সম্প্রদান কারক নেই। অর্থাৎ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারকের সংযুক্তি ব্যাকরণকে জটিল ও অযৌক্তিক করে তোলে মাত্র।

তৃতীয়ত, বাংলা লেখার বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা ও ক্রম এবং বানান পদ্ধতি সংস্কৃতানুগ হওয়ায় বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনি বর্ণনা ও বানান সংক্রান্ত আলোচনা-নত্ববিধি-ষত্ববিধি ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করে। বাংলা ধ্বনির আলোচনায় ধ্বনির সঙ্গে বর্ণের সংখ্যার সামঞ্জস্য থাকে না, যেমন বাংলা স্বরধ্বনি সাতটি, কিন্তু স্বরবর্ণ এগারোটা, নাসিক্য ধ্বনি তিনটি, কিন্তু নাসিক বর্ণ পাঁচটা। তারপর বানানের ক্ষেত্রে আছে ণত্বষত্বের বিধান যা শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সব সংযুক্তি বাংলা ব্যাকরণকে জটিল ও অবৈজ্ঞানিক করে তোলে।

এছাড়াও বাংলা ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, বিশেষণের তারতম্যের (তর-তম), লিঙ্গ, ক্রিয়া ইত্যাদি যেদিকেই তাকাই না কেন অজস্র ছড়াছড়ি দেখা যায়, এই সব নিয়ম বাংলার গুরুগম্ভীর সাধু লেখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিয়দংশে প্রযোজ্য, কিন্তু রোজের মুখের বাংলা ও চলিত লেখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নেহাতই বাহুল্য।

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভাবিত বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণ বাংলা ভাষার নিজস্ব চালচলন থেকে অনেকটাই দূরবর্তী, অর্থাৎ কিনা তা বাংলা ভাষার নিজস্ব ঠিকঠাক ব্যাকরণ নয়।

৩.৬.৩ ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাব

বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে কারণ বাংলা সংস্কৃতের উত্তরসূরী। আর ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাবের কারণ হল অনেকদিন ইংরেজির পাশাপাশি বসবাস, ফলে ইংরেজি থেকে বহু উপকরণ গ্রহণ। উপরন্তু প্রথম যুগের বাংলা ব্যাকরণগুলো বিদেশিদের মূলত ইংরেজদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে, তথোপযুক্ত রূপে গৃহীত উপকরণের মধ্যে একটি হল বাংলা লেখার নিয়মকানুন, যথা—অনুচ্ছেদ, পঙ্‌ক্তিভাগ, কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ, হাইফেন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, বিস্ময়সূচক ও প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার, বাংলায় দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো ছেদ চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। ইংরেজির উপকরণ গ্রহণ করার ফলে বাংলা লেখার সৌষ্ঠব বেড়েছে ও ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু যেখানে বাংলার নিজস্ব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে অযথা উপকরণ আমদানি করে সেই ছাঁচে বাংলাকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেই এসেছে ব্যাকরণের জটিলতা। এইরকম একটি ক্ষেত্র হল বাংলা বাচ্য। বাংলার বাচ্য পরিবর্তন পদ্ধতি সংস্কৃত বা ইংরেজির মতো নয়। অনেক সময়েই ইংরেজির কর্তৃবাচ্যের থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম বাংলায় প্রয়োগ করে বাংলার বাচ্য বিশ্লেষণ করা হয়। আর তার ফলে তৈরি হয় নানা ধরনের কৃত্রিম উদাহরণ। যেমন—

তৃষ্ণা ফুলের মালা গেঁথেছে → তৃষ্ণার দ্বারা ফুলের মালা গাঁথা হয়েছে।

কে বাবলাকে দোকানে পাঠিয়েছে → বাবলা কার দ্বারা দোকানে প্রেরিত হয়েছে?

রহিমা কি সাবিনাকে চিঠি দিয়েছে? → সাবিনা কি রহিমা কর্তৃক চিঠিটা প্রদত্ত হয়েছে?

কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত ডানদিকের বাক্যগুলো বাংলার স্বাভাবিক নিজস্ব বাক্য নয়, তাই এগুলো শুনতেও অত্যন্ত কৃত্রিম। মূলত ইংরেজি বাচ্য পরিবর্তনের ছাঁচে ফেলে এই বাচ্য পরিবর্তন করা হয়েছে বলেই এই বিপর্যয়।

শুধুমাত্র বাচ্যই নয় বাক্য বিশ্লেষণের অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়মকানুন দ্বারা প্রভাবিত।

এর কারণ হল সংস্কৃত ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণের পরম্পরা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। বাক্য বিশ্লেষণের রীতিপদ্ধতি ইংরেজি ব্যাকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে বাংলা ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণের ধারণা যেমন এসেছে ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে ঠিক তেমনই এই ধারণার হাত ধরে বাংলা ব্যাকরণে ঢুকে পড়েছে ইংরেজি বাক্য বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়মকানুন।

৩.৭ প্রথাগত থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা আলোচনার পর আমরা আলোচনা করব প্রথাগত ব্যাকরণ থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিবর্তনের চিত্রটা। পূর্ববর্তী এককসমূহে ইতিমধ্যেই বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়েছে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে চর্চার ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর। এখানে তাই আমরা দু-এক কথায় তারই পুনরাবৃত্তি করে আলোচনা করব গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

আগেই বলেছি যে প্রথাগত ব্যাকরণ চর্চার ধারা ক্রমশ হয়ে উঠল নির্দেশমূলক ব্যাকরণ চর্চা। এর কারণ ভাষার তথাকথিত শুদ্ধ রূপ ধরে রাখার চেষ্টা। আর এর ফলাফল জীবন্ত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের দুস্তর ব্যবধানের সূত্রপাত।

নির্দেশমূলক ব্যাকরণের এই আধিপত্য দেখা যায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ধারাতেই এবং আধিপত্য প্রধানত গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচীন ভাষারূপকে কেন্দ্র করে। ইয়োরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের পর ব্যাকরণের এই নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র প্রাচীন ভাষাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা আরোপিত হয়েছে জীবন্ত মাতৃভাষার ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রেও। আজও বাংলা বা ইংরেজি ভাষার অনেক স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণেই এই নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ছায়া বর্তমান।

ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে এর পরবর্তী যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ও তার চর্চা হয় ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারাই। এই নতুন ধারা তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যে নবজাগরণের যুগে বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক অভিযান ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এর ফলে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার মিল অমিল যতই স্পষ্ট হতে থাকে ততই ক্রমে ক্রমে ভাষাতত্ত্ব বিদ্‌দের মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ কলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তাঁর বক্তৃতায় গ্রিক, লাতিন, গথিক, কেলতিক, প্রাচীন পারসিক, আবেস্তান প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্যের সূত্রটি প্রথম ধরিয়ে দেন এবং এই সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই ভাষাগুলির অভিন্ন বংশগত উৎসের ইঙ্গিত দেন।

পরবর্তীকালে এই সাদৃশ্যসূত্রের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

পরবর্তীকালে এরই পাশাপাশি গড়ে ওঠে একটি ভাষার কালক্রমিক বিবর্তনের ধারার চর্চা বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান সব সময়েই একটি ভাষা বা একটি সময়কে অতিক্রম করে ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করেছে। ফলে সর্বদাই একাধিক সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব এই ধরণের ব্যাকরণ চর্চাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই এই ধারাকে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বও আখ্যা দেওয়া হয়।

এই সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব-যুগের পরবর্তীকালে এসেছে গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ব্যাকরণ চর্চার ধারা। এই ধারায় কোনো একটি নির্দিষ্ট কালের কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষার বিভিন্ন গঠনগত উপাদানের বর্ণনা দেওয়া হয়। অর্থাৎ ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণের এই বর্ণনামূলক ভাষা বিজ্ঞান ; বিভিন্ন ভাষার অথবা একই ভাষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তুলনা করার মতো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও প্রথাগত ও নির্দেশমূলক ব্যাকরণ ধারার পরে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত ভাষাতত্ত্বের হাত ধরে, তবুও পরবর্তী এককগুলিতে আমরা বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা আঁকব বর্ণনামূলক ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কারণ আমাদের পাঠ্যসূচিতে ব্যাকরণের সাধারণ উদ্দেশ্যই, অর্থাৎ বাংলা ভাষার গঠন বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য। কোনো তুলনামূলক বিশেষ উদ্দেশ্য এ পাঠ্যসূচির লক্ষ্য নয়।

অর্থাৎ আমরা আমাদের পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্যর সঙ্গে সংগতি রেখে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বলতে বোঝাব মূলত ভাষার গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ব্যাকরণকেই।

৩.৮ গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রথমে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুরের হাত ধরে এই ধারার প্রতিষ্ঠালাভ। বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান একছত্রাধিপত্য লাভ করে ; এবং এর চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেরিকা।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা।

রূপ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় ভাষার গাঠনিক উপাদানগুলির বিশ্লেষণ—কীভাবে বিভিন্ন ছোটো ছোটো এককের সমন্বয়ে বড়ো বড়ো এককগুলি গঠিত হচ্ছে বা বড়ো এককগুলিতে ক্ষুদ্রতর এককে বিভক্ত করা হচ্ছে। বিভিন্ন মাপের এককগুলি চিহ্নিত করা ও তাদের শ্রেণিবদ্ধ করা ইত্যাদিও হল বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি। মূলত ভাষার গঠন বিশ্লেষণ করে বলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্য নাম গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান, আর ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের রূপ বিশ্লেষণ করে বলে একে এককালিক ভাষাবিজ্ঞানও বলা হয়।

বস্তুত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান ও এককালিক ভাষাবিজ্ঞান এই তিনের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছেই। কিন্তু ব্যাপকার্থে এই তিনটিকে একই শ্রেণিভুক্ত বা সমার্থক মনে করা যায়। আমাদের এই পাঠ্যসূচিতে আমরা এই ব্যাপকার্থ অনুযায়ী এই তিনটিকে একই ধারার তিনটি ভিন্ন নাম হিসেবে ধরে নিচ্ছি।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার গাঠনিক উপাদানগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে বিশ্লেষণ করে—ধ্বনি, রূপ ও বাক। এই তিন স্তর অনুসারে, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি আলোচ্য বিভাগের নাম—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব।

রামেশ্বর শ-র ভাষায় "ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রথমেই দেখি যে, আমাদের ভাষা কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি। আমাদের বাক্‌প্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথম যে এক একটি নিটোল অর্থপূর্ণ বৃহত্তম একক পাই তা হল বাক্য। এই বাক্যকে আবার ক্ষুদ্রতর অংশে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি শব্দ পাই। আবার শব্দকেও যদি তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর অংশে বিশ্লিষ্ট করি তাহলে দেখব যে এক একটি শব্দ কতকগুলি ধ্বনি নিয়ে গঠিত। ধ্বনিকে আর আমরা তার চেয়ে কোনো ক্ষুদ্রতর উপাদানে ভাগ করতে পারি না। আমরা ধরে নিতে পারি যে, ভাষা-বিশ্লেষণের শেষ ধাপ হল ধ্বনি, এই ধ্বনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি যোগ করে আমরা ভাষার যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক পাই তাকে সাধারণ বলি শব্দ, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে শব্দ না বলে রূপিম বা মূলরূপই বলা উচিত ঃ কারণ 'মূলরূপ' ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। শব্দ অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টি বটে, কিন্তু তা সব সময় অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি নয়, কিন্তু মূলরূপ হল অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি। ধ্বনি পরের ধাপ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরটি হল 'রূপিম' বা 'মূলরূপে'র স্তর। এর পরের স্তরে আমরা দেখি, কতকগুলি মূলরূপ এবং শব্দ মিলে এক একটি বাক্য রচিত হয়। বাক্য হচ্ছে ভাষার তৃতীয় স্তর।"

তিনটি স্তরের পর আলোচনা করব তিনটি আলোচ্য বিভাগের—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্বের।

৩.৮.১ ধ্বনিতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা আবার দুটি উপরিভাগে বিন্যস্ত—ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচার বা ধ্বনিতত্ত্ব।

ধ্বনিবিজ্ঞান - কোনো ভাষার প্রতিটি ধ্বনিই প্রথমে বক্তা তার বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারণ করে, তারপর তা ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করে বাতাসে ভাসতে ভাসতে শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছায় এবং অবশেষে তা শ্রোতার কানের পর্দার থেকে স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে স্নায়ুতরঙ্গের রূপে তার মস্তিষ্কে পৌঁছায়। বাগ্‌ধ্বনির এই তিনটি অবস্থা অনুসারে, ধ্বনিবিজ্ঞান তার তিনটি উপশাখায় ধ্বনি আলোচনা করে। এই তিনটি হল—উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান ও শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান।

ধ্বনিবিচার বা ধ্বনিতত্ত্ব - এই শাখা কোনো ভাষায় মোট কটি মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্প আছে তা নির্ণয় করে। এই ধ্বনিকল্পগুলির অবস্থান বা প্রতিবেশ বিশেষে কী কী উচ্চারণে - বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্প হয় তা নির্ণয় করে ও তাদের শর্তাধীনতা বিচার করে। ভাষার প্রতিটি ধ্বনিকল্পের ভূমিকা ও অন্যান্য ধ্বনিকল্পের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ধারণ করে ধ্বনিতত্ত্ব। অর্থাৎ একটি ধ্বনিকল্পের সঙ্গে অপর ধ্বনিকল্প (সমূহের) সংযোগের ফলে কীভাবে বৃহত্তর একক তৈরি হয় তার নিয়ম প্রণয়ন করে ধ্বনিকল্প।

এইসব আলোচনা পরবর্তী এককগুলিতে বিস্তারিতভাবে আসবে। এখানে শুধু একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। ধ্বনিবিজ্ঞান উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ প্রকৃতি বিচার করে সাব্যস্ত করে যে বাংলা বাগ্‌ধ্বনি (বর্ণ নয়) শ একটি অঘোষ উষ্ম-তালব্য ধ্বনি। এবার ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা উচ্চারণে শ এর বিভিন্ন অবস্থান বিচার করে সিদ্ধান্ত আসে

যে বাংলায় শ্ একটি মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্প, প্রতিবেশ বিশেষে শ্ এর অপর একটি উচ্চারণ বৈচিত্র্য বা ধ্বনি বিকল্প আছে যা হল স্-উচ্চারণে শ্ এর অব্যবহিত পরে র্ বা ল্ এলে শ্ পরিণত হয় স্ এ যেমন শ্রী বা শ্লীল-এর (বানান যাই হোক) উচ্চারণ স্রী বা স্লীল।

৩.৮.২ রূপতত্ত্ব

একক বা একাধিক ধ্বনিকল্পের সংযোগে যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক তৈরি হয় তাকে রূপমূল বা রূপকল্প বলা হয়।

ভাষায় কত ধরনের রূপকল্প আছে, বিভিন্ন প্রতিবেশে তাদের কী কী রূপবিকল্প আছে, বিভিন্ন রূপকল্প জুড়ে জুড়ে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে কী কী শব্দ বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ হয়ে কি রকম শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ তৈরি হয় ইত্যাদি আলোচনা করে রূপতত্ত্ব। যেমন-বাংলায় সম্বন্ধ পদসূচক রূপকল্প হল-র, এর দুটি বিকল্প -র ও -এর। নদী এবং ঘর এই দুটি রূপকল্পের সঙ্গে সম্বন্ধ-রূপকল্প যোগ করে আমরা নদীর এবং ঘরের - এই শব্দরূপ পাই ইত্যাদি।

৩.৮.৩ বাক্যতত্ত্ব

এক বা একাধিক রূপকল্প ও শব্দকে জুড়ে মনের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় বাক্য। বাক্যের বিভিন্ন উপাদান পর পর সাজানোর বা জোড়ার নিয়ম নির্ধারণ করে বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্ব বাক্যের বিভিন্ন উপাদানকে অন্বিত করার নীতি নির্ণয় করে বলে এর অপর নাম অন্বয় তত্ত্ব।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চলিত বাংলায় নঞর্থক বাক্য বা বাক্যাংশে নঞর্থক শব্দটি বসে সমাপিকা ক্রিয়ার পর, কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে। যেমন - ঝিনুক না ডাকলে নান্দিক আসবে না।

৩.৮.৪ অন্যান্য

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠনগত এই তিনটি স্তর। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাষা সম্বন্ধীয় আরো কিছু কিছু জরুরি আলোচনা ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সীমানাকে আরও প্রসারিত করেছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হল উপভাষাবিজ্ঞান, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, ভাষা পরিকল্পনা, শৈলীবিজ্ঞান ইত্যাদি।

উপভাষা বিজ্ঞানে কোনো ভাষার ভৌগোলিক অঞ্চল বিচারে যে বিভিন্ন উপভাষার সৃষ্টি হয় তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন বাংলার উপভাষা হল রাঢ়ি বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডি।

সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানে সমাজের বিভিন্ন স্তর ভেদে ভাষা ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য তাই আলোচনা করা হয়। যেমন শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত আর রোয়াকে বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার দুটি রূপ।

ভাষাপরিকল্পনা ভাষাবিজ্ঞানের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে একটি দেশের জাতীয় ভাষা কী হবে, শিক্ষার মাধ্যম কোন্ ভাষা হবে, কোন্ ভাষার স্বীকৃতি প্রয়োজন, কোন ভাষার বিলুপ্ত প্রায় ভাষার সংরক্ষণের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষা দেশে ভাষাপরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

শৈলীবিজ্ঞান ভাষার, বিশেষত সাহিত্যের ভাষার শৈলী বিশ্লেষণ করে।

পরবর্তী এককসমূহে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের এই সমস্ত শাখা উপশাখার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার বর্ণনা-বিশ্লেষণ করা হবে।

৩.৮.৫ সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পরে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক সংযোজন হল সংবর্তনী তত্ত্ব—যার সূত্রপাত করেছেন নোয়াম চমস্কি।

গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার মনোগত দিকটি, তার ভাবগত অর্থগত দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভাষার বাহ্যগঠন তার অবয়বকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

চমস্কি ভাষার সৃজনশীলতার ওপর আলোকপাত করে ভাষার মনোগত দিকটিকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি বললেন যে, প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষ তার শৈশবেই তার মাতৃভাষা শুনে শুনে সেই মাতৃভাষার ব্যাকরণের মূল নিয়মগুলি তার সহজ বোধের সাহায্যে আপনা থেকেই শিখে নেয়। তারপরে ভাষার সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডার থেকে উপাদান চয়ন করে, ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ করে, সেই শব্দসম্ভারকে নিত্য নতুন রূপে সাজিয়ে অফুরন্ত নতুন বাক্য সৃষ্টি বা সঞ্জনন করে চলে। এই প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ হল সংবর্তন, যা এক বাক্যকে অন্য বাক্যে রূপান্তরিত করে। এই ব্যাকরণ তত্ত্বের অপর নাম রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ। চমস্কির প্রথম গ্রন্থ 'সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচার' ১৯৫৭ তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই নতুন তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা ভাষাবিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তোলে ও এক নতুন যুগের সূচনা করে।

চমস্কি তাঁর তত্ত্বে ভাষার সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভাষার মনোগত দিকটিকে গুরুত্ব দিলেন। তাঁর তত্ত্ব তাই মনস্তত্ত্বপ্রধান তত্ত্ব। অধুনা এই তত্ত্ব বহু চর্চিত, বহু বিতর্কিত ও বহু সম্ভাবনাময় শাখায় বিভক্ত। আর যেহেতু এই তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রধান, এবং মনোজগতের অতি সামান্যই মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন, তাই এই তত্ত্বের প্রতিটি পদক্ষেপেই তর্কের অবকাশ রাখে। সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ প্রণয়ন করা অসম্ভব। এ যাবৎ বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন টুকরো টুকরো অংশের উপর এই তত্ত্বের প্রয়োগনিরীক্ষা চলছে। তাই বর্তমান আলোচনায় আমরা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে চমস্কি তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করব না, বরং বর্ণনামূলক গঠনমূলক তত্ত্বেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

৩.৯ বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা সাহিত্য হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন হলেও বাংলা ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশিদের দ্বারা। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলা ব্যাকরণের প্রাচীন বইটি ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। এটি বিদেশি বৈয়াকরণদের হাতে লেখা। ১৭৪৩ থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য এবং বহু ধারার বাংলা ব্যাকরণ প্রণীত হয়েছে। এই অংশে আমরা বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন ধারা ও তার ওপর প্রাচ্যপাশ্চাত্যের বিভিন্ন ব্যাকরণতত্ত্বের প্রতিফলনের খুব সংক্ষিপ্ত এক পরিচয় দেব।

বাংলা ব্যাকরণের সূত্রপাতের যুগে ব্যাকরণ ও শব্দকোশ প্রায়শই হাত ধরাধরি করে চলেছে। যেমন ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, মনোএল আস্‌সুম্পসাঁউ প্রণীত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ 'বাঙ্গালা ও পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোশ দুইভাগে বিভক্ত' (Vocaburio em idioma Bengalla e protuguez dividido em duas partes)। এর কারণ তখন ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশীদের, বিশেষত ইংরেজদের বাংলা শেখানো। তাই বাংলা ভাষার নিয়মকানুনের সঙ্গে শব্দসম্ভার শেখানোও ছিল প্রয়োজনীয়।

এই প্রথম যুগের বাংলা ব্যাকরণগুলির বৈশিষ্ট্য হল—

১) ইংরেজদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত।

২) বিদেশি ও দেশি উভয় শ্রেণির লেখক-ই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন।

৩) প্রায়শই ইংরেজিতে লেখা।

৪) উপরোক্ত তিন কারণে এগুলি ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শ প্রভাবিত।

৫) কথ্য বাংলার ব্যাকরণ।

এর পরবর্তীকালে বিশেষত বাংলা ভাষার সাধু রীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত রীতিতে সাজানো হল। বর্তমানের স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে আজও সেই রীতির প্রভাব দেখা যায়।

এছাড়াও বাংলা ব্যাকরণের ধারায় বিভিন্ন সময়ে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও সঞ্জননী তত্ত্বের প্রভাবও দেখা যায়। যেহেতু এই সব ব্যাকরণতত্ত্বের চর্চার সূত্রপাত পাশ্চাত্যে তাই এই সব ধারার বাংলা ব্যাকরণেও পাশ্চাত্য প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষাতাত্ত্বিকগণ পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাগ্রহণ করে সেই নতুন ব্যাকরণ তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন বাংলা ভাষার ওপর। আরো লক্ষণীয় যে এইসব নতুন ধারার ব্যাকরণচর্চা কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে হয়ে চলেছে। হয়তো প্রাচীন প্রথাগত ব্যাকরণের ওপর বর্ণনামূলক ব্যাকরণের চিন্তাধারার অনেকটা প্রভাব পড়েছে, ফলে ব্যাকরণের চেহারা অনেকটাই আধুনিকতা পেয়েছে। কিন্তু এমন বলা যায় না যে প্রথাগত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। এর একটা প্রধান কারণ হল বর্তমানে বাংলা ব্যাকরণ ক্ষেত্রের সিংহভাগ দখল করে স্কুলপাঠ্য দ্বারা। এই সব পাঠক্রম ব্যাকরণের জগতের নতুন ভাবনা চিন্তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, বরং প্রথাগত ভাবনাচিন্তার ধারাকেই প্রাধান্য দেয়। ফলে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রভাব আজও অনস্বীকার্য।

অপর একটি কারণ হল অন্য ধারার ব্যাকরণের সংখ্যা স্বল্পতা। ঐতিহাসিক বা বর্ণনামূলক ধারার বাংলা ভাষার দু-একটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ আছে। সঞ্জননী ধারায় বাংলার আজ অবাধ কোনো সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নেই। এই হাতে গোনা কটি ব্যাকরণের পক্ষে আজ অবাধ বহুচর্চিত প্রথাগত ধারাকে নাড়ানো বা সরানো সম্ভব নয়।

এখানে আমরা প্রথমে নির্মল দাশের অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো ও তারপর ব্যাকরণের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারা ও বাংলা ব্যাকরণ চর্চা নিয়ে আরও দু-চার কথা বলব।

৩.১০ কালানুক্রমিক বাংলা ব্যাকরণ

১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে গত তিন দশকে উল্লেখ্য ব্যাকরণের সংখ্যা ও তারই দু-একটি করে নাম এখানে উল্লিখিত হবে।

৩.১০.১ অষ্টাদশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ব্যাকরণের সূত্রপাত বিদেশিদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে, বিদেশি পোর্তুগিজ মনোএল আসসুম্প সাঁউ প্রণীত ব্যাকরণের হাত ধরে, ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে। এর পরবর্তী ব্যাকরণ ১৭৭৮-এ প্রকাশিত হ্যালহেডের ব্যাকরণ। দুটিই বিদেশি ভাষায় রচিত।

৩.১০.২ ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ও বাংলা রচিত অসংখ্য বাংলা ব্যাকরণ রয়েছে।

ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রায় তেরটি বাংলা ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়— যার প্রণেতাগণ বিদেশি ও দেশি বাঙালি উভয়েই।

বিদেশিদের মধ্যে দুটি নাম হল শতাব্দীর প্রথম ১৮০১ এ প্রকাশিত উইলিয়াম কেরির বাংলা ব্যাকরণ। আর শতাব্দী শেষে ১৮৯১ প্রকাশিত জন বিমসের ব্যাকরণ।

দেশি বৈয়াকরণদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রামমোহন রায়, তাঁর ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণের প্রকাশকাল ১৮২৬।

ঊনবিংশ শতকে বাংলায় রচিত ব্যাকরণগুলির সূত্রপাত ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্তদেবের ব্যাকরণ দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় রচিত প্রায় বারোটি ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বৈয়াকরণদের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়, ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মতো দেশীয় পণ্ডিতগণ আছেন, তেমনই আছেন রেভারেণ্ড জেকিথ ও জন রবিনসনের মতো বিদেশি ব্যক্তিত্ব।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের বাংলায় রচিত ব্যাকরণগুলির সূত্রপাত ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্তদেবের ব্যাকরণ দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় রচিত প্রায় বারটি ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বৈয়াকরণদের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়, ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মতো দেশীয় পণ্ডিতগণ আছেন, তেমনই আছেন রেভারেণ্ড জেকিথ ও জন রবিসনসনের মতো বিদেশি ব্যক্তিত্ব।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের বাংলায় রচিত বাংলা ব্যাকরণগুলি প্রধানত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ এবং সংখ্যায় অনেক।

পঞ্চাশের দশকে প্রায় দশটি ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন শ্যামাচরণ সরকার।

ষাটের দশকে প্রকাশিত প্রায় তেইশটি ব্যাকরণ। এর মধ্যে লোহারাম শিরোরত্নের বাঙ্গালা ব্যাকরণের বত্রিশটি ও প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তীর সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণের পঁয়ত্রিশটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

সত্তরের দশকে উনত্রিশটি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। আশি ও নব্বই এর দশকের উল্লেখ্য ব্যাকরণ প্রায় আঠেরটি। এর মধ্যে উল্লেখ্য নাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, হৃষীকেশ শাস্ত্রী ইত্যাদি।

এই আশি নব্বইয়ের দশক থেকেই বাঙালির ব্যাকরণ-সচেতনতার চেহারা বদলাতে শুরু করে। চিন্তাশীল বৈয়াকরণদের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষার নিজস্ব আবেদন প্রাধান্য পেতে শুরু করে এবং তারই পাশাপাশি ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে এ যাবৎকাল অবধি রচিত বাংলা ব্যাকরণ সমূহের সীমাবদ্ধতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণির লোক কর্তৃক দুই প্যাটেন্টে প্রস্তুত হইয়াছে, একটি মুগ্ধবোধ প্যাটেন্ট, গ্রন্থকার মাষ্টারগণ।... এক প্যাটেন্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা আর এক প্যাটেন্টে ইংরেজি রুলগুলির তর্জমান।"

হৃষীকেশ শাস্ত্রী তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯০০) এর বিজ্ঞাপনে লেখেন—"আজ পর্যন্ত যতগুলি বাঙ্গালা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমুদায়কে সাধারণত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণির ব্যাকরণগুলি, সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া রচিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী নিয়মে

পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণির ব্যাকরণগুলি ইংরাজী ব্যাকরণের পদানুসরণে রচিত। সুতরাং উভয় শ্রেণির ব্যাকরণকে এক প্রকার লক্ষ্যভ্রষ্ট বলিলেই চলে।"

বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের পাশাপাশি দেখা যায় বাংলা চলিত ভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সচেতনতাও।

বাংলা ব্যাকরণের প্রথম যুগে যখন বিদেশিদের বাংলা শেখানোর জন্য ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল তখন ব্যাকরণ ছিল কথ্য ভাষা ভিত্তিক। কিন্তু সাহিত্যে সাধুভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ অনুযায়ী এবং বাংলা সাধুভাষার বিশ্লেষণ ভিত্তিক।

'সবুজপত্র' পত্রিকার যুগে প্রথম চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় বাংলা চলিত ভাষা সাহিত্যের আসরে ছাড়পত্র পায়, এই ঘটনারই সুদূরপ্রসারী ফল বাংলা ব্যাকরণে চলিত ভাষা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও কালক্রমে ব্যাকরণ চলিত ভাষার সংযুক্তি ও প্রাধান্য।

৩.১০.৩ বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতকে প্রথমে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ, বানান পদ্ধতির সরলীকরণ ও মান্যীকরণ ও চলিত ভাষার সপক্ষে আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সভায় প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধরী, যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রশান্ত চন্দ্র মহলনাবীশ, রাজশেখর বসু ইত্যাদি ব্যক্তিত্ববর্গ। উপরন্তু এই দেশজ নতুন ভাবনার পালে জাগে বিদেশের ভাষাবিজ্ঞান চর্চার আরেক নতুন হাওয়া।

এই নতুন পুরাতনের টানা পোড়েনের ফলে বিশ শতকের ব্যাকরণ চর্চার দুটি সমান্তরাল ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় আছে প্রথাগত ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ। এখানে দু-একটি ব্যতিক্রমী ব্যাকরণ ছাড়া বাকি সবই আগের শতকের ব্যাকরণগুলির অনুরূপ। দুটি ব্যতিক্রমী ব্যাকরণ হল (১) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যয়ের ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯) এর একটি সরল সংস্করণ সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ যা মূলত বর্ণনামূলক তত্ত্বের অনুসরণের রচিত। (২) পবিত্র সরকারের ভাষা জিজ্ঞাসা (১৯৮৯) যা বর্ণনামূলক তত্ত্ব ও স্কুলপাঠ্যক্রমক মেলানোর একটি সদর্থক প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় ধারাটিকে বলা যায় আধুনিক ব্যাকরণ ভাবনা ধারা। এই ধারার আবার দুটি উপধারা বর্তমান একটি উপধারায় রয়েছে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সোচ্চার যে সব চিন্তাবিদ্, যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বিশ শতকের শুরুতেই, তাঁদের এবং তাঁদের মতো আরও অনেকের নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ফসল প্রবন্ধ, পুস্তক ইত্যাদি। যেমন-রবীন্দ্রনাথের বই শব্দতত্ত্ব, বাংলাভাষা পরিচয়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ বাঙালা কৃৎ ও তদ্ধিত, কারণ-প্রকরণ, না, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ কথার কথা, ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ব্যাকরণ বিভীষিকা ইত্যাদি। এই ধারার প্রবন্ধ পুস্তকে বাংলা ভাষার আংশিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, কোনো সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নয়।

দ্বিতীয় উপধারা পুরোপুরি পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রভাবিত। এই উপধারা পুষ্ট হয়েছে মূলত তাঁদের দ্বারা যাঁরা পাশ্চাত্যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পাঠগ্রহণ করে সেই জ্ঞান বাংলা-ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ফলে এই উপধারার বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। সেই প্রতিফলনে গড়ে ওঠে বাংলার তুলনামূলক ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, সঞ্জননী

ব্যাকরণ, ভাষাশিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ, উপভাষা-সমাজ ভাষার বিশ্লেষণ ইত্যাদি। তবে এই উপধারার প্রবন্ধ-পুস্তকাদিও মূলত ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে নতুন পদ্ধতিতে সম্পাদিত গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধ। দু-চারটি ভিন্ন ভাষার আংশিক বিশ্লেষণ। ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নেই। এই ধারাটিকেই অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট অর্থে বলা যায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান।

এবার একটু তাকানো যাক আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিফলনের দিকে।

৩.১১ তুলনামূলক ঐতিহাসিক বাংলা ব্যাকরণ

এই তুলনামূলক ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ভর প্রধান এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থ হল সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের The origin and Development of the Bengali Language (১৯২৬), পরেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১৯৭৬)। এছাড়াও আছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্রীনাথ সেন, যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদির প্রবন্ধ ও গ্রন্থ।

বাংলা ব্যাকরণের তুলনামূলক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে যাঁদের ভাবনা চিন্তা গবেষণা পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছে তাঁদের কয়েকটি নাম-মহম্মদ আব্দুল হাই, সুনীল চৌধুরী, পুণ্যশ্লোক রায়, পবিত্র সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত, হুমায়ুন আজাদ ইত্যাদি।

৩.১২ বর্ণনামূলক বাংলা ব্যাকরণ

তুলনামূলক তত্ত্ব থেকে বর্ণনামূলক তত্ত্বে উত্তরণের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৩৯)। এই ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণে সর্বক্ষেত্রে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহৃত না হলেও বিশ্লেষণ পদ্ধতি মূলত বর্ণনামূলকই। নির্মল দাশের মতে বাংলা ব্যাকরণ চর্চার একটি নব পর্যায়ের শুরু এই ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তাঁর মতে, "এর লক্ষণ প্রয়োজনমতে ইংরেজি ও সংস্কৃতের সাপেক্ষতা করে বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করার চেষ্টা।"

আরেকটি উল্লেখ্য বর্ণমামূলক ব্যাকরণ হল পুণ্যশ্লোক রায়ের Bengali Language Handbook (১৯৬৬)।

এই বর্ণনামূলক ধারার আর একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র হল ভাষা শিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ রচনা। এই ধারায় দুটি উল্লেখ্য গ্রন্থ হল ই.সি.ডিমক, সোমদেব ভট্টাচার্য ও সুহাস চ্যাটার্জীর সম্মিলিত ব্যাকরণ Introduction to Bengali (১৯৬৪) ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও অশ্রু কুমার বসু An Intensive course in Bengali (১৯৮১)।

বর্ণনামূলক তত্ত্বে বাংলার বাংলা ও ইংরেজিতে আরো অনেক বিশ্লেষণ হয়েছে ও হচ্ছে। রচিত হচ্ছে বাংলা ভাষা শিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ ও self taught বা নিজে শেখো ধরনের বিশ্লেষণাত্মক বইও—

গবেষণামূলক ব্যাকরণচর্চায় বর্ণনামূলক তত্ত্বের প্রয়োগ আজ অনেক ব্যাপকতর হলেও স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সরলভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের ছাঁদই অদ্যাবিধি অব্যাহত। কোনো তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রতিফলন এখানে পাওয়া যায় না।

৩.১৩ সংবর্তনী-সঞ্জননী বাংলা ব্যাকরণ

বাংলায় সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত প্রবাল দাশগুপ্তর প্রবন্ধ চমস্কি, হালি, নত্ববিধান এবং ইত্যাদি তে ১৯৭১-এ। পরবর্তীকালে সত্তর, আশি ও নব্বই এর দশক জুড়ে অদ্যাবিধি বাংলা ও ইংরেজিতে অজস্র প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখেছেন পবিত্র সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে কিন্তু আজও এ ধারায় কোনো সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নেই।

৩.১৪ উপভাষাতত্ত্ব ও সমাজ ভাষাতত্ত্ব

বাংলা উপভাষা ও সমাজভাষার ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখ নাম হল মহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোপা হালদার, সুকুমার সেন, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, নির্মল দাশ ইত্যাদি।

৩.১৫ বাংলা ভাষাতত্ত্ব

ঊনবিংশ শতকের আর একটি অবদান হল বাংলা ভাষাতত্ত্বের টেক্সট বই রচনা। এর মধ্যে উল্লেখ হল—হেমন্ত কুমার সরকারের ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯২৩)—এটিই প্রথম বই। পরবর্তী যুগে বহুল প্রচলিত সুকুমার সেনের ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৯), ও রামেশ্বর শ-র সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৯৮৪)। এগুলি গবেষণামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ছাত্রপাঠ্যরূপ।

৩.১৬ এক নজরে বিংশ শতাব্দী

বিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণচর্চার ধারা রেখাচিত্রের নিম্নরূপভাবে দেখা যায় ঃ

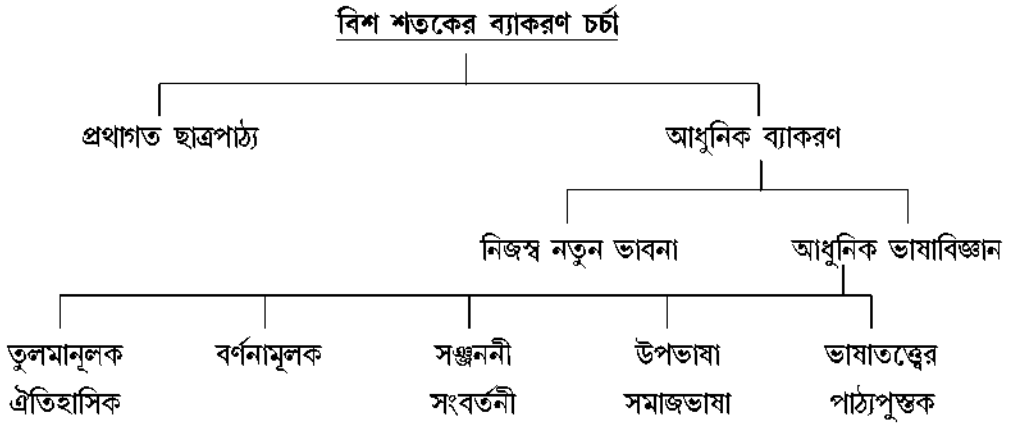

এর মধ্যে আধুনিক ব্যাকরণের ধারাটি সম্পূর্ণ গবেষণামূলক।

ঊনবিংশ শতকের শেষ সীমায় বাংলা ব্যাকরণচর্চা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলছেন—"ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না, উহা আবিষ্কার করে মাত্র। ..... ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্তত হইবে, ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে, তাহাতে ভয় কি ? ..... প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি বালকেরই পাঠ্য, উহা

বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়মে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা।"

বিংশ শতাব্দীর বাংলা ব্যাকরণচর্চায় তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সময়ের ব্যাকরণচর্চার দুটি সমান্তরাল ধারার মধ্যে প্রথাগত ছাত্রপাঠ্য ধারাটি 'বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত', এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারাটি হল ব্যাকরণ নামের বিজ্ঞানশাস্ত্র, যার উদ্দেশ্য 'ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার কর।' এই দ্বিতীয় ধারার মাধ্যমেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ চর্চার উত্তরণ বিশ্লেষণের এক অন্যতম স্তরে, এবং তারই হাত ধরে সূচনা বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসার এক মহত্তর পর্যায়ের।

৩.১৯ সারাংশ

এই এককে অংশত সাধারণত পরিপ্রেক্ষিতে এবং অংশত বাংলা ভাষার বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত ব্যাকরণচর্চার আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি হল—

১। সংস্কৃত গ্রিক-লাতিন ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্যাকরণ চর্চার সূত্রপাত।

২। সংস্কৃত গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণের আদর্শে আধুনিক ভাষাসমূহে প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্ভব।

৩। প্রথাগত ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা।

৪। বাংলা ও ইংরেজি প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যা।

৫। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত ও তার বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিবর্তন।

৬। তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব।

৭। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

৮। সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব।

৯। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ চর্চা—অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী।

১০। বিংশ শতকের বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যাকরণের পাশাপাশি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা।

৩.১৮ অনুশীলনী

১। **টীকা লিখুন ঃ**

ক) অষ্টাদশ শতকে বাংলা ব্যাকরণচর্চা।

খ) বাংলা আধুনিক ব্যাকরণে নিজস্ব নতুন ভাবনা ধারা

গ) গ্রিক ব্যাকরণ

ঘ) বাংলা সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণচর্চা

ঙ) ভাষা পরিকল্পনা

চ) তুলনামূলক ঐতিহাসিক বাংলা ব্যাকরণ

২। **অল্প কথায় পরিচয় দিন ঃ**

ক) সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব

খ) বিদেশি রচিত বাংলা ব্যাকরণ

গ) ধ্বনিতত্ত্ব

ঘ) সংস্কৃত ব্যাকরণ

৩। ক) উদাহরণ সহযোগে বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বুঝিয়ে দিন।

খ) ঊনবিংশ শতকের বাংলা ব্যাকরণচর্চার পরিচয় দিন।

গ) আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝেন ? আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের পরিচয় দিন।

ঘ) বাংলা আধুনিক ব্যাকরণ চর্চার বর্ণনা দিন।

৪। ক) উদাহরণ সহযোগে প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যা ও তার কারণ আলোচনা করুন।

খ) বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিভাগগুলির বিস্তারিত পরিচয় দিন।

গ) বিংশ শতকে বাংলা ব্যাকরণ চর্চার বর্ণনা দিন।

ঘ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ চর্চার রূপরেখা বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। নির্মল দাশ, ১৯৮৭, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ।

২। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

৩। সুকুমার সেন, ১৯৬৮, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টান পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪। Gleason, H. A. 1961. An Introduction to Descriptive Linguistics. Oxford & IBP Publishing Co. Delhi, Bombay, Calcutta.

৫। লিপ্যন্তর করুন ঃ

ক) সূর্য পূর্বদিকে ওঠে

খ) রাস্তায় জল জমেছে

গ) মোরা বাংলা দেশের থেকে এলাম

ঘ) একটি মোরগের কাহিনী

ঙ) বন্ধু, কী খবর বলো।

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৮৩ বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম খণ্ড) সারস্বত লাইব্রেরি, কোলকাতা।

২। পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য, ১৯৬৬ বাঙলা ভাষা জিজ্ঞাসা, কোলকাতা।

৩। মহম্মদ আব্দুল হাই, ১৯৬৫ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাঙলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাঙলা একাডেমি, ঢাকা।

৪। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণী, কোলকাতা।

৫। সুকুমার সেন, ১৯৬৮ ভাষার ইতিবৃত্ত ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কোলকাতা।

৬। Bhatacharya, Krishna, 1983, Bengali Phonetic Reader, CIIL, Mysore.

৭। Chatterji, S. K. 1928. A Bengali Phonetic Reader. University of London Press (also from Rupa, Kolkata).

৪.৯ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাংলা ধ্বনিগুলির পাশে বন্ধনীর মধ্যে সংকেতগুলি লিখুন উত্তরের নমুনা হিসাবে প্রথমটি করে দেওয়া আছে।

ক) ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি [bh]

খ) উচ্চ-মধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি [ ]

গ) বিবৃত কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি [ ]

ঘ) সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি [ ]

ঙ) কণ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি [ ]

চ) দন্তমূলীয় কম্পিত ধ্বনি [ ]

২। ক) ধ্বনিবিজ্ঞান কী ? ধ্বনিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আলোচনা করুন।

খ) বাগ্‌যন্ত্র কী ? বাগ্‌যন্ত্রে মুখ্য ও গৌণ কাজ বলতে কী বোঝেন তা আলোচনা করুন।

গ) বাংলা ধ্বনির উদাহরণ সহযোগে ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় করুন।

ঘ) উচ্চারক কী ? নিম্নস্থ উচ্চারকের পরিচয় দিন।

ঙ) বর্ণ ও ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় করুন।

চ) বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের ভূমিকা কী ? উদাহরণ সহাযোগে আলোচনা করুন।

৩। ক) ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

খ) বাংলায় মৌখিক, নাসিক্য ও অনুনাসিক ধ্বনির উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

গ) বাংলায় স্বরধ্বনি শ্রেণিকরণের মাপকাঠিগুলি আলোচনা করুন।

ঘ) উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন—উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে।

ঙ) বাংলায় স্বরধ্বনি কটি ? স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করুন।

চ) বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করুন।

ছ) উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি পরিবর্তন আলোচনা করুন।

৪। ক) ধ্বনির উচ্চারণে চারটি প্রধান দিক নিয়ে, উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

খ) বাংলা ধ্বনি উচ্চারণে বিভিন্ন উচ্চারকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

গ) বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি শ্রেণিকরণের মাপকাঠিগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করুন। বাংলা অবিভাজ্য ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করুন।

ঙ) ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি সত্যিই মরেছে রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে। হয় না, তবে না—হতে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, 'যা ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।' হনুমান এসে বললে কি, ফেলবারও দরকার হল না—সে এক্কেবারে মরে গেছে।'

সকলে। বাঃ বাঃ—একদম মরে গেছে। — ব্যাস। আর চাই কি, খুব ফুর্তি কর!

[বাইরে গোলমাল]

ঐ দেখ্ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান্ তো খুব কড়া।

জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি করলে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছে—'এক্কেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

লক্ষ্মণের শক্তিশেল/সুকুমার রায়

৪.৮ সারাংশ

ক) উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণের ৪টি জরুরি বিষয় হল ঃ

১) ফুসফুসের বহির্গামী বাতাস

২) ধ্বনিটি ঘোষ না অঘোষ

৩) ধ্বনিটি মৌখিক না নাসিক্য না অনুনাসিক

৪) ধ্বনিটি ব্যঞ্জন হলে তার উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণ প্রকৃতি ও মহাপ্রাণতা

ধ্বনিটি স্বর হলে তা জিভের কোন অংশের কোন উচ্চতায় ও কেমন আকৃতিতে উচ্চারিত হয়।

খ) বাংলায় ৩১টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ৭টি মৌখিক স্বরধ্বনি, ১টি অনুনাসিক ধ্বনি—মোট ৩৯টি বিভাজ্য ধ্বনি।

গ) বিভাজ্য ধ্বনিগুলির বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনও হয়।

ঘ) এছাড়াও সুরাঘাত, শ্বাসাঘাত, যতির মতো অবিভাজ্য ধ্বনিও আছে।

ঙ) IPA সংকেতের সাহায্যে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে লিপ্যন্তর বলে।

robi ṭhakur! indrojal chilo o name makhano amar ballokal theke. Karon bolchi. amar bɔẽs jɔkhon aṭ Kimba nɔẽ – paṭsalaẽ poṛi। ṭɔkhon amader hedmastar gɔgoncɔndro pal ækdin ækkhana SiSuptṭho boi theke ekṭi Kobita abraitti Korlen. Kobitaṭir dhoni o chɔndo kane jetei mɔntromuggher moto gɔgon cɔndro paler mukher dike eẽe theke SeS Porjonto Sunlam. Kobitar nam bɔyge SɔrOt – lekhɔker nam robindronath thakur.

bibhuti bhuSɔn bɔndopaddhaẽ/

রবি ঠাকুর ! ইন্দ্রজাল ছিল ও নামে মাখানো আমার বাল্যকাল থেকে। কারণ বলছি। আমার বয়েস যখন আট কিংবা নয়—পাঠশালায় পড়ি। তখন আমাদের হেডমাস্টার গগনচন্দ্র পাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো গগনচন্দ্র পালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষপর্যন্ত শুনলাম। কবিতার নাম বঙ্গো শহৎ—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২) ram : kal rattire ami ækta cɔmotkar SɔpnO dekhechi. dekhlum ki, rabon bæṭa ækṭa lɔmba talgache coṛeche coṛte corte hɔthat pa pichle ækebare – pɔpato cɔ, mɔmanr cɔ!

jambuban : ṭɔbe hɔẽto rabon bæṭa Sotti Sottii moreche – raj SɔpnO mittha hɔẽna

SɔkOle : hɔẽna, hɔbena – hote pare na.

ram : ami honumanke bollum; ja. bæṭake Somuddre phele diẽ aẽ; honuman eSeæ bolle Ki, 'phælbaro dɔrKar holona – Sæ KKebare more gæche?

SɔKOle : bah bah! ækdɔm more gæche–bæS. ar cai Ki, Khub phurti kɔro!

[baire golmal]

oi dæKh raboner rɔth dæKha jacche deKhechiS? oiṭa rabon, oi je laṭhi kẽdhe–

SɔKOle : Se li! rabon bæta tobu mɔreni – bætar jan to khub kɔṛa!

jambuban : ei honuman bæṭai to maṭi Kolle - ṭɔKhon rabonKe Somuddre Phele dilei gol cuke jeto-na, bæta abar bidde jahir Korte gieche – 'æKKebare more gæche'-

bibhiSɔn : cor pala/e buddhi baṛe-/

lɔKKhoner SoktiSel / Sukumar raẽ/

৪.৬.৩ যতি/সংযোগ/সন্ধান/সংহিতা

বাংলা বাক্যে, বাক্যাংশ, শব্দ, এমনকি শব্দের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন মাপের যতি দেখা যায়। দুই বাক্যে মধ্যবর্তী যতির মাপ সবয়েচে বড়ো এবং সম্ভবত শব্দস্থ দল বা অক্ষরগুলি মাঝের যতি সবচেয়ে ছোটো মাপের।

৪.৬.৪ দৈর্ঘ্য

বাংলায় স্বর বা ব্যঞ্জন কোনো ধ্বনিরই দৈর্ঘ্য ভেদ নেই অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদের শব্দের কোনো অর্থ পরিবর্তন হয় না।

৪.৭ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet or IPA)

ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে বাংলায় লেখার ভাষার একক আর মুখের ভাষার এককে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অর্থাৎ বাংলা লেখা দিয়ে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণকে সঠিকভাবে ধরা যায় না। যেমন, আমরা লিখি এক, এখন কিন্তু বলি এ্যাক, এ্যাখোন।

বানান ও উচ্চারণের এই পার্থক্য পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই বর্তমান। তাই ধ্বনিবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে কোনো ভাষার সঠিক উচ্চারণ লিখিত সংকেতের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করলেন আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা IPA। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

ক) এ-যাবৎ কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবীর ভাষাসমূহে যতরকম ধ্বনি পাওয়া গেছে তার সবই এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খ) ধ্বনি নির্দেশের সংকেত প্রধানত রোমীয় ও কিছু কিছু গ্রিক বর্ণমালা থেকে গৃহীত। এছাড়াও প্রয়োজন মতো ওপরে বা নীচে জুড়ে দেওয়া বাড়তি চিহ্নের সাহায্যও নেওয়া হয়। যেমন, নীচে জোড়া হল [t̪]টা, আবার ওপরে জোড়া [tʰ] হল ঠ ইত্যাদি।

গ) প্রতিটি সংকেতের সুনির্দিষ্ট ধ্বনিমূল্য আছে যেমন [p] = প, [k] = ক, [n] = ন ইত্যাদি।

ঘ) একটি সংকেত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নির্দিষ্ট ধ্বনিমূল্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বাংলার ক্ষেত্রে যেখানে অ-এর উচ্চারণ অনেক শব্দের অ-এর মতো সেখানে সংকেত [ɔ] ব্যবহৃত হবে। কিন্তু অ-এর উচ্চারণ যদি অতি শব্দের অ-এর মত অর্থাৎ ও-এর মতো হয় তবে সংকেত [O] ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ প্রতিটি IPA সংকেত উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যবহার হবে, বানান অনুযায়ী নয়।

ঙ) বিভিন্ন সংকেত সম্বলিত IPA-র তালিকা থেকে শুধুমাত্র বাংলা উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংকেতগুলোর সাহায্যে বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকেও দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা ৩১টি ব্যঞ্জন, ৭টি মৌখিক স্বর ও ৭টি অনুনাসিক স্বর—মোট ৪৫টি ধ্বনি ও ধ্বনির সংকেত ব্যবহার করে বাংলা ভাষার যে কোনো কথা বাংলার নিজস্ব উচ্চারণে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এইভাবে উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে বলে লিপ্যন্তর। নীচে লিপ্যন্তরের উদাহরণ দেওয়া হল।

তখন বাক্যের শব্দের সঙ্গো সঙ্গো গলার সুরের এই যে নিচু থেকে উঁচু হয়ে যাওয়া, বা যখন বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে—

গলার সুর ঃ

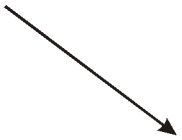

স্বর-ব্যঞ্জন ঃ [briṣṭi poṛche]।

তখন বাক্যের শেষে সুরের নিচু হয়ে যাওয়া—এগুলিও বিভিন্ন ধ্বনি বলে গণ্য। এগুলি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি কারণ এই ধ্বনির সাহায্যেই আমরা প্রশ্ন, বিবৃতি, বিস্ময় ইত্যাদি সূচক বাক্যগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারি। কিন্তু এই ধ্বনিগুলিকে যেহেতু স্বর-ব্যঞ্জনের মতো ভাগ করে বা কেটে আলাদা করে দেখানো যায় না তাই এদের বলে অবিভাজ্য বা অবিভাজিত বা বিভাজনাতিরিক্ত ধ্বনি কেউ কেউ একে অধিধ্বনিও বলেছেন। রামেশ্বর শ-র ভাষায় এই অবিভাজ্য ধ্বনিগুলি ভাষায় ছন্দের ধর্ম সঞ্চার করে বলে এগুলিকে ছন্দোগুণও বলে। বিভাজ্য ধ্বনি হল ভাষার মূল বা প্রাথমিক ধ্বনি, আর অবিভাজ্য ধ্বলি হল ভাষার গৌণ ধ্বনি।

অবিভাজ্য ধ্বনি বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন,

৪.৬.১ সুর/স্বর/স্বরাঘাত/সুরাঘাত

বাংলায় সুরের বিভিন্নতা বিভিন্ন ধরনের বাক্য চিনতে সাহায্য করে।

বাংলায় সুরের প্রকারভেদ প্রধানত তিন ধরনের।

ক) **উর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী বা অবরোহী ঃ** সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে, আদেশ নির্দেশ অনুরোধমূলক বাক্যে সুর অবরোহী। যেমন,

দরজা বন্ধ করো।

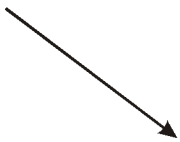

এখানে সুর উচ্চগাম থেকে নিম্নগ্রামে নামছে।

খ) **নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী বা আরোহী ঃ** হ্যাঁ না উত্তরের প্রশ্নাবোধক বাক্যে সুর নিম্নগ্রাম থেকে উচ্চগ্রামে ওঠে অর্থাৎ সুর আরোহী। যেমন,

দরজা বন্ধ করেছো ?

গ) **সমান্তাল ঃ** সংশয় বা, দ্বিধামূলক বাক্যে সুর সমান্তরাল। যেমন,

দরজাটা বোধহয় বন্ধ।

৪.৬.২ শ্বাসাঘাত/ঝোঁক/বল/প্রস্বন

ধ্বনিবজ্ঞানীদের মতে বাংলায় প্রতি শব্দের প্রথম দল বা অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে, তবে এই শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের অর্থ বদলে যায় না বলে এর ধ্বনিতাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই।

● **অঘোষীভবন**

কোনো ঘোষধ্বনির অঘোষবৎ হয়ে যাওয়াকে অঘোষীভবন বলে। যেমন, বড় + ঠাকুর [b⊃ṛo+ṭhakur] হয় [b⊃ṭṭhakur] খবর [kh⊃bor] হয় খপর [kh⊃por] ইত্যাদি।

● **অল্প প্রাণীভবন**

মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হওয়াকে অল্পপ্রাণীভবন বলে। যেমন কাঁধ [k□dh] হয় কাঁদ [k□d], মাঘ [magh] হয় মাগ [mag] ইত্যাদি।

● **বিষমীভবন**

দুটি অভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনির ভিন্ন হয়ে যাওয়াকে বিষমীভবন বলে। লাঙল [layol] হয় [nayol] লাল [lal] হয় [nal] ইত্যাদি।

ধ্বনি পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াগুলিই বহুল প্রচলিত। তবে এ ছাড়াও আরও কিছু অল্প প্রচলিত প্রক্রিয়াও ভাষায় দেখা যায়।

৪.৬ বিভাজ্য ও অবিভাজ্যধ্বনি

ধ্বনিসত্তার প্রকৃতি অনুসারে যে-কোনো ভাষায় দু-ধরনের ধ্বনি পাওয়া যায়—বিভাজ্য ধ্বনি ও অবিভাজ্য ধ্বনি।

স্বর এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি হল বিভাজ্য ধ্বনি। কারণ কোনো বাক্যে বিন্যস্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—[bristiporchĕ] (বৃষ্টি পড়ছে)। এই বাক্যটিকে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিতে ভাঙা যায়। এইভাবে [b+r+i+S+ṭ+i p+o+ṛ+ch+e]। এই স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো পরপর সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত বলেই এদের এইভাবে ভাগ করা যায়। আর ভাগ করা যায় বলেই এরা **বিভাজ্য ধ্বনি**।

ভাষায় বিভাজ্য ধ্বনি ছাড়াও আরও কিছু ধ্বনি থাকে যাতে স্বর ব্যঞ্জনের মতো পৃথক পৃথক এককে ভাগ করা যায় না, কারণ তার স্বর ব্যঞ্জনের মতো পরপর সারিবদ্ধভাবে থাকে না। বরং স্বর ব্যঞ্জনের সঙ্গে একসঙ্গে একটানা উচ্চারিত হয়। যেমন, যখন প্রশ্ন করি,

গলার সুর ঃ

স্বর-ব্যঞ্জন ঃ [bristi porchĕ]।

● অপিনিহিতি

অপিনিহিতে স্বর ও ব্যঞ্জনের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন ঘটে। যেমন, চারি [cari] হয় চাইর [cair] ইত্যাদি।

● পরিবর্তন

একটি ধ্বনির বদলে অন্য ধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে পরিবর্তন বলে। পরিবর্তন নানান ধরনের। নীচে কয়েকরকম পরিবর্তন উল্লেখ করা হল।

● সমীভবন

উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুটি বিভিন্ন ব্যঞ্জন পরস্পরের অথবা একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তর সাম্যলাভ করে, ফলে তাদের চেহারার কিছু পরিবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম সমীভবন। যেমন, আব্দুল + রহমান হয়ে যায় আব্দুর রহমান ইত্যাদি [abdul + r ⊃ homan > abdur r ⊃ homan]।

● স্বরসঙ্গতি

উচ্চ স্বরধ্বনি [i] বা [u] শব্দে তার পূর্ববর্তী অনুচ্চ স্বরধ্বনি [e, æ, ⊃, o]-কে একধাপ উঁচুতে টেনে তুলে যথাক্রমে [i, e, o, u]-তে পরিণত করে। এইভাবে টেনে তুলে কাছাকাছি স্বরধ্বনির উচ্চতার সঙ্গতি স্থাপন করারেই স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, লেখো, [*l*ikho] > লিখি [*l*ikhu]। এখানে পরবর্তী [i]-র টানে পূর্ববর্তী [e] পর্যবসিত হয়েছে [i]-তে। এইভাবেই আমরা পাই [dækho-dekhi] দ্যাখো-দেখি, [Soe-Sui] শোয়-শুই ; [k⊃ro-Koruk] করো-করুক, [tora-tui] ইত্যাদি।

● নাসিক্যভবন

কোনো মৌখিক স্বরধ্বনির অনুনাসিক স্বরে পরিবর্তিত হওয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। নাসিক্যীভবন সাধারণত পার্শ্ববর্তী কোনো নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে হয়। যেমন, [hindu] হিন্দু হয় [hĩdu] হিঁদু, তামা [tama] হয় তাঁবা [tãba] ইত্যাদি।

বাংলায় কখনো কখনো কোনো নাসিক্য ধ্বনির ছাড়াও নাসিক্যীভবন ঘটে। একে বলে স্বতঃনাসিক্যীভবন। যেমন [hospital] থেকে হয়েছে হাঁসপাতাল [hãspatal] ইত্যাদি।

● উষ্মীভবন

উষ্মধ্বনি ছাড়া অন্যধ্বনির উষ্মধ্বনিতে পরিণত হওয়াকে উষ্মীভবন বলে। যেমন, গাছ + তলা [gach + t⊃ la] হয় [gaSt⊃ la], সেজো + দা [Sejo + da] হয় [Sezda] ইত্যাদি।

● ঘোষীভবন

অঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো ঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াই ঘোষীভবন। [Sak] শাক হয় [Sag], কাক [Kak] হয় [Kag] ইত্যাদি।

ধ্বনিকেই শ্রুতিধ্বনি বলে। যেমন 'মা আমায় ঘুরাবি কত' আমাদের উচ্চারণে দাঁড়ায় মায়ামায় ঘুরাবি কত [maẽamaẽ ghurabi kto] বা সে আসে ধীরে হয় সেয়াসে ধীরে [seẽaSe dhire] ইত্যাদি।

● স্বরাগম

অনেক সময় শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগম হয়—একেই সাধারণভাবে স্বরাগম বলে।

শব্দের আদিতে স্বরাগমকে আদিস্বরাগম বলে। যেমন, স্ত্রী [stri] হয় ইস্ত্রী [istri]।

শব্দের অন্তে স্বরাগমকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন, বেঞ্চ [benc] হয়ে যায় বেঞ্চি [benc i̊]।

শব্দের মধ্যে অনেক সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরধ্বনির আগম ঘটে। এই স্বরাগমকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্যস্বরাগম বলে। যেমন, গ্রাস [graS] হয় গরাস [g⊃raS], গ্রাম [gram] হয় গেরাম [geram] ইত্যাদি।

● লোপ বা বিয়োগ

উচ্চারণ দ্রুতির বা সরলীকরণের জন্য অনেক সময় শব্দে ধ্বনি লোপ হয়। সাধারণভাবে একেই বলে লোপ বা বিয়োগ।

● স্বরলোপ

শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনির লোপকে স্বরলোপ বলে।

শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির লোপকে বলে আদিস্বরলোপ। যেমন, [Esplanade] এসপ্ল্যানেড [esplæned] হয়ে যায় স্প্ল্যানেড [splæned]।

শব্দের মধ্যে স্বরলোপকে বলে মধ্যস্বরলোপ। যেমন, বসতি [b⊃Soti] হয়ে যায় বস্তি [bosti]।

শব্দান্ত স্বরলোপকে বলে অন্ত্যস্বরলোপ। যেমন, অগুরু [⊃guru] হয়ে যায় আগর [agor]।

● সমাক্ষর লোপ

একই রকম দুটি অক্ষর বা দলের মধ্যে একটির লোপকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন, ঠাকুরদাদা [ṭhakurdada] হয় ঠাকুরদা [ṭhakurda] কৃষ্ণনগর [KriSnonagor] হয় কৃষ্ণগর [KriSn⊃gor]।

● বিপর্যাস বা বিকার

শব্দমধ্যে দুটি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনকে বিপর্যাস বা বিকার বলে।

● বিপর্যাস

সাধারণত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান পরিবর্তনই বিপর্যাস নামে পরিচিত। যেমন, তলোয়ার [t⊃loar] হয় তরোয়াল [t⊃roal], রিক্সা [rikSa] হয় রিস্কা [riSka] ইত্যাদি।

a	kata	কাটা	ã	kãta	কাঁটা
∂	d∂l	দল	∂̃	g∂̃d	গঁদ
o	*l*ok	লোক	õ	jõk	জোঁক
u	nun	নুন	ũ	kũṛi	কুঁড়ি

৭) যখন উচ্চারণের সময়ে কোনো স্বরধ্বনির প্রকৃতি বা quality বদলে যায় তখন তাকে দ্বিস্বর ধ্বনি বলে। যেমন, oi boi বই, doi দই

ou bou বউ, mou মৌ

বাংলায় মোট কটি দ্বিস্বর ধ্বনি আছে তা নিয়ে ধ্বনিবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রামেশ্বর শ-র মতে বাংলায় দ্বিস্বর ২৫টি, পবিত্র সরকারের মতে ১৭টি আবার সুকুমার সেনের মতে ২টি।

বাংলায় বিভিন্ন স্বরধ্বনি পরপর উচ্চারিত হয়ে ত্রিস্বর বা চতুঃস্বর ধ্বনিও গঠন করে। যেমন ত্রিস্বর—aui haui-হাউই oao noao নোয়াও, চতুঃস্বর—aoai daoi দাওয়াই ইত্যাদি।

৪.৫ ধ্বনি পরিবর্তন

আলোচনার খাতিরে বাংলার ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনিগুলিকে এক একটি বিচ্ছিন্ন একক হিসেবে বিশ্লেষণ ও তালিকাভুক্ত করা হলেও বলা বাহুল্য বাস্তবে মুখের ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনি আসে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। মুখের ভাষার এই অবিচ্ছিন্ন ধারার কারণে প্রতিটি ধ্বনিই তার আশপাশের ধ্বনিগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের ফলে কখনো একটি অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়, কখনো দুটি ধ্বনি পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে, কখনো কোনো ধ্বনি লোপ পায়, কখনো বা কোনো ধ্বনি অনাহূত এসে যায়। এই সব প্রক্রিয়াকে বলে ধ্বনি পরিবর্তন।

বাংলায় মোট চার ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়—

আগম বা যোগ

লোপ বা বিয়োগ

বিপর্যাস বা বিকার ও পরিবর্তন

● **আগম বা যোগ**

উচ্চারণকালে অনেক সময় দেখা যায় উচ্চারণ প্রযত্ন লাঘবের জন্য বা সরলীকরণের জন্য শব্দের নানান স্থানে বিভিন্ন ধ্বনি যোগ হয়। একেই বলে ধ্বনি আগম বা যোগ। বিভিন্ন ধরনের আগম নীচে দেওয়া হল ঃ

● **শ্রুতিধ্বনি**

আমরা কথা বলার সময়ে প্রতিটি শব্দ কেটে কেটে আলাদাভাবে উচ্চারণ করি না, উচ্চারণ করি অবিচ্ছিন্নভাবে, উচ্চারণের এই অবিচ্ছিন্নতার জন্য মাঝে মাঝেই অনভিপ্রেত ধ্বনির আগমন ঘটে—এই

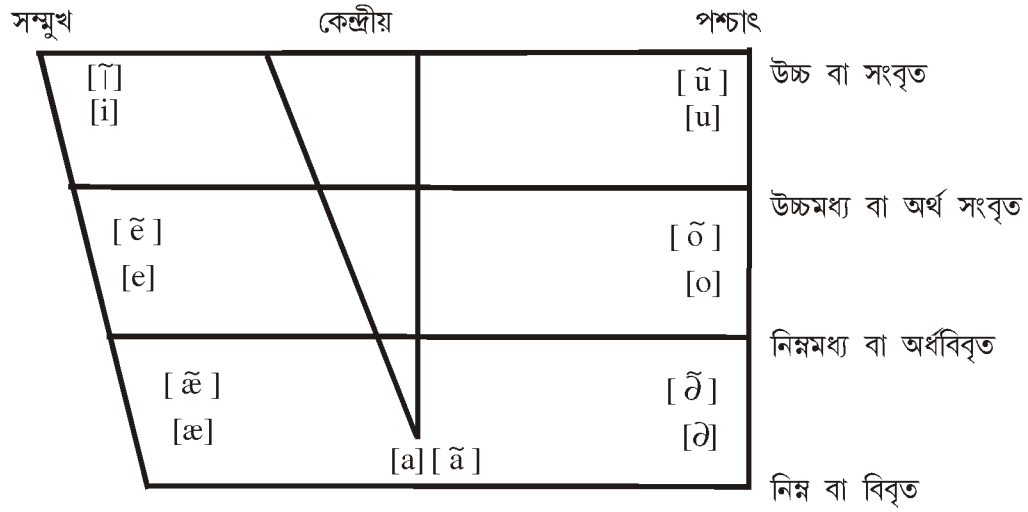

বাংলা স্বরধ্বনি

৪.৪.৪ বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বাংলায় সাতটি মৌখিক স্বরধ্বনি ও সাতটি অনুনাসিক স্বরধ্বনি। মৌলিক স্বরধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে এদের অবস্থান নীচের মতো ঃ

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ

১) স্বরধ্বনির কোনোটিরই উচ্চারণ মৌলিক স্বরধ্বনির বিন্দুতে নয়।

২) i, e, æ ও ĩ, ẽ, æ̃, সম্মুখ, u, o, ɔ ও ũ, õ, ɔ̃ পশ্চাৎ ; i, u ও ĩ, ũ উচ্চসংবৃত e, o ও ẽ, õ উচ্চ-মধ্য/অর্ধসংবৃত, æ, ɔ ও æ̃, ɔ̃ নিম্ন-মধ্য/অর্ধবিবৃত ও a ও ɑ̃ কেন্দ্রীয় নিম্ন-বিবৃত বলে পরিচিত।

৩) ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী i, e, æ ও ĩ, ẽ, æ̃ প্রসারিত ɔ, o, u ও ɔ̃, õ, ũ কুঞ্চিত ও a ও ɑ̃ স্বাভাবিক।

৪) বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘস্বর নেই।

৫) বাংলায় অনুনাসিকতা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে। যেমন—আট ও আঁট, কুড়ি ও কুঁড়ি ইত্যাদি।

৬) ৭টি মৌখিক ও সাতটি অনুনাসিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ সংকেত নীচে দেওয়া হল ঃ

i	din	দিন	ĩ	ĩdur	ইঁদুর
e	chele	ছেলে	ẽ	ẽkebẽke	এঁকে বেঁকে
æ	ækta	একটা (এ্যাকটা)	æ̃	pæ̃ca	প্যাঁচা

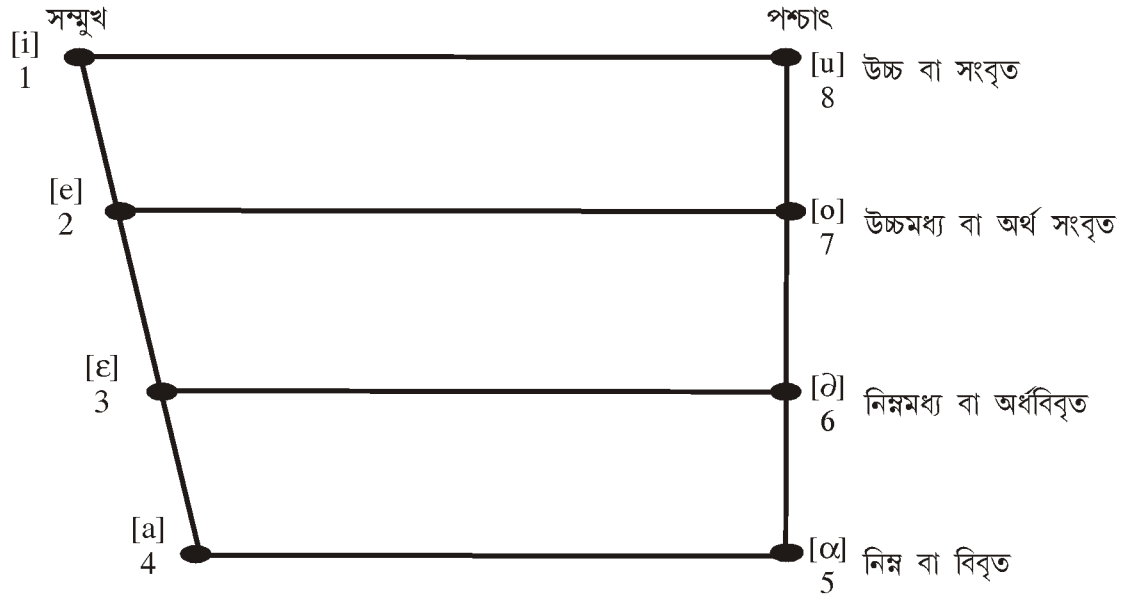

মৌলিক স্বরধ্বনি

১—৮ পর্যন্ত স্বরধ্বনির চিহ্নগুলি কোনো নির্দিষ্ট ভাষার স্বরধ্বনি নয়—স্কেলের আটটি নির্দিষ্ট বিন্দু মাত্র। এদের চিহ্ন বা সংখ্যা—যে-কোনো উপায়ে নির্দেশ করা হয়।

১, ২, ৩, ৪/i, e, ɛ, a হল সম্মুখ জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত সম্মুখ স্বরধ্বনি ; ৫, ৬, ৭, ৮/ɑ, ə, o, u হল পশ্চাৎ জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

১/i উচ্চারণে সম্মুখ জিহ্বা সর্বোচ্চ/সংবৃত অবস্থানে থাকে ; ২/e এর ক্ষেত্রে উচ্চ-মধ্য/অর্ধ সংবৃত বিন্দুতে, ৩/ɛ এর ক্ষেত্রে নিম্ন-মধ্য/অর্ধ বিবৃত বিন্দুতে এবং ৪/a এর ক্ষেত্রে নিম্ন/বিবৃত বিন্দুতে থাকে।

অনুরূপে ৫/ɑ, ৬/ə, ৭/o, ৮/u এর ক্ষেত্রে পশ্চাৎ জিহ্বার যথাক্রমে নিম্ন/বিবৃত, নিম্ন-মধ্য/অর্ধ বিবৃত, উচ্চ-মধ্য/অর্ধ সংবৃত ও উচ্চ/সংবৃত অবস্থান উচ্চারণে অংশগ্রহণ করে।

আপনারা একাদিক্রমে ই(i), এ(e), অ্যা(ɛ), আ(a) এবং উ(u), ও(o), অ(ə), আ(ɑ) উচ্চারণ করে দেখলেই জিভের দুরকম ভূমিকা সহজেই অনুভব করতে পারবেন।

সাধারণত সম্মুখ স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে ঠোঁট প্রসারিত থাকে। সবথেকে বেশি প্রসারি e-র ক্ষেত্রে। পশ্চাৎ স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে ঠোঁট কুঞ্চিত অবস্থায় থাকে, সর্বাধিক o ও u-র ক্ষেত্রে।

উপরোক্ত আটটি হল মুখ্য প্রাথমিক স্বরধ্বনি। এছাড়াও আরও দশটি গৌণ মৌলিক স্বরধ্বনি আছে যার আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

b	bon	বোন	bh	bhai	ভাই
y	banyla	বাংলা	n	nam	নাম
m	ma	মা	h	hat	হাত
S	Ses	শেষ	s	sthan	স্থান
r	rat	রাত	*l*	*lal*	লাল
ṛ	gari	গাড়ি	ŏ	khaŏ	খাও
ĕ	jaĕ	যায়			

৪.৪.৩ স্বরধ্বনি

আগেই বলেছি যে যেহেতু স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি আলাদা তাই এই দুধরনের ধ্বনির ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত শ্রেণিবিভাগের রীতিও আলাদা।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠ বা মুখগহ্বরে কোথাও কোনোরকম উচ্চারণের বাধা থাকে না শ্বাসবায়ু নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুখ দিয়ে নির্গত হয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথের আকৃতির ওপর স্বরধ্বনির বিভিন্নতা নির্ভর করে। এই পথের আকৃতি প্রধানত তিনটি মাপকাঠির ওপর নির্ভর করে।

ক) **জিভের উচ্চতা** — অর্থাৎ জিভ তার স্বাভাবিক অবস্থানে রয়েছে না তার চেয়ে উঁচুতে রয়েছে? উঁচুতে থাকলে কতটা উঁচুতে রয়েছে?

জিভের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে স্বরধ্বনির জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ অবস্থান পর্যন্ত উচ্চতাকে চারটি আপেক্ষিক বিন্দুতে ভাগ করা হয়—নিম্ন, নিম্ন-মধ্য, উচ্চ-মধ্য ও উচ্চ। জিভের নিম্ন বা স্বাভাবিক অবস্থানে মুখগহ্বরে শূন্যস্থানের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তাই নিম্ন বিন্দুর আরেক নাম বিবৃত। জিভের নিম্ন-মধ্য অবস্থানে শূন্যস্থানে পরিমাণও কিছু কম তাই এই বিন্দুর নাম অর্ধবিবৃত। অনুরূপে উচ্চ-মধ্য হল অর্ধ-সংবৃত ও উচ্চ বিন্দু সংবৃত।

খ) **জিভের অংশ** — অর্থাৎ সম্মুখ জিহ্বা না পশ্চাৎ জিহ্বা—কোন অংশের উচ্চতা গুরুত্বপূর্ণ।

গ) ঠোঁটের আকৃতি—ঠোঁট দুটি গোল হয়ে কুঞ্চিত, না সমান্তরালে প্রসারিত।

এই তিন মাপকাঠির ভিত্তিতে যে-কোনো ভাষার স্বরধ্বনি মাপবার জন্য একটি স্কেল কল্পনা করা হয়েছে—যার নাম মৌলিক স্বরধ্বনি স্কেল। খুব সংক্ষেপে এই মৌলিক স্বরধ্বনির স্কেলে আটটি কাল্পনিক স্বরধ্বনির সুনির্দিষ্ট অবস্থান দেখানো থাকে।

স্কেলটি নীচের মতো ঃ

অন্যান্য অনেক ভাষার মতো বাংলাতেও লেখার ভাষার রীতিনীতি ও মুখের ভাষার রীতিনীতি এক নয়। লেখার ভাষার ক্ষুদ্রতম একক বর্ণ ও মুখের ভাষার ক্ষুদ্রতম ধ্বনি সবসময় ১:১ সমীকরণে সম্পর্কিত হয় না। যেমন—আমরা লিখি ন, ণ, কিন্তু উচ্চারণ করি শুধুমাত্র দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি ন/n; লিখি য, জ, কিন্তু বলি তালুদন্তমূলীয় ঘৃষ্ট জ/j; লিখি শ, স, ষ কিন্তু উচ্চারণ করি তালুদন্তমূলীয় শ/S; কখনো কখনো দন্ত্য স/s ইত্যাদি।

আমি এতক্ষণ আপনাদের বোঝানোর সুবিধের জন্য লেখায় ব্যবহৃত বর্ণ দিয়েই উচ্চারণের ধ্বনিগুলির নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু লেখার একক দিয়ে উচ্চারণের একক নির্দেশ করার সমস্যা হল এই যে—বাংলা বর্ণমালায় লেখার একক হিসাবে ৪০টি (যুক্তবর্ণ বাদে) ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উচ্চারণের একক হিসেবে মাত্র ৩১টি (ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জীর হিসেবে) ব্যঞ্জনধ্বনি আমরা মুখের কথায় ব্যবহার করি। দুটি সংখ্যার ফারাকটাই সমস্যার কারণ।

তাই এখন থেকে সমস্যা এড়াবার জন্য আমি ধ্বনিবিজ্ঞানের রীতি অনুসারে বাংলা ধ্বনিগুলি নির্দেশ করার জন্য বাংলা বর্ণের বদলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার International Phonetic Alphabet বা IPA চিহ্ন ব্যবহার করব। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পরে আসছি। আপাতত এই বর্ণমালার যে চিহ্নগুলি বাংলার জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলিই ব্যবহার করছি। এই চিহ্নগুলির সুনির্দিষ্ট ধ্বনিমান আছে এবং এই ধ্বনিমান সবক্ষেত্রেই এক। যেমন—IPA চিহ্ন K-এর নির্দিষ্ট ধ্বনিমান হল বাংলা ক্-এর উচ্চারণ।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগে আমি কোনো বাংলা বর্ণ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র IPA চিহ্ন ব্যবহার করছি। এ পর্যন্ত ধ্বনিব্যঞ্জনের যা আলোচনা হয়েছে তা বুঝে থাকলে এই চিহ্নগুলোর ধ্বনিমান বুঝতে অসুবিধা হবে না। প্রথমে দেখুন তো প্রতিটি চিহ্নের ধ্বনিমান বুঝতে পারছেন কিনা। তারপর নিজেদের উত্তর নীচে দেওয়া বাংলা শব্দগুলোর উচ্চারণের ভিত্তিতে মিলিয়ে নিন।

K	Kan	কান	Kh	Khaṭ	খাট
g	gan	গান	gh	ghi	ঘি
c	cil	চিল	ch	chata	ছাতা
j	jama	জামা	jh	jhol	ঝোল
ṭ	taka	টাকা	ṭh	ṭhik	ঠিক
ḍ	ḍim	ডিম	ḍh	ḍhil	ঢিল
t	tin	তিন	th	thala	থালা
d	din	দিন	dh	dhan	ধান
p	pahar	পাহাড়	ph	phul	ফুল

	ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধন্য	তালুদন্তমূলীয়	তালব্য	কণ্ঠ্য	স্বরতন্ত্রীয়
স্পর্শ	p b ph dh	t d th dh		ṭ ṭh ḍ ḍh			k g Kh gh	
ঘৃষ্ট					c ch j jh			
নাসিক্য	m		n				ŋ	
পার্শ্বিক			ɛ					
কম্পিত			r					
তাড়িত				ṛ				
উষ্ম		s			S			ɦ
অর্ধস্বর	ö					ē		

সূনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৮) অনুসরণ করে প্রদত্ত বাংলার ৩১টি ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা

ঙ) **কম্পিত ধ্বনি**—কম্পিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় দুটি উচ্চারকের পারস্পরিক সংযোগ খুব আলগা থাকে এবং শ্বাসবায়ু নির্গমনের সময় একটি অপরটির বিপরীতে নিয়মিত কম্পিত হয়। যেমন বাংলার দন্তমূলীয় র্।

চ) **তাড়িত ধ্বনি**—তাড়িত ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে সক্রিয় উচ্চারক হিসেবে অগ্রজিহ্বা নিষ্ক্রিয় উচ্চারক শক্ততালুর মাঝখানে একবার মাত্র টোকা মারে। বাংলায় মুর্ধণ্য ড়্, ঢ়্।

ছ) **পার্শ্বিক**—পার্শ্বিক ধ্বনি উচ্চারণে জিভের পিছন থেকে সামনে মাঝবরাবর রেখার ওপর কোনো জায়গায় দুটি উচ্চারকের সম্পূর্ণ সংযোগের ফলে শ্বাসবায়ু জিভের এক বা দুধার দিয়ে নির্গত হয়। যেমন বাংলায় দন্তমূলীয় ল্।

জ) **অর্ধস্বর**—অর্ধস্বর উচ্চারণের সময় দুটি উচ্চারকের পারস্পরিক সংযোগ উষ্মধ্বনির তুলনায় বেশি কিন্তু স্বরধ্বনির তুলনায় কম কাছাকাছি থাকে। ফলে শ্বাসবায়ু কোনো রকম ঘর্ষণজাত ধ্বনি উৎপন্ন না করেই অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয়। যেমন, বাংলা য়্, ওয়্।

ঝ) **মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ**—মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী দুটির মাঝখানের স্বরপথ দিয়ে শ্বাসবায়ু নির্গমন কালে স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বেশ জোরে বাধার সৃষ্টি করায় একটি হ্ ধ্বনি শোনা যায়। এই হ্-কেই মহাপ্রাণতা বলে। এই হ্ যুক্ত ধ্বনিগুলিই মহাপ্রাণ ধ্বনি। বাংলায় খ্, ঘ্, ফ্, ভ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, অর্থাৎ বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে এরকম কোনো হ্ ধ্বনি মিশে থাকে না। সাধারণত বর্গের ১ম ও ৩য় ধ্বনি অল্পপ্রাণ। যেমন, ক্, গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, দ্, প্, ব্।

ডঃ রামেশ্বর শ ধ্বনির মহাপ্রাণতা অল্পপ্রাণতা গুণকে উচ্চারণ প্রকৃতি হিসেবেই বিবেচনা করেছেন।

৪.৪.২ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

মূলত চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিকরণ করা হয়।

১) ঘোষবত্তা অর্থাৎ ধ্বনিটি ঘোষ বা অঘোষ। সাধারণত বর্গের ১ম ও ২য় ধ্বনি অঘোষ এবং ৩য় ও ৪র্থ ধ্বনি ঘোষ।

২) ধ্বনিটি মহাপ্রাণ না অল্পপ্রাণ।

৩) উচ্চারণ স্থান ও

৪) উচ্চারণ প্রকৃতি

কোনো ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস নির্গত বায়ু বহির্গামী না অন্তর্গামী তাও একটি বিচার্য দৃষ্টিকোণ। কিন্তু যেহেতু বাংলা ধ্বনি কেবলমাত্র বহির্গামী বাতাস দিয়েই উচ্চারণ হয় তাই বাংলা ধ্বনির শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ গুরুত্বহীন।

উপরোক্ত চারটি দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগের আগে একটি জরুরি কথা বলে নিই।

ঙ) তালু দন্তমূলীয়—সম্মুখ জিহ্বা ওপরে দন্তমূল ও তার পরবর্তী শক্ত তালুর সামনের অংশ স্পর্শ করে উচ্চারণ করে তালু দন্তমূলীয় ধ্বনি। যেমন—চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্।

চ) কণ্ঠ্য—জিভের পিছনের অংশ নরম তালু স্পর্শ করে উচ্চারণ করে কণ্ঠ্য ধ্বনি। যেমন—ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ/ং।

ছ) স্বরতন্ত্রীয় ধ্বনি—দুই স্বরতন্ত্রীর মাঝখান দিয়ে উচ্চারিত ধ্বনি। যেমন—হ্।

● **উচ্চারণ প্রকৃতি**

ওপরের উচ্চারকের সঙ্গে নীচের উচ্চারকের বিভিন্ন রকম সমন্বয় ঘটে—কখনো দুই উচ্চারক পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে, কখনো আংশিক স্পর্শ করে। কখনো পার্শ্বিক স্পর্শ করে, কখনো বা স্পর্শ না করে পরস্পর পরস্পরের এত কাছাকাছি আসে যে প্রতিহত শ্বাসবায়ু ঘর্ষণজনিত শব্দ করে নির্গত হয়। অর্থাৎ উচ্চারকের সমন্বয়ের বিভিন্ন ধরনের ওপর শ্বাসবায়ুর প্রতিহত হওয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে।

উচ্চারণ প্রকৃতি বলতে বোঝায় উচ্চারকগুলো কেমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে শ্বাসবায়ুকে প্রতিহত করছে তারই বর্ণনা।

বাংলা ধ্বনির ক্ষেত্রে আমরা নিম্নবর্ণিত উচ্চারণ প্রকৃতিগুলি পাই—

ক) **স্পৃষ্ট/স্পর্শ**—এক্ষেত্রে উপরস্থ ও নিম্নস্থ দুটি উচ্চারক পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথে ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ বাধা দেয়। তারপর উচ্চারক দুটি হঠাৎ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে অবরুদ্ধ শ্বাসবায়ু নির্গত হয় ও ধ্বনি উচ্চারণ হয়।

বিভিন্ন উচ্চারণস্থানে আমরা স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ করি। যেমন দুটি ঠোঁটকে সম্পর্ণ বন্ধ করে, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে, তারপর হঠাৎ উন্মুক্ত করে পাওয়া যায় ওষ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি—প্, ফ্, ব্, ভ্ ; জিভের পিছনের অংশ দিয়ে নরম তালু সম্পূর্ণ স্পর্শ করে, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে তারপর উচ্চারক দুটিকে পরস্পরের থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন করে পাই কণ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি—ক্, খ্, গ্, ঘ্। এইরকমই পাই দন্ত্য স্পর্শ ধ্বনি ত্, থ্, দ্, ধ্ ও মুর্ধ্যণ স্পর্শ ধ্বনি ট্, ঠ্, ড্, ঢ্।

খ) **নাসিক্য**—নাসিক্য ধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি স্পর্শ ধ্বনিরই অনুরূপ। তফাত শুধু এক্ষেত্রে শ্বাসবায়ু নাসিকা গহ্বর দিয়ে নির্গত হয়। অর্থাৎ মুখগহ্বরে ওপরের ও নীচের উচ্চারক দুটি পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে শ্বাসবায়ু অবরুদ্ধ করে থাকে এবং সেই অবরুদ্ধ শ্বাসবায়ু ঝুলে থাকা নরমতালু ও আলজিভের পাশ দিয়ে নাসিকা গহ্বরে প্রবেশ করে নারারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হয়। বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি তিনটি—ওষ্ঠ্য নাসিক্য ম্, দন্তমূলীয় নাসিক্য ন্, ও কণ্ঠ্য নাসিক্য ঙ্।

গ) **উষ্মধ্বনি**—এক্ষেত্রে উচ্চারক দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার ফলে শ্বাসবায়ু যাতাযাতের পথে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয় এবং সেই বাধা ঠেলে নির্গত হওয়ার ফলে ঘর্ষণজনিত ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এইভাবে উচ্চারিত ধ্বনিই উষ্মধ্বনি। বাংলায় বিভিন্ন স্থানের উষ্মধ্বনিগুলি হল—তালুদন্তমূলীয় শ্ এবং স্বরতন্ত্রীয় হ্।

ঘ) **ঘৃষ্টধ্বনি**—দুটি উচ্চারকের মধ্যে প্রথমে স্পর্শ ধ্বনির মতোই সম্পূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়ে শ্বাসবায়ু রুদ্ধ হয়, তারপর উচ্চারক দুটি পরস্পরের থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন হবার ফলে উষ্মধ্বনির মতো আংশিক বাধার স্তর পেরিয়ে শ্বাসবায়ু পুরোপুরি নির্গত হয়। অর্থাৎ ঘৃষ্ট ধ্বনি যেন স্পর্শ ও উষ্ম ধ্বনির যৌগিক রূপ। বাংলার ঘৃষ্ট ধ্বনি হল তালুদন্তমূলীয় চ্, ছ্, জ্, ঝ্।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠ বা মুখগহ্বরে একাধিক উচ্চারক মিলে কোনো না কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করে ধ্বনি উৎপাদক শ্বাসবায়ুকে কোনো না কোনো ভাবে প্রতিহত করে। যেমন বাংলা, প্, ফ্, ব্, ভ্ ধ্বনির ক্ষেত্রে ওপরের ও নীচের ঠোঁট দুটি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হচ্ছে।

কিন্তু বাংলা স্বরধ্বনি ই, উ, আ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কণ্ঠ বা মুখগহ্বরে কোথাও এরকম কোনো উচ্চারকের বাধা থাকে না—শ্বায়বায়ু নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্বনি উৎপাদন করতে করতে মুখ দিয়ে নির্গত হয়।

যেহেতু স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি আলাদা আলাদা তাই তাদের ধ্বনি বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিবিভাগের রীতিও আলাদা। আমরা প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির ও পরে স্বরধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি ও শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করব।

৪.৪.১ ব্যঞ্জনধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের ও শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান মাপকাঠি হল ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ প্রকৃতি। অর্থাৎ ধ্বনিটি উচ্চারণ হচ্ছে কোথায় এবং কিভাবে।

● উচ্চারণ স্থান

একটি নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় কোন কোন উচ্চারক পরস্পরকে সম্পূর্ণ বা আংশিক স্পর্শ করছে বা কোন কোন উচ্চারকের প্রচেষ্টায় উচ্চারণ সম্ভব হচ্ছে তারই নির্দেশ হল উচ্চারণ স্থান। অর্থাৎ কোন স্থানে ধ্বনির উচ্চারণ সম্পাদিত হচ্ছে তার বর্ণনা। অন্যভাবে বলা যায় যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে কণ্ঠে বা মুখগহ্বরের কোন জায়গায় শ্বাসবায়ু প্রতিহত হচ্ছে তারই নির্দেশ করে উচ্চারণ স্থান। যেমন প্, ফ্, ব্, ভ্, ধ্বনির ক্ষেত্রে ওপর ও নিচের ঠোঁট পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করায় শ্বাসবায়ু প্রতিহত হচ্ছে। সুতরাং এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান দুটি ঠোঁট/ওষ্ঠদ্বয়। তাই উচ্চারণস্থান অনুসারে এরা ওষ্ঠ ধ্বনি।

সাধারণত ওপরের বিভিন্ন উচ্চারকের নাম অনুসারে উচ্চারণস্থানের নামকরণ হয়। উচ্চারণস্থানের নাম অনুসারে সেই স্থানে উৎপন্ন ধ্বনির নামকরণ হয়।

বিভিন্ন নিম্নস্থ উচ্চারকের সঙ্গে বিভিন্ন উপরস্থ উচ্চারকের সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান তৈরি হয়। এইসব উচ্চারণ স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি পৃথিবীর নানান ভাষায় পাওয়া যায়। তবে বর্তমান আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ স্থানের বিস্তৃত আলোচনা করব না আমরা শুধুমাত্র বাংলা ভাষার ধ্বনি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চারণস্থানগুলির আলোচনাতেই সীমিত থাকবে।

ক) ওষ্ঠ্য বা দ্বিওষ্ঠ্য—ওপরের ও নীচের দুটি ঠোঁটের সমন্বয়ে উচ্চারিত হয় ওষ্ঠ্য বা দ্বিওষ্ঠ্য ধ্বনি। যেমন—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্।

খ) দন্ত্য—জিহ্বা প্রান্ত ও অগ্রজিহ্বা ওপরের দাঁতের পিছনের অংশকে স্পর্শ করে উচ্চারণ করে দন্ত্য ধ্বনি। যেমন—ত্, থ্, দ্, ধ্।

গ) দন্তমূলীয়—জিহ্বা প্রান্ত দন্তমূলকে স্পর্শ করে উচ্চারণ করে দন্তমূলীয় ধ্বনি। যেমন—ন্, র্, ল্।

ঘ) মূর্ধন্য/প্রতিবেষ্টিত—জিভকে উলটে নিয়ে অগ্রজিহ্বার নীচের দিকে ঘুরিয়ে ওপর দিকে এনে শক্ত তালুর মাঝখানে স্পর্শ করে উচ্চারণ করা হয় মূর্ধন্য/প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। যেমন—ট্, ঠ্, ড্, ঢ্।

ওপরের উচ্চারকের মধ্যে সামনে থেকে পিছনে প্রথমে উপরের ঠোঁট, তারপর ওপরের দাঁত, তারপর মুখের ছাদ বা তালু। মুখের ছাদের প্রথম অংশ দাঁতের ভিতরের দিকের মাড়ি বা দন্তমূল। দন্তমূল শক্ত ও একটু উঁচু মতো। তারপরের মসৃণ ও শক্ত অংশটুকু শক্ত তালু। শক্ত তালুকে আবার সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাৎ এই তিন ভাগে দেখানো যায়। শক্ত তালুর পরবর্তী নরম অংশ হল নরম তালু। নরম তালুর শেষ প্রান্ত থেকে ঝুলন্ত নরম মাংস পিণ্ডটা হল আলজিভ।

ওপরের ঠোঁট থেকে শুরু করে দাঁত, তালু হয়ে আলজিভ পর্যন্ত অংশ মুখগহ্বর থেকে নাসিকা গহ্বরকে পৃথক করে তা আগেই উল্লেখ করেছি।

নীচের উচ্চারকের মধ্যে সামনে থেকে পিছনে আসে নিচের ঠোঁট, নীচের দাঁত ও জিভ। দাঁত উচ্চারণে কোনো অংশ নেয় না। জিভকে আলোচনার সুবিধের জন্য আবার চারটি অংশে ভাগ করা যায়, জিভের ডগা প্রান্ত ; প্রান্ত পরবর্তী অগ্রজিহ্বা বা জিভের পাতলা অংশ, যা দন্তমূলের বিপরীতে থাকে ; জিভের মাঝ বরাবর ভাগ করে তার সামনের অংশ বা সম্মুখ জিহ্বা, শক্ত তালুর বিপরীতে থাকে এবং জিভের পিছনের অংশ বা পশ্চাৎ জিহ্বার একেবারে শেষ অংশ হল জিভের গোড়া—তারও একটি পিছনের অধিজিহ্বা—যা আগেই আলোচনা করেছি।

উচ্চারণগুলোর মধ্যে জিভ নড়াচড়া করে সবচেয়ে বেশি—ওপরে, নীচে, পিছনে ও দুপাশে।

মুখগহ্বর—নাসিকা গহ্বরের পিছনের প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে গলা বা কণ্ঠ বা কণ্ঠনালি। কণ্ঠনালির মধ্য দিয়ে সমান্তরালভাবে দেহের অভ্যন্তরে নেমে গেছে খাদ্যানালি বা শ্বাসনালি। আগেই বলেছি শ্বাসনালিতে রয়েছে স্বরকক্ষ।

উচ্চারকগুলির মধ্যে যেগুলি সক্রিয়ভাবে নাড়াচড়া করে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে উচ্চারণে অংশগ্রহণ করে তাদের বলে সক্রিয় উচ্চারক। জিভ হল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সক্রিয় উচ্চারক। আর অন্য যে উচ্চারক স্বস্থানে অবস্থিত থেকেই উচ্চারণে অংশ নেয় তাকে বলে নিষ্ক্রিয় উচ্চারক। যেমন—তালুর বিভিন্ন অংশ। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বাংলা ধ্বনি র্, ল্, ন্, এর উচ্চারণে সক্রিয় উচ্চারক অগ্রজিহ্বা ও নিষ্ক্রিয় উচ্চারক দন্তমূল।

৪.৪ ধ্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

এই কণ্ঠ ও মুখগহ্বরে উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ পদ্ধতির ভিত্তিতে দুটি মৌলিক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। এই **স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি** ও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ নামের সঙ্গে আমরা সকলেই স্কুলের নিচু স্কাল থেকে পরিচিত। সুতরাং স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি আমাদের কাছে কোনো নতুন ধারণা নয়। এই পুরানো জানা ধারণাকেই আবার আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল এই পরিচিত ধারণাকেই একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আরো একটি বেশি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বোঝার ও বোঝানোর চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঃ

১) এই মুহূর্তে আমাদের খুব সচেতনভাবে মনে রাখা দরকার যে স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি হল মুখের ভাষার বা কথা বলার উপাদান, আর স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ হল লেখার ভাষার উপাদান। ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বে আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি, বর্ণ নয়।

২) আমরা স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনিকে তাদের উচ্চারণ পদ্ধতির বিভিন্নতার যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করব এবং নিজেরা মুখে ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করে এই যুক্তির সত্যতা বিচার করব।

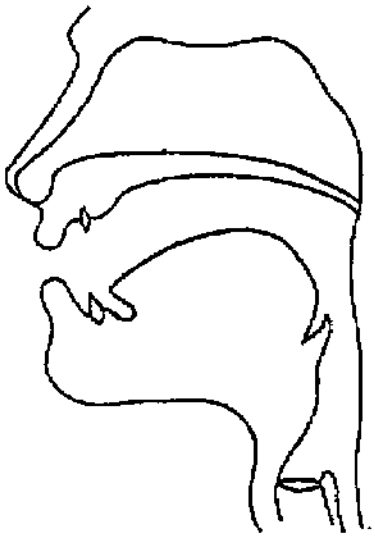

নাসিকা গহ্বরের প্রবেশ পথ বন্ধ।
নরম তালু ও আলজিভের এই রকম পিছনে ঠেকে থাকা অবস্থানে মৌখিক ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

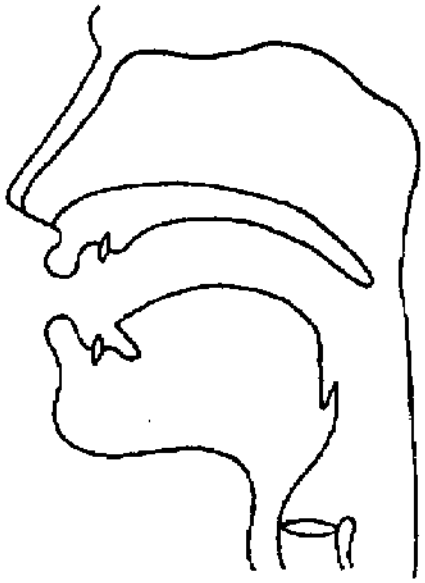

নাসিকা গহ্বরের প্রবেশ পথ বন্ধ।
নরম তালু ও আলজিভের এই রকম পিছনে ঠেকে থাকা অবস্থানে মৌখিক ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

যদিও নরমতালু ও আলজিভ ওপরের দিকে উঠে নাসিকা গহ্বরের পিছনের দেওয়াল স্পর্শ করে নাসিকা গহ্বরের প্রবেশ পথ বন্ধু করে দেয় তাহলে শ্বাসবায়ু শুধুমাত্র মুখগহ্বরের দিয়েই নির্গত হয় এই মৌখিক ধ্বনি উৎপন্ন করে—যেমন, বাংলা অ, ই. উ, ক্, গ্, দ্, ট্, ব্, শ্ ইত্যাদি।

সংক্ষেপে ঃ নরমতালু ও আলজিভের বিভিন্ন অবস্থান ও মুখগহ্বরের বাধার উপস্থিতির ভিত্তিতে ধ্বনি উৎপাদনকারী শ্বাসবায়ু নিম্নলিখিত পথে নির্গত হয়—

ক) মুখগহ্বর দিয়ে, মৌখিক ধ্বনি উৎপন্ন করে।

খ) নাসিকাগহ্বর দিয়ে, নাসিক্য ধ্বনি উৎপন্ন করে।

গ) মুখ ও নাসিকা উভয় গহ্বর দিয়ে, অনুনাসিক ধ্বনি উৎপন্ন করে।

● **মুখগহ্বর**

মুখগহ্বরস্থ বিভিন্ন উচ্চারক অংশগুলি একে অপরকে বিভিন্নভাবে স্পর্শ করে বা একে অপরের কাছাকাছি এসে মুখগহ্বরের আকৃতির পরিবর্তন করে ধ্বনির বিভিন্ন চেহারার সৃষ্টি করে।

প্রথমে উচ্চারক অংশগুলোর পরিচয় দিই। বাগ্‌যন্ত্রের যেসব অংশ প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনি উচ্চারণে অংশ নেয় সেগুলিই উচ্চারক বলে পরিচিত। যেমন, ঠোঁট, জিভ, তালু ইত্যাদি। সাধারণত যে উচ্চারকগুলো নীচের চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত তাদের বলে নিম্নস্থ/নীচের উচ্চারক। আর ওপরের চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত উচ্চারকগুলো হল উপরস্থ/ওপরের উচ্চারক, আমাদের নিচের উচ্চারক সহ নিচের চোয়াল নড়াচড়া করে।

স্বরতন্ত্রী দুটি যখন পরস্পরের সঙ্গে পুরোপুরি ঠেকে থাকে তখন স্বরপথ রুদ্ধ অবস্থায় থাকে। আমরা যখন কাশি তখন স্বরপথ এই পুরো বন্ধ অবস্থা থেকে হঠাৎ পুরো খুলে যায়।

যখন স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে থাকার ফলে স্বরপথের পরিমাণ বেশি থাকে তখন শ্বাসবায়ু সেই স্বরপথ দিয়ে বিনা বাধায়, স্বরতন্ত্রীতে কোনো কম্পন না তুলে যাতায়াত করে। স্বরতন্ত্রীর এই রকম অবস্থানে আমরা যে সকল ধ্বনি উচ্চারণ করি তাদের বলে অঘোষ ধ্বনি। যেমন বাংলার ক্, খ্, চ্, ছ্, স্, শ্ ইত্যাদি।

কিন্তু যখন স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় ঠেকে যায় তখন তাদের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করার সময় শ্বাসবায়ু তন্ত্রী দুটিকে বার বার ঠেলে পথ প্রশস্ত করে নিতে চায়। ফলে তন্ত্রী দুটি কাঁপতে থাকে ও এই কম্পনের ফলে একটি সুর সৃষ্টি হয়, স্বরতন্ত্রীর এই কম্পন বা সুরকে বলে ঘোষ। এই ঘোষ সহযোগে যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাদের বলে ঘোষ ধ্বনি—যেমন বাংলার স্বরধ্বনি, গ্, ঘ্, দ্, ধ্, ন্, ব্, ভ্, ম্, ল্ ইত্যাদি।

অর্থাৎ—

(ক) স্বরতন্ত্রীর কম্পন = ঘোষ

(খ) ঘোষ যুক্ত ধ্বনি = ঘোষ ধ্বনি

(গ) ঘোষ বিযুক্ত ধ্বনি = অঘোষ ধ্বনি।

● অধিজিহ্বা

মুখগহ্বর থেকে শ্বাসনালি শুরুর মুখে, স্বরকক্ষের ওপরে, অধিজিহ্বার অবস্থান। এই অধিজিহ্বার কাজ খাদ্য ও পানীয়ের কণা থেকে শ্বাসনালিকে বাঁচানো।

● আলজিভ ও নরমতালু

আধজিহ্বার ওপরে আধজিহ্বার বিপরীত দিকে থাকে আলজিভ। আলজিভকে মাঝখানে রেখে শ্বাস ও খাদ্যনালির ওপরের অংশ মুখগহ্বর ও নাসিকাগহ্বর এই দুই গহ্বরে ভাগ হয়ে গেছে। মুখগহ্বর শেষ হয়েছে ঠোঁটে ও নাসিকাগহ্বর নাসারন্ধ্রে। আলজিভ থেকে শুরু করে সামনের দিকে ওপরের ঠোঁট ও দাঁত পর্যন্ত অংশ—যা নাসিকাগহ্বর ও মুখগহ্বরের মধ্যে পার্টিশানের কাজ করছে—এই অংশটি নিশ্ছিদ্র ভরাট। এই অংশের সামনের দিকে ওপরে ঠোঁট ও পিছনের দিকে নরম তালু সংলগ্ন আলজিভ নাড়ানো যায়।

এই নরম তালু ও আলজিভ ছবিতে দেখানো অবস্থান থাকলে এবং মুখগহ্বর উন্মুক্ত থাকলে ধ্বনি উৎপন্নকারী শ্বাসবায়ু নাক ও মুখ উভয় দিক দিয়েই নির্গত হয়। এইভাবে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তার নাম অনুনাসিক ধ্বনি—যেমন, আঁ, ইঁ, এঁ, ওঁ, উঁ, অঁ ইত্যাদি।

যদি নরমতালু ও আলজিভের অবস্থান ছবির মতোই থাকে, কিন্তু মুখগহ্বরে কোথাও কোনো বাধা থাকার ফলে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর দিয়ে না বেরিয়ে শুধুই নাসিকা গহ্বর দিয়ে বেরোয় তাহলে সেই ধ্বনিকে বলে নাসিক্য ধ্বনি—যেমন, বাংলা, ন্, ম্ ইত্যাদি।

● **ফুসফুস**

আমরা কথা বলার সময় যে ধ্বনি ব্যবহার করি সে ধ্বনি উৎপাদনের কাঁচামাল হল ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা হাওয়া। ফুসফুস দুটো সংকুচিত হয়ে যে হাওয়া নিশ্বাসের আকারে নাক-মুখ দিয়ে বের করে দেয় তাই দিয়েই তৈরি হয় মুখের কথা—সোজা কথায় তাই হল আমাদের কথার দম। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় **ফুসফুসজাত বহির্গামী হাওয়া**। এইখানে মনে রাখা দরকার যে ফুসফুসজাত অন্তর্গামী হাওয়া (অর্থাৎ প্রশ্বাস) দিয়েও কিছু কিছু আওয়াজ সৃষ্টি করা যায় কিন্তু সেই আওয়াজ বা ধ্বনি কথা বলার কাজে লাগে না।

● **স্বরতন্ত্রী**

আমাদের শ্বাসনালি নীচের দিকে ফুসফুসের সঙ্গে ও ওপরের দিকে মুখগহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এই শ্বাসনালির মধ্যে ওপরের দিকে একটি **স্বরযন্ত্র বা স্বরকক্ষ আছে**। আমরা গলার বাইরের দিকে হাত চেপে যদি ঢোঁক গিলি তাহলে এই স্বরকক্ষের ওঠানামা হাতে অনুভব করতে পারি। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে এই স্বরকক্ষ গলার বাইরে থেকে একটু উঁচু অংশ হিসেবে চোখে দেখাও যায়।

এই স্বরকক্ষের চারপাশ নরম মাংসপেশির নানা গ্রন্থি দিয়ে তৈরি। স্বরকক্ষের মধ্যে দুটি পাতলা নমনীয় পর্দা বা দুটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পাশাপাশি আনুমানিক শোয়ানো অবস্থায় থাকে। এদের বলে **কণ্ঠতন্ত্রী বা স্বরতন্ত্রী**। এই স্বরতন্ত্রী দুটি সামনে গলার দিকে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া কিন্তু পিছনে ঘাড়ের দিকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই স্বরতন্ত্রী দুটি দুপাশে সরে গিয়ে মাঝখান দিয়ে বাতাস যাতায়াতের যে পথ করে দেয় সেই পথের নাম স্বরপথ।

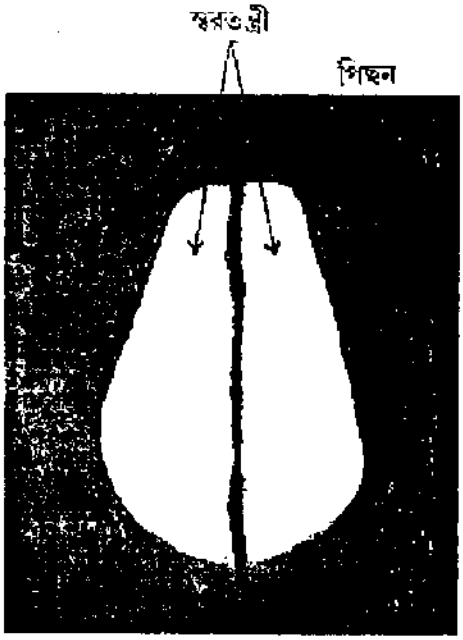

ঘোষধ্বনি উচ্চারণে
স্বরতন্ত্রীর অবস্থান

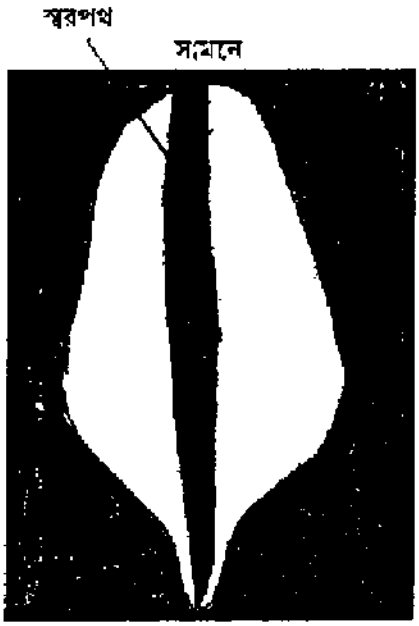

অঘোষধ্বনি উচ্চারণে
স্বরতন্ত্রীর অবস্থান

৪.৩ ধ্বনির উৎপত্তি

ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি হয় মুখের কথা। এই ধ্বনি তৈরি হয় কীভাবে ? ধ্বনি তৈরি হয় বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রতিটি মানুষের শরীরে বাগ্‌যন্ত্র তার নাক ও ঠোঁট থেকে শুরু করে শরীরের অভ্যন্তরে ফুসফুস পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটামুটি নাসা ছিদ্র, নাসিকা গহ্বর, ঠোঁট, মুখগহ্বরের দাঁত, জিভ, তালু ইত্যাদি, গলায় শ্বাসনালি, স্বরতন্ত্রী ও ফুসফুস নিয়ে তৈরি এই বাগ্‌যন্ত্র। জরুরি কথা এই যে বাগ্‌যন্ত্রের মুখ্য কাজ কিন্তু কথা বলা নয় ; মুখ্য কাজ হল শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালানো এবং খাওয়া-বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দুটি মৌলিক কাজ। কথা বলার কাজটা হল এই দুটো বোঝার ওপরে শাকের আঁটির মতো একটা বাড়তি কাজ।

এবারে আসুন একটা ছবির সাহায্যে বাগ্‌যন্ত্রের পরিচয় বুঝতে চেষ্টা করি।

৪.৩.১ বাগ্‌যন্ত্র

আমাদের মাথাকে মাঝখান দিয়ে, দুটো চোখ ও দুটো কান দুপাশে রেখে, নাকটাকে সমান দুটো ভাগ করে লম্বালম্বি চিরলে যে দুটি ভাগ পাওয়া যায় তা বাগযন্ত্রে এক-একটা অংশ ভাগ কথা বলার কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত বাগ্‌যন্ত্রের প্রতিটি অংশের সংস্থান ও নাম দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার সুবিধের জন্য এই বাগ্‌যন্ত্রকে কয়েকটি প্রধান অংশে ভাগ করে সংক্ষেপে তাদের কাজ বোঝাতে চেষ্টা করি

বাগ্‌যন্ত্র

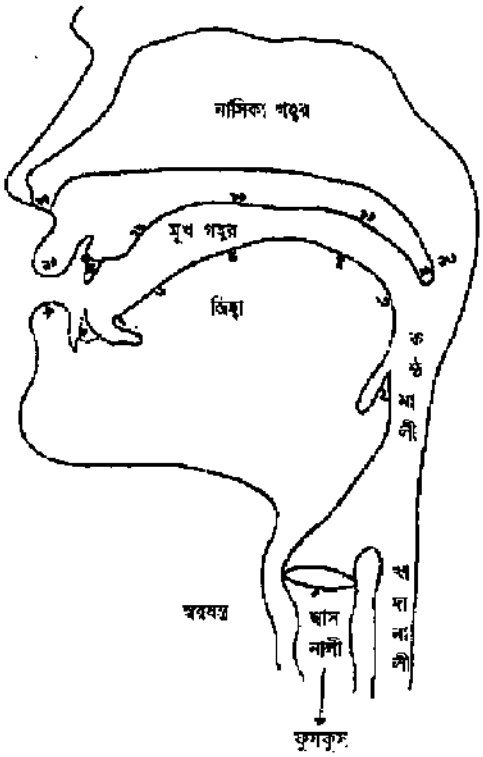

১. স্বরতন্ত্রী
২. অধিজিহ্বা
৩. জিভের গোড়া
৪. পশ্চাৎ জিহ্বা
৫. সম্মুখ জিহ্বা
৬. অগ্র জিহ্বা
৭. জিভের ডগ
৮. নীচের দাঁত
৯. নীচের ঠোঁট
১০. ওপরের ঠোঁট
১১. ওপরের দাঁত
১২. দন্তমূল
১৩. শক্ত তালু
১৪. নরম তালু
১৫. আলজিভ
১৬. নাসিকা গহ্বরের প্রবেশপথ
১৭. নাসারন্ধ্র

- বাংলা বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা/IPA সংকেত ও সেই সংকেতে বাংলা উচ্চারণের লিপ্যন্তর পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

মুখের ভাষায় বা মুখের কথায় ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। বক্তা বিভিন্ন ধ্বনি পরপর সাজিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় উচ্চারণ করে কথা বলে—সেই কথা হওয়ায় ভেসে শ্রোতার কাছে পৌঁছয়—শ্রোতা তা শ্রবণ করে। কথা বলার সময় কোনো ধ্বনি এককভাবে উচ্চারিত হয় না বা কথার মধ্যে প্রতিটি ধ্বনিকে আলাদা আলাদা ভাবে শোনাও যায় না। কিন্তু তবুও আলোচনার খারিতে আমরা প্রতিটি ধ্বনিকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করি অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার উল্টোদিকে যাই।

ধ্বনির গাঠনিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics। প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিবিজ্ঞান ধ্বনি বিশ্লেষণ করে ঃ

১) বক্তা কীভাবে তার বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারণ করে।

২) সেই ধ্বনি কীভাবে বাতাসে তরঙ্গ তুলে বক্তা থেকে শ্রোতার কাছে পৌঁছয়, ও

৩) শ্রোতা কীভাবে ধ্বনি শোনে।

এখানে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ধ্বনির উচ্চারণই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এই তিন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ধ্বনিবিজ্ঞানের তিনটি শাখায় বিন্যস্ত, ধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লেষণ করে উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনিতরঙ্গের বিশ্লেষণ করে ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। এবং শ্রোতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতার কান ও স্নায়ুতন্ত্রের ওপর বিভিন্ন বাগ্‌ধ্বনি ও ধ্বনিতরঙ্গের প্রভাব বিশ্লেষণ করে শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান।

তিনটি শাখার মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ও উন্নত হল উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান প্রধানত যন্ত্র ও পদার্থবিদ্যা নির্ভর এবং বর্তমানে বহু চর্চিত। আর শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিকাশ এখানো পর্যন্ত যথেষ্ট সীমিত।

আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে প্রধানত উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমভাগে, পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায়। তবে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের মূলসূত্র কিন্তু নিহিত আছে প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতের প্রাচীন ধ্বনিবিজ্ঞান চর্চার মধ্যে। ৫০০-১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ভারতীয় শাস্ত্রে ধ্বনিবিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রাচীন ও বিস্তৃত আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। তখন বৈদিক সূত্রাদির উচ্চারণ শুদ্ধি বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল প্রাতিশাখ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ধ্বনিবিজ্ঞানমূলক শাস্ত্রাদি। এইসব শাস্ত্রে ঘোষীভবন প্রক্রিয়া, উচ্চারণ স্থান, নাসিক্য ধ্বনি, শব্দযতি ইত্যাদি ধারণার প্রয়োগ দেখা যায়।

এখানে আমরা উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে বাংলা ধ্বনিগুলির উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এখানে একটু উল্লেখ রাখি যে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিগুলি, তাদের গাঠনিক চরিত্র ছাড়াও, তাদের ব্যাবহারিক চরিত্রের ভিত্তিতেও বিশ্লেষণ করা যায়। আমরাও পরবর্তী ধ্বনিতত্ত্ব এককে (পর্যায় ২, একক ৩ দ্রষ্টব্য) এই ব্যাবহারিক চরিত্রের আলোচনা করব।

একক ৪ ❐ ধ্বনিবিজ্ঞান

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ধ্বনির উৎপত্তি

৪.৩.১ বাগ্‌যন্ত্র

৪.৪ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

৪.৪.১ ব্যঞ্জনধ্বনি

৪.৪.২ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

৪.৪.৩ স্বরধ্বনি

৪.৪.৪ বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

৪.৫ ধ্বনি পরিবর্তন

৪.৬ বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনি

৪.৬.১ সুর/স্বর/স্বরাঘাত/সুরাঘাত

৪.৬.২ শ্বাসাঘাত/ঝোঁক/বল/প্রস্বন

৪.৬.৩ যতি/সংযোগ/সন্ধান/সংহিতা

৪.৬.৪ দৈর্ঘ্য

৪.৭ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা/International Phonetic Alphabet/IPA

৪.৮ সারাংশ

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাগ্‌ধ্বনি, সংক্ষেপে ধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনধ্বনি শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি ও বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- স্বরধ্বনি শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি ও বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

একক ৫ ❐ ধ্বনিতত্ত্ব

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ দুটি স্তরের কারণ

৫.৪ ভাষার ধ্বনিমূল্যের উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণ

৫.৫ ধ্বনি ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প

৫.৬ তিনটি ধারণার কী প্রয়োজন

- ৫.৬.১ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের ব্যাখ্যা
- ৫.৬.২ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণ পদ্ধতি

৫.৭ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের নীতি

- ৫.৭.১ বৈপরীত্য
- ৫.৭.২ পরিপূরক অবস্থান
- ৫.৭.৩ ধ্বনিগত সাদৃশ্য
- ৫.৭.৪ মুক্ত বৈচিত্র্য

৫.৮ চারটি নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি

- ৫.৮.১ ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র
- ৫.৮.২ ধ্বনিকল্প নির্ণয়ের সূত্র
- ৫.৮.৩ মুক্তবৈচিত্র্যে ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

৫.৯ বাংলা ধ্বনিকল্প

৫.১০ ধ্বনি পরিবর্তন

৫.১১ ধ্বনিতত্ত্বের একক

৫.১২ সারাংশ

৫.১৩ অনুশীলনী

৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানতে পারবেন—

- ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক ধ্বনিকল্প কাকে বলে।
- ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণার প্রয়োজনীয়তা।
- বাংলায় ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের নীতি ও তার প্রয়োগ।
- বাংলা দলের (Syllable) গঠন।

৫.২ প্রস্তাবনা

ভাষা বিশ্লেষণের অন্যতম প্রধান অংশ ধ্বনি বিশ্লেষণ। কোনো ভাষার ধ্বনিবিশ্লেষণ করা হয় দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ঃ

১) ধ্বনির গাঠনিক চরিত্র বিশ্লেষণ ও

২) ধ্বনির ব্যাবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ

পূর্ববর্তী এককে আমরা বাংলা বাগ্‌ধ্বনিগুলির গাঠনিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছি। অর্থাৎ একেকটি বাংলা বাগ্‌ধ্বনির গঠনগত বিভিন্ন উপাদানের (যেমন, ঘোষবত্তা, উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণ প্রকৃতি, ওষ্ঠের অবস্থান ইত্যাদি) বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছি। অবশ্য আমরা শুধুমাত্র ধ্বনির উচ্চারণের গঠনগত উপাদানেই আলোচনা সীমিত রেখেছি। এই আলোচনা ধ্বনিতরঙ্গ বা ধ্বনির শ্রবণযোগ্যতার উপাদান বিশ্লেষণেও ব্যাপ্ত হতে পারত। যাই হোক, মনে রাখার বিষয় এটাই যে-কোনো নির্দিষ্ট ভাষা ও উপাভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ বা শ্রবণযোগ্যতা বা ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণকে বলা হয় বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিচারে বাংলা **[p]** ধ্বনিটি একটি অল্পপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি।

বর্তমান এককে আমরা এই বাংলা বাগ্‌ধ্বনিগুলির ব্যবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করব। ধ্বনির ব্যাবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট ভাষা একটি ধ্বনিকে কীভাবে ব্যবহার করে তারই খবরাখবর সরবরাহ করা। যেমন, বাংলা ভাষায় ধ্বনিটির ব্যাবহারিক চরিত্র হল বাংলার [ঁ] ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যবহৃত হলেও আদিতে ব্যবহার হয় না। বলা বাহুল্য, কোনো ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভাষার সাপেক্ষেই সম্ভব।

ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্রের খবরাখবর বলতে বোঝায়—(১) কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি শব্দে কোন্ কোন্ অবস্থানে (আদি/মধ্য/অন্ত ইত্যাদি) উচ্চারিত হতে পারে বা পাবে না, (২) বিভিন্ন ধ্বনি প্রতিবেশে ধ্বনিটির উচ্চারণ একই থাকে নাকি কোনো উচ্চারণ বিকল্প দেখা যায়, (৩) উচ্চারণ-বিকল্প থাকে, কোন্ নির্দিষ্ট প্রতিবেশে কোন্ উচ্চারণ বিকল্প দেখা যায় ইত্যাদি চিহ্নিত করা এবং তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে ধ্বনিতত্ত্ব। কোনো নির্দিষ্ট ভাষার বাগ্ ধ্বনিগুলির ব্যবহারিক চরিত্রের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করে বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব।

রীতি অনুযায়ী ধ্বনিবিজ্ঞানে বিচার্য ধ্বনিটিকে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হয় [p], [I], [ঙ] ইত্যাদি। ধ্বনিতত্ত্বে বিচার্য ধ্বনিটিকে এক জোড়া বাঁকা দাগের মধ্যে, ভাষার নামসহ উল্লেখ করতে হয়।—বাংলা /p/, বাংলা /ঙ/ বাংলা /I/ বা ইংরেজি /t/, হিন্দি /m/ ইত্যাদি।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

এই এককে আমরা বাংলার বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা করব।

৫.৩ দুটি স্তরের কারণ

ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রতিটি বাগ্‌ধ্বনির গঠনের নির্বিশেষে বিশ্লেষণ করে এবং প্রতিটি ধ্বনির বিভিন্ন গাঠনিক উপাদান নির্ধারণ করে। আর ধ্বনিতত্ত্বে কোনো ধ্বনিকে একটি নির্দিষ্ট ভাষার সিস্টেম বা প্রক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ করে। তুলনা দিয়ে বলা যায় একটা মানুষের ওজন, উচ্চতা, রং, নাক-চোখের গড়ন ইত্যাদির বর্ণনা হল ধ্বনিবিজ্ঞানের নির্বিশেষে বর্ণনার সমতুল্য। আর মানুষটির পারিবারিক ও সামাজিক পরিচয়—অর্থাৎ সে কোন্ বাড়িতে থাকে, তার বাবা-মার পরিচয়, তার পরিবারে আর কে আছে, জীবিকাসূত্রে সে কোথাকার সঙ্গে জড়িত ইত্যাদি হল ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশেষ বর্ণনার সমতুল্য।

অর্থাৎ ধ্বনিবিজ্ঞানের থেকে ধ্বনিতত্ত্ব হল নির্বিশেষ স্তর থেকে বিশেষ স্তরে উত্তরণ। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় ভাষা বিশ্লেষণের আলোচনা শুরু হল ধ্বনিবিজ্ঞান দিয়ে, ধ্বনিবিজ্ঞানের পরবর্তী উচ্চতর স্তর হল ধ্বনিতত্ত্ব।

এই স্তর দুটি বুঝে নেওয়ার পরে চলুন আমরা গোড়ার প্রশ্নে ফিরে যাই কেন এই দুটি স্তরের অবতারণা।

আমরা যখন কথা বলি তখন ধ্বনিগুলো একের পর এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় উচ্চারিত হয়। এই অবিচ্ছিন্ন ধারায় উচ্চারিত হবার সময়ে প্রতিটি ধ্বনির গাঠনিক চরিত্রে অল্প বিস্তর বৈচিত্র্যে দেখা যায়। যেমন, ধান-এর [dh] এর তুলনায় দুধ-এর [dh] অনেক কম মহাপ্রাণিত। ধ্বনিবিজ্ঞানের বিচারে এই দুটি [dh] ধ্বনি আলাদা ধ্বনি হিসাবে গণ্য হলেও বাংলাভাষী হিসেবে আমাদের আশৈশবে ভাষা-ধারণার ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে বাংলায় এই দু-ধরনের [dh] একটি মূল [dh] ধ্বনিরই উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে মাত্র, দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনি নয়।

আর একটু বিস্তারিতভাবে বলি। যখন ধান উচ্চারণ করছি তখন [dh] পুরোমাত্রায় মহাপ্রাণ ধ্বনি। কিন্তু

যখন দুধ উচ্চারণ করছি তখন এই শব্দান্ত [dh]-এর উচ্চারণ প্রায় **[d]**-এর মতো—অর্থাৎ দুধ বা দুদ যে কোনো একটি লেখা যায়। দুধ প্রচলিত বানানের চেহারা, আর দুদ উচ্চারণের চেহারা। আবার যখন উচ্চারণ করছি দুধের, তখন কিন্তু শব্দান্ত নয় বলে তার মহাপ্রাণতা আবার ফিরে আসছে। আমরা জানি এই তিন ক্ষেত্রেই দু-রকম উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে একটি মূলধ্বনি [dh]।

বাংলায় এ দুরকম [dh] -এর, অর্থাৎ মহাপ্রাণিত ও অমহাপ্রাণিত **[dh]**-এর গাঠনিক, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যাবহারিক অ-স্বাতন্ত্র্য—এই আপাত বিপরীত দুটি বৈশিষ্ট্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি বিপরীত ধারণাকে মেলাবার জন্যই প্রয়োজন ধ্বনিবিজ্ঞানের পাশাপাশি ধ্বনিতত্ত্বের অবতারণা। ধ্বনিতত্ত্ব নানান বিমূর্ত ধারণার যুক্তিসঙ্গত পটভূমিতে একাধিক উচ্চারণ-বৈচিত্র্যকে একই ধ্বনির বিকল্প উচ্চারণ বলে গণ্য করে মাতৃভাষাভাষীর সঠিক অনুভূতির সঙ্গে ধ্বনিবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা করে। ধ্বনিতত্ত্বের দুটি অন্যতম বিমূর্ত মৌলিক ধারণা হল—

১) ধ্বনিমূল/মূলধ্বনি/ধ্বনিকল্প/ধ্বনিম/স্বনিম ও

২) পূরকধ্বনি/সহধ্বনি/ধ্বনিবিকল্প/বিস্বন।

বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন নামগুলিই এখানে উল্লেখ করলাম। তবে এই দুটি ধারণার ব্যাখ্যায় আসছি পরে।

৫.৪ ভাষায় ধ্বনিমূলের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের কারণ

ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ ঃ

প্রথমত, যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যদি একই মানুষ ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করে তাহলে প্রতিটি উচ্চারণেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সূক্ষ্মযান্ত্রিক বিচারে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের কোনো দুটি উচ্চারণ অভিন্ন হয় না, একই মানুষ পর পর চারবার কালকাল শব্দটি উচ্চারণ করলে শব্দের প্রথমে /k/ ধ্বনিটির উচ্চারণ চারবার চাররকম হবে।

দ্বিতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির উপর তার ধ্বনিগত প্রতিবেশের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। যেমন, বাংলার দুটি শব্দ পলতা আর উল্টো - দুটিতেই উচ্চারণে ল্ ধ্বনিটি রয়েছে। কিন্তু শব্দ দুটি পরপর উচ্চারণ দু'রকম। পলতা-র ল্-এর উচ্চারণ দন্ত্য - কারণ এর অব্যবহিত পরবর্তী ধ্বনিটি দন্ত্য। IPA তালিকা থেকে সংকেত ধার করে এই দন্ত্য ল্ ধ্বনিটিকে আমরা লিখব [p]।

আবার উল্টো র ল্ এর উচ্চারণ মূর্ধন্য - কারণ এর অব্যবহিত পরবর্তী ধ্বনিটি মূর্ধন্য। IPA সংকেতের সাহায্যে আমরা মূর্ধন্য ল্ লিখব [ɻ] এইভাবে।

এ তো গেল এক ধরনের প্রতিবেশ প্রভাব। এছাড়াও শব্দে ধ্বনির অবস্থানের প্রভাবেও উচ্চারণ-বৈচিত্র্য ঘটে। আমাদের আগের উদাহরণ ধান-দুধ এর পরিচায়ক, **[dh]**-এর মহাপ্রাণতা শব্দের আদিতে ও মধ্যে বজায় থাকে কিন্তু শব্দান্তে প্রায় লোপ পায়।

তৃতীয়ত, বক্তা-ভেদেও ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য ঘটে।

এই তিন ধরনের মধ্যে ধ্বনিতত্ত্ব মাথা ঘামায় দ্বিতীয় কারণটি নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধ্বনি প্রতিবেশে ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যই ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য।

৫.৫ ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প

ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনি ও তার প্রাতিবেশিক উচ্চারণ বৈচিত্র্য—এই দুটি ধারণাই সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও ধ্বনিমূলের তুলনায় তাদের উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলির অস্তিত্বই আমাদের কাছে বেশি বাস্তব। কারণ আমাদের বাগ্‌যন্ত্র ও শ্রবণযন্ত্র কার্যত এই বৈচিত্র্যগুলির উচ্চারণ করে ও শোনে। আমরা বক্তা হিসেবে, কথা বলবার সময় মনে মনে প্রয়োজনীয় মূলধ্বনিগুলিকে বেছে নিয়ে, তাদের সাজিয়ে বড়ো বড়ো অর্থপূর্ণ একক (যেমন, শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি) তৈরি করি। কিন্তু বাস্তবে উচ্চারণ করি প্রতিটি মূলধ্বনির জন্য তার বিভিন্ন উচ্চারণ—বৈচিত্র্যগুলির মধ্যে কোনো কোনোটিকে, আবার শ্রোতা হিসেবেও আমরা শুনি এই উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলিই। তারপর মনে মনে আবার এই বৈচিত্র্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মূলধ্বনিটিতে পৌঁছে বিভিন্ন মূলধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত বড়ো বড়ো অর্থপূর্ণ এককে পৌঁছই।

একটা তুলনার মাধ্যমে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করি। ধরা যাক, একটা স্কুল। স্কুলে আছে দশটি ক্লাসঘরে দশটি শ্রেণি প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত। কোনো শ্রেণিতে দশজন ছাত্র, কোনোটিতে আট, কোনোটিতে চার, আবার কোনোটিতে বা এক।

এবার চলুন অষ্টম শ্রেণি বা ক্লাস এইটে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা তিন। সুতরাং বাস্তবে অষ্টম শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে এই তিনটি ছাত্র। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি বলতে আমরা চোখে দেখি এই তিনজন ছাত্রকে। অথবা উল্টো দিক থেকে বলা যায় যে এই তিনজন ছাত্রের কোনো একজনকে দেখলেই আমরা তাকে অষ্টম শ্রেণি এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলি বা আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে ক্লাস এইটের নির্দিষ্ট ক্লাস ঘরটি। এই ধারণা বা কল্পনার স্তরটি হল একটি মানসিক স্তর ; আর ছাত্র তিনটি হল বাস্তবের চাক্ষুষ স্তর।

এইবার তুলনায় আসি। অষ্টম শ্রেণির ঘর বা ঘরের কল্পনা হল ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। একটি মূলধ্বনির প্রতিটি উচ্চারণ-বৈচিত্র্য অষ্টম শ্রেণির এক একটি ছাত্রের সঙ্গে তুলনীয়। শুধু এক্ষেত্রে চাক্ষুষ ব্যাপারটা বলা-শোনায় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বাস্তবে বলা-শোনার স্তরে আমরা পাচ্ছি ধ্বনিমূলের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যগুলিকে—যার প্রত্যেকটি কোনো না কোনো মূলধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে। আর বাস্তবের পশ্চাৎপটে উপস্থিত মানসিক স্তরে আমরা পাচ্ছি ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনির ধারণা ও অস্তিত্বকে।

এবার আসি নাম বা পরিভাষায়। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক তাঁদের লেখায় এই ধ্বনিমূল ও তার উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বোঝানোর জন্য বিভিন্ন নাম বা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন, ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনি বা ধ্বনিবিকল্প বা স্বনিম বা ধ্বনিম—এই নামগুলি সমার্থক। আবার এদের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয় পূরকধ্বনি, সহধ্বনি, ধ্বনিবিকল্প, বিস্বন এই নামগুলি। আমরা এর মধ্যে বেছে নিচ্ছি ধ্বনিকল্প বললে বোঝা যায় যে এই ধ্বনিকল্প নামক এককটি আসলে কোনো বাস্তব ধ্বনি নয়—ধ্বনির মতো—ধ্বনির কল্পনা মাত্র—অর্থাৎ কিনা

ক্লাস এইট-এর ক্লাসঘরের কল্পনা বা ধারণা। আর ধ্বনিবিকল্প বললে বোঝা যায় যে একটি ধ্বনিকল্পে বাস্তব প্রতিনিধি এটিও হতে পারে, আবার বিকল্পে ওটিও হতে পারে অর্থাৎ কিনা তিনজন ছাত্রই পরস্পর পরস্পরের বিকল্প প্রতিনিধি—ক্লাস এইট-এর। শুধুমাত্র এই স্বচ্ছতার কারণ এই জোড়াটিকে আমি বেছে নিচ্ছি।

আবার ফিরে যাই স্কুলের তুলনায়। এই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির সঙ্গে বাংলা ল্-এর তুলনা করা যায় নিম্নলিখিতভাবে—

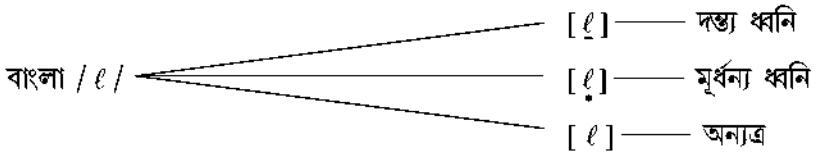

ক্লাস এইট-এর ছাত্র সংখ্যা তিন। বাংলা ধ্বনিকল্প / ল /-এর ধ্বনিবিকল্প তিনটি [ল̪], [ল̣] ও [ল] ক্লাস এইট এর সঙ্গে তুলনীয় এইটুকুই - এর পরবর্তী অংশ নয়। পরবর্তী অংশটুকুতে বলা হচ্ছে - [ল̪] এর প্রতিবেশ (বাঁকা দাগ/এর মানে প্রতিবেশে)। এই নিয়মে ওপরের পুরো সূত্রটি পড়তে ও বুঝতে হবে নীচের মতো করে ঃ

১) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে যায় ধ্বনিবিকল্প [ল̪] দন্ত্যধ্বনির অব্যবহিত আগে।

২) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে যায় ধ্বনিবিকল্প [ল̣] মূর্ধন্যধ্বনির অব্যবহিত আগে।

৩) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে যায় ধ্বনিবিকল্প [ল] অন্যত্র।

এই তিনটি ছোটো ছোটো সূত্রের সম্মিলিত প্রতীকরূপ হল পূর্বোক্ত সূত্রটি।

আবার ফিরে যাই স্কুলের তুলনাটিতে। এই স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা এক। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিকল্পের একটি ধ্বনিবিকল্পও আছে যেমন /ঁ/। /ঁ/-এর ধ্বনিবিকল্প একটিই [ঁ]। ধ্বনিবিকল্পের সংখ্যা এক হলে প্রতিবেশ উল্লেখ করে সূত্র প্রণয়নের যে প্রয়োজন হয় না তা বলাই বাহুল্য। আমাদের উদাহরণে বাংলা /ঁ/-এর উচ্চারণ যে কোনো প্রতিবেশেই [ঁ]।

আমাদের স্কুলের প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি ছাত্রই তাদের শ্রেণি নির্বিশেষে স্কুলের ছাত্র। ঠিক সেইরকমই আমাদের উচ্চারণে আমরা মোট যত ধ্বনিবিকল্প পাই, তারা প্রত্যেকেই তাদের পশ্চাৎপটের ধ্বনিকল্প-নির্বিশেষে, প্রাথমিকভাবে ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটিই ধ্বনিবিকল্প হিসেবে কোনো না কোনো ধ্বনিকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি স্বতন্ত্র উচ্চারণই ধ্বনি, আর ধ্বনিকল্পের সাপেক্ষে তারা কোনো না কোনো ধ্বনিকল্পের ধ্বনিবিকল্প। আরও বলা যায় যে ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্পের তুলনায় ধ্বনি একটি সাধারণ ধারণা।

তাহলে এই মুহূর্তে আমাদের ঝুলিতে ধ্বনিসম্বন্ধীয় তিনটি ধারণা—ধ্বনি, ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প। এই তিনটি নামের মধ্যে ধ্বনি নামটি সব ভাষাতাত্ত্বিকই ব্যবহার করেছেন। আগেই বলেছি যে ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প—এই দুটি নামের বিভিন্ন পারিভাষিক বৈচিত্র্য বর্তমান। আমরা এখানে প্রবাল দাশগুপ্ত (১৯৯৩)-র অনুসরণে ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প-এই পরিভাষা গুচ্ছই ব্যবহার করছি।

৫.৬ তিনটি ধারণার কী প্রয়োজন

তত্ত্বে বা ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি-ধ্বকিল্প-ধ্বনিবিকল্প—এই তিনটি ধারণা কেন প্রয়োজনীয় ? আলোচনা শুরু করা যাক ধ্বনিকল্প আর ধ্বনিবিকল্প নিয়ে। ধ্বনি প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ধ্বনিবিকল্পগুলির অস্তিত্ব বাস্তব কিন্তু ধ্বনিকল্পের অস্তিত্ব মানসিক। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই দুটি আলাদা বা পৃথক ধারণার প্রয়োজন কী ? বাস্তবে আমরা যখন ধ্বনিবিকল্পগুলিই শুনি ও বলি, তখন শুধুমাত্র ধ্বনিবিকল্প ধারণার সাহায্যে কাজ চালালেই তো হয়, আবার ধ্বনিকল্পের কল্পনা করে তত্ত্বকে অহেতুক জটিল করা কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমে দেখা দরকার ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প—দুটি ধারণা ভাষায় কী কাজ করে। যদি একটির কাজ অন্যটি চালিয়ে নিতে পারে তবে তত্ত্বেও আমরা যে কোনো একটি ধারণার অবতারণা করেই কাজ চালাতে পারি। কিন্তু ভাষায় দুটি ধারণার কাজ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয় তবে তত্ত্বেও ধারণা দুটিকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে।

যদি শুধুমাত্র ধ্বনিবিকল্প ধারণা দিয়ে কাজ চালানো হয় তাহলে দেখা যাবে বাংলারাই মতো কোনো একটি ভাষার ধ্বনি বর্ণনা করে বলতে হবে এই ভাষায় তিনটি ল্ ধ্বনি, চারটি ন্ ধ্বনি, দুটি প্ ধ্বনি, পাঁচটি শ্ ধ্বনি অথবা তিনটি ল্ জাতীয় ধ্বনি, চারটি ন্ জাতীয় ধ্বনি, দুটি প্ জাতীয় ধ্বনি ইত্যাদি। অর্থাৎ ভাষার ধ্বনির মোট সংখ্যা দাঁড়াবে বিশাল। ধ্বনির সংখ্যা যত বাড়বে ব্যাকরণের বপুও তত বাড়বে। অর্থাৎ প্রথম অসুবিধা হল ব্যাকরণে মিতাচার বা ইকনমি থাকবে না। দ্বিতীয়ত মাতৃভাষীরা ওই ভাষায় ঐ বিশাল সংখ্যক ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করবে না অর্থাৎ এই ধরনের সিদ্ধান্ত মাতৃভাষীর অনুভূতি বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ হবে। যেমন, বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা কেউ স্বীকার করবেন না যে বাংলায় তিনটে 'ল' ধ্বনি। তৃতীয়ত, একটি ধ্বনিবিকল্প ও তার প্রতিবেশের সঙ্গে তার যে যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক (যেমন, মূর্ধন্য ল্ মূর্ধন্য ধ্বনির অব্যবহিত আগে বসে) সেটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।

আবার বিপরীতক্রমে যদি শুধুমাত্র ধ্বনিকল্পের ধারণা দিয়ে কাজ চালানো হয় তখন বাস্তব অবস্থাটার ব্যাখ্যাটাই অধরা থেকে যাবে।

অর্থাৎ দুটি ধারণার কোনো একটি না থাকলেই তত্ত্ব দাঁড়াবে না—দুটিই প্রয়োজনীয়।

এবার আসি ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প এই ধারণা দুটি ভাষায় কী কাজ করে সেই প্রসঙ্গে।

ভাষার দুটি শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য ঘটায় ধ্বনিকল্প। যেমন বাংলায় দিন আর তিন-এই দুটি শব্দ ভিন্নার্থক। শব্দ দুটির আদি ধ্বনি /d/ ও /t/ ছাড়া বাকি অংশ একই। অর্থাৎ দুটিতেই রয়েছে /n/ ও /n/ । সুতরাং আমরা বলতে পারি যে তিন ও দিন শব্দদুটির ভিন্নার্থ নির্দেশ করছে /t/ ও /d/ এই দুটি ধ্বনিকল্প। কেননা শুধুমাত্র এই দুটি ধ্বনির জন্যই শব্দদুটি পরস্পরের থেকে পৃথক। আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—তিল, তেল, তাল, তল, তোল-এই পাঁচটি শব্দ ভিন্নার্থক পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরধ্বনিকল্পের জন্য। জাম ও জাল-এর ভিন্নার্থ নির্দেশ করছে /m/ ও / / ধ্বনিকল্প দুটি।

শুধুমাত্র দুটি পৃথক ধ্বনিকল্পের অস্তিত্বই নয়, একটি ধ্বনিকল্পের উপস্থিতি—অনুপস্থিতিও ভিন্ন অর্থের নির্দেশ দেয়। যেমন, আম, নাম। এক্ষেত্রে একটি /n/ উপস্থিত, অন্যটিতে অনুপস্থিত।

এপ্রসঙ্গো ধ্বনিকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে যদিও বিভিন্ন ধ্বনিকল্প পরপর সাজিয়ে শব্দ ইত্যাদি অর্থপূর্ণ একক তৈরি হয় এবং যদিও বিভিন্ন শব্দের মধ্যে অর্থপার্থক্যও নির্দেশ করে ধ্বনিকল্প, ধ্বনিকল্প নিজে কিন্তু ভাষার অর্থহীন একক। অর্থাৎ ভালো /bhalo/ এই অর্থপূর্ণ শব্দটি গড়ে উঠেছে /bh/+/a/+/ ℓ /+/o/। এই চারটি ধ্বনিকল্প জুড়ে। আবার ভালো আরা আলো-র অর্থপার্থক্য নির্দেশ করছে। /bh/ ধ্বনিকল্পের উপস্থিত ও অনুপস্থিত। কিন্তু /bh/, /a/, / ℓ /, /o/, এর চারটে ধ্বনিকল্পের কোনোটিরই নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।

সংক্ষেপে বলা যায় যে ভাষার একক ধ্বনি কল্পের দ্বৈত চরিত্র—(ক) একদিকে, ধ্বনিকল্প নিজে অর্থহীন, (খ) অন্যদিকে ভাষার অর্থপূর্ণ একক গড়ে তোলে এই ধ্বনিকল্পগুলিই।

ধ্বনিকল্পের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল ভাষার যে কোনো অর্থপূর্ণ বৃহত্তর একককে ধ্বনিকল্পে ভেঙে দেখানো যায় কিন্তু ধ্বনিকল্পকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর এককে ভাঙা যায় না অর্থাৎ ভাষা শরীরের ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনিকল্প।

এই দুই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে ধ্বনিকল্প হল ভাষা শরীরের ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক। এই ক্ষুদ্রতম অর্থহীন এককের সমন্বয়ে অর্থপূর্ণ এককগুলি গড়ে ওঠে ও ভাষায় অর্থ পার্থক্য সূচিত হয়।

ধ্বনিবিকল্পের প্রয়োজন হয় উচ্চারণের বাস্তব অবস্থাটা বিশ্লেষণের জন্য। অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায় যে কোনো ভাষার কোনো একটি ধ্বনিকল্প আসলে কীভাবে উচ্চারিত হচ্ছে তাই দেখায় ধ্বনিবিকল্প। অর্থাৎ ধ্বনিবিকল্প হল মানসিক ধারণার বাস্তব প্রতিফলন। কার্যত ধ্বনিবিকল্পের তুলনায় ধ্বনিকল্প একটি বিমূর্ত ধারণা।

একটি ধ্বনিবিকল্প সবসময়ে একটি ধ্বনিবিকল্পের আংশিক চেহারা ফুটিয়ে তোলে। তাই শুধুমাত্র ধ্বনিবিকল্প ধারণার সাহায্যে ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিলে হয় সেই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ হবে, নয়তো সবসময়ই পরস্পর সম্পর্কিত ধ্বনিবিকল্পগুলিকে একসঙ্গো একটু গুচ্ছ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ বাংলা ল্-এর উল্লেখ করতে গেলেই বলতে হবে [$\underline{\ell}$] + [$\underset{\bullet}{\ell}$] + [ℓ]। এইভাবে উল্লেখ করার চাইতে মিলিয়ে একটি ধ্বনিকল্প [l]-এর অবতারণা অনেক সরল পদ্ধতি।

প্রতিটি মানুষের কাছেই তার মাতৃভাষার ধ্বনিকল্প ধ্বনিকল্পের এই দুটি বিমূর্ত মূর্ত স্তর ভীষণভাবে অস্তিত্বশীল—তাই তত্ত্বেও এদের অবতারণা জরুরি।

ভাষার ক্ষুদ্রতম এককের প্রতিটি উচ্চারণই সাধারণভাবে ধ্বনি। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ধ্বনি কোনো ধ্বনিকল্পের সঙ্গো যুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে কারো বিকল্প হিসেবে চেনা যায় না— তাই তাকে ধ্বনিবিকল্প নাম দেওয়া যায় না। অর্থাৎ ধ্বনিবিকল্প হল একটি সাপেক্ষ ধারণা। ধ্বনিকল্প নিরপেক্ষ যে কোনো ধ্বনির জন্য একটি নিরপেক্ষ নাম থাকা জরুরি। ধ্বনি নামটি সেই নিরপেক্ষ ধারণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির ব্যাবহারিক চরিত্র চিত্রণের জন্য ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণাই জরুরি।

৫.৬.১ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের ব্যাখ্যা

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় তাত্ত্বিক ধারণা ভাবনার অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। এই অংশে যতটা সম্ভব সরল ভাষায় কয়েকটি জরুরি তাত্ত্বিক ভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে।

ধ্বনিকল্পের অস্তিত্ব যেহেতু প্রধানত আমাদের অনুভূতি সমর্থিত, তাই বাস্তবে ধ্বনিকল্পের চরিত্র বিশ্লেষণের কাজটাও হয়ে ওঠে বেশ জটিল। এক একজন ধ্বনিতাত্ত্বিক ধ্বনিকল্পের এক একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রধানতম মনে করে সেই নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের চরিত্র চিত্রণ করেন। কেউ জোর দেন ধ্বনিকল্পের মানসিক অস্তিত্বের উপর, কেউ বা তার শর্তসাপেক্ষ উচ্চারণ বৈচিত্র্যের উপর, আবার কারো ভাবনায় ভাষায় অর্থপার্থক্য সূচনা করাই ধ্বনিকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সব ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের ফলে ধ্বনিতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিবিকল্পের স্বরূপ ও ব্যাখ্যাত হয়েছে অন্তত চারভাবে। এই চারটি দৃষ্টিকোণ হল ঃ

ক) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ বা metalistic/psychological view

খ) বাহ্যিক তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণ বা /physical view

গ) কার্যকরী দৃষ্টিকোণ বা /functional view

ঘ) স্বাতন্ত্র্যসূচক দৃষ্টিকোণ বা /distinctive feature view

এই চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলি সংক্ষেপে এই রকম ঃ

ক) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে ধ্বনিকল্প হল একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ—যাকে আমরা মনে মনে একটি আদর্শ ধ্বনির মর্যাদা দিই। আদর্শ মানসিক এবং আন্তরিক লক্ষ্য থাকে এই আদর্শ ধ্বনিটি উচ্চারণ করা, কিন্তু কার্যত এই লক্ষ্যপূরণ হয় না। আদর্শ, ধ্বনিকল্পের প্রতিটি বাস্তব উচ্চারণই আদর্শের সঙ্গে না হয়ে তার কাছাকাছি হয়। এই আদর্শচ্যুতির কারণ হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের দুটি অভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণের অক্ষমতা ও প্রতিটি ধ্বনির নির্দিষ্ট উচ্চারণের উপর তার প্রতিবেশী ধ্বনিসমূহের উচ্চারণের প্রভাব। এই কারণ দুটি আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই আদর্শচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী এবং এরই ফলে আমরা বাস্তব উচ্চারণে পাই ধ্বনিকল্পের নানান ধ্বনিবিকল্প।

ধ্বনিকল্প একটি মানসিক ধারণা—এই মতের প্রধান প্রবক্তা পোল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানী বদিন দ্য কতেনি। পরবর্তীকালে সোস্যুর ও সাপির ও এই মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন।

খ) বাহ্যিক তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ধ্বনিকল্পকে এক একটি ধ্বনিপরিবার হিসেবে দেখা যায়। একটি ধ্বনিকল্পের প্রতিটি ধ্বনিবিকল্প একই ধ্বনি পরিবারের সদস্য। একই পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য হবার জন্য প্রতিটি ধ্বনিকে দুটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়।

(১) ধ্বনিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে সেই পরিবারভুক্ত অন্যদের গাঠনিক সাদৃশ্য বা ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকতে হবে।

(২) প্রতিটি সদস্য একটি সুনির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রতিবেশে উচ্চারিত হবে। অর্থাৎ এক সদস্যের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিবেশে অন্য সদস্য উচ্চারিত হবে না।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বাংলায় পূর্বোক্ত [ল̪] অর্থাৎ দন্ত্য ল্ এবং [ɭ] অর্থাৎ মূধন্য ল্ (যথাক্রমে পলতা ও উল্টো শব্দে) এই দুটি ধ্বনির মধ্যে উচ্চারণ স্থান ব্যতীত অন্য সমস্ত গাঠনিক দিক দিয়েই সাদৃশ্য রয়েছে উভয়েই সঘোষ পার্শ্বিক ধ্বনি। কোনো দন্ত্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ববর্তীস্থানে কেবলমাত্র দন্ত্য ল্-ই উচ্চারিত হয়, মূর্ধন্য ল্ নয়। অনুরূপভাবে কোনো মূর্ধন্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্থানে কেবলমাত্র মূর্ধন্য ল্-ই

উচ্চারিত হয়, দন্ত্য ল্ নয়। অর্থাৎ [ℓ̱]-এর নির্দিষ্ট প্রতিবেশে [ℓ̣] অথবা [ℓ̣]এর নির্দিষ্ট প্রতিবেশে [ℓ̱] উচ্চারিত হয় না। এই দুটি শর্ত পূরণ করে বলেই বাংলায় [ℓ̱] এবং [ℓ̣] একই ধ্বনিকল্পের পরিবারভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ বাংলা ধ্বনিকল্প [ℓ̱]-এর ধ্বনিবিকল্প [ℓ̱] ও [ℓ̣]।

এই বাহ্যিক ধারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এই মতবাদ শুধুমাত্র ধ্বনিবৈজ্ঞানিক সূত্র ও বাহ্যিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে ধ্বনিকল্পের স্বরূপ নির্ণয় করে। ধ্বনিবৈজ্ঞানিক সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্র এমনকি অর্থনির্ভর কোনো সূত্রকেও জরুরি তথ্য বলে মনে করেন না। এই মতের প্রবক্তা হলেন—ড্যানিয়েল জোনস্।

গ) কার্যকরী দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পকে মনে করা হয় এক ক্ষুদ্রতম ধ্বনি একক — যার সাহায্যে ভাষায় অর্থের তারতম্য ঘটে। যেমন, বাংলায় /rod/ আর /roj/ (রোদ - রোজ) শব্দ ভিন্নার্থক। এদের উচ্চারণে বৈসাদৃশ্যময় অংশটুকু হল শব্দান্তে প্রথম শব্দে /d/ ও দ্বিতীয় শব্দে /j/। সুতরাং বলা যায় যে /d/ ও /j/ এই ধ্বনিপার্থক্যের ফলেই শব্দ দুটির অর্থপার্থক্য ঘটেছে। অর্থাৎ এখানে /d/ ও /j/ দুটি পৃথক ধ্বনিকল্প। কিন্তু বাংলায় [ℓ̱] ও [ℓ̣] (দন্ত্য ল্ ও মূর্ধন্য ল্) এর জন্য কোনো ধরনের অর্থ পরিবর্তন ঘটে না। তাই [ℓ̱] এবং [ℓ̣] বাংলা স্বতন্ত্রধ্বনিকল্প নয়। একটি ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্পমাত্র।

এই তৃতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্পের অর্থ পরিবর্তন ঘটানোর কাজটাকেই ধ্বনিকল্পের চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

এই কার্যকরী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ভাষায় দুটি ধ্বনিকে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে প্রতিপন্ন করার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে ন্যূনতম শব্দজোড় এর সাহায্য গ্রহণ করা। ন্যূনতম শব্দ জোড় হল কোনো ভাষার একজোড়া অর্থপূর্ণ শব্দ যাদের মধ্যে ন্যূনতম ধ্বনিগত পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন - আগের উদাহরণের এবং /din/ ও /tin/, /jam/ ও /jal/, /rod/ ও /roj/, /kali/ ও /khali/, /pan/ ও /kan/, /juto/ ও /Suto/, /goru/ ও /moru/, /aĕna/ ও /baĕna/, /cul/ ও /phul/ (দিন-তিন, জাম-জাল, রোদ-রোজ, কালি-খালি, পান-কান, জুতো-সুতো, গোরু-মরু, আয়না-বায়না, চুল-ফুল) ইত্যাদি। প্রতিটি ন্যূনতম শব্দজোড়ের ভিন্নার্থক সদস্য দুটির মধ্যে ধ্বনিগত বৈসাদৃশ্যগুলো বাংলা স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প। উপরোক্ত শব্দজোড়াগুলোর মাধ্যমে বাংলায় যথাক্রমে /t-d/, /m-ℓ/, /d-j/, /k-Kh/, /p-k/, /j-S/, /g-m/a, /b/, /c-ph-কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে গণ্য করা যায়।

তবে ভাষায় ন্যূনতম শব্দজোড় সবক্ষেত্রে সহজলভ্য নয়। ন্যূনতম শব্দজোড় না পাওয়া গেলে ধ্বনিমূল নির্ধারণের জন্য অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। এই কার্যকরী দৃষ্টিকোণের প্রবক্তা ব্লুমফিল্ড ও তাঁর অনুগামী গোষ্ঠী।

ঘ) এই কার্যকরী দৃষ্টিকোণেরই আরও সূক্ষ্মতর ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় ধ্বনিকল্পের বৈশিষ্ট্যমূলক দৃষ্টিকোণে।

এই দৃষ্টিকোণে অনুযায়ী প্রতিটি ধ্বনিকল্পকে একগুচ্ছ স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বলে মনে করা হয়। আমরা ধ্বনিবিজ্ঞানে দেখেছি প্রতিটি ধ্বনি বেশ কয়েকটি ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় গড়ে উঠেছে। যেমন, /p/ বাংলা ধ্বনিকল্পটির ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত বৈশিষ্ট্যগুলি হল ওষ্ঠ্য, স্পৃষ্ঠ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, ব্যঞ্জন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে /p/ এবং এই প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই /p/-কে বাংলার অন্যান্য কোনো না কোনো

ধ্বনিগুলো থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করেছে। যেমন, /p/-এর ব্যঞ্জনত্ব একে স্বরধ্বনিগুলি থেকে পৃথক করেছে ; ওষ্ঠত্ব /p/-কে /k/, /t̪/, /t/ ইত্যাদি ওষ্ঠ্য নয় এমন ধ্বনিগুলো থেকে পৃথক করেছে, স্পৃষ্টত্ব পৃথক করের /c/ ইত্যাদির মতো স্পৃষ্ট নয় এমন ধ্বনি থেকে, ঘোষহীনতায় /p/ পৃথক হয়েছে /p/-এর থেকে এবং অল্পপ্রাণত্বে /ph/-এর থেকে। অর্থাৎ প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই /p/ বাংলার অন্যান্য ধ্বনিকল্পের থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি সমন্বিত করে গড়ে উঠেছে /p/। এইভাবে বাংলা /p/-এর মতোই অন্যান্য প্রতিটি ধ্বনিকল্পই স্বাতন্ত্র্যসূচক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি এবং ভাষায় দুটি ন্যূনতম শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থপার্থক্য ঘটে এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্য, ধ্বনির পার্থক্যের জন্য নয়। যেমন, অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বাংলায় /tin/ ও /din/ এই দুটি শব্দের মধ্যে অর্থপার্থক্য সূচনা করছে শুধুমাত্র অঘোষ-ঘোষ এই বৈশিষ্ট্যটি, /t/ ও /d/ সামগ্রিকভাবে এই ধ্বনি দুটি নয়। সংকেতের সাহায্যে বলা যায় /t/ হল [- ঘোষ] বা না-ঘোষ আর /d/ হল [+ ঘোষ] বা হ্যাঁ-ঘোষ ধ্বনি। এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ভাষার প্রতিটি ধ্বনিকল্পকে ওই ভাষায় প্রয়োজনীয় প্রতিটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের /t/ ও বা অস্তি-নাস্তির নিরিখে বর্ণনা করা যায়।

এই দৃষ্টিকোণের প্রবক্তা প্রাগ্স্কুল গোষ্ঠীর ভাষাবিজ্ঞানী ক্রুবেৎস্কয়। পরবর্তীকালে যাকস্পন ও হ্যালে এই দৃষ্টিভঙ্গির আরো সুনির্দিষ্ট চেহারা দেন। আরও পরবর্তী সময়ে ধ্বনিকল্পের এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের তত্ত্বের ওপরেই গড়ে ওঠে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম মূল ভিত্তি—নোয়াম চমস্কি ও হ্যাসের তত্ত্বে।

তবে আগেই বলা হয়েছে যে ধ্বনিতত্ত্বের এই আলোচনায় আমরা সঞ্জননী রীতিকে অন্তর্ভুক্ত করছি না, বর্ণনামূলক রীতিতেই আলোচনা সীমিত রাখছি।

৫.৬.২ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিকল্প নিরূপণ পদ্ধতি

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণগুলি বহু বিতর্কিত। বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব শেখার জন্য তাত্ত্বিক বিতর্কের চেয়েও বেশি জরুরি ধ্বনিকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো চিনে নেওয়া। বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের চারটি দৃষ্টিকোণ সম্মিলিতভাবে ধ্বনিকল্পের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে চিনিয়ে দেয়। মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বশীলতা, ধ্বনিপরিবার সংগঠন, অর্থের পার্থক্য নির্দেশ ও স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সমষ্টি সংক্ষেপে এই চারটি ধ্বনিকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ শুরু হয় সেই ভাষার ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণ দিয়ে। এই ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই সেই ভাষা থেকে প্রচুর বাস্তব উচ্চারণ, মূলত শব্দ উচ্চারণ, সংগ্রহ করতে হয়—টেপ রেকর্ডে ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির মাধ্যমে। টেপ রেকর্ড করা থাকলে শব্দের উচ্চারণগুলো সেখানে থেকে যায়—সন্দেহ নিরসনের জন্য প্রয়োজন মতো সেগুলো বার বার শোনা যায় সরাসরি উচ্চারণ থেকেই হোক বা টেপরেকর্ড শুনেই হোক আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যসূচক সংকেতগুলো প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে উচ্চারণের লিপ্যন্তর করতে হবে। এই লিপ্যন্তরে থাকবে শুধু কান যতরকম ধ্বনি শুনছে সেই ধ্বনিগুলি। কারণ আমরা এখনো ধ্বনিকল্প ধারণা থেকে অনেক দূরে। তাই লিপ্যন্তরে শুধুই কানে শোনা প্রতিটি পৃথক ধ্বনির জন্য পৃথক সংকেত ব্যবহার।

ধ্বনিমূল্য অক্ষুণ্ণ রেখে লিপ্যন্তর করার পর আমরা যা পাই তা হল ভাষার বিভিন্ন ধ্বনিকল্পের নানান বাস্তব উচ্চারণ বৈচিত্র্য, অর্থাৎ ভাষার সম্ভাব্য সব ধ্বনিবিকল্পগুলো। এই ধ্বনি বিকল্পের অন্তরালে অবস্থিত ভাষার ধ্বনিবিকল্পগুলি যুক্তিযুক্তভাবে নিরূপণ করাই ধ্বনিতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

বর্ণনামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানে আলোচিত ধ্বনিকল্পের চারটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধ্বনিকল্প নিরূপণের একটি উদাহরণ দিচ্ছি বাংলা থেকে।

১। [ল a ল] লাল	৬। [a ল o] আলো
২। [ca ল̲ ta] চালতা	৭। [ni ল] নীল
৩। [⊃l po] অল্প	৮। [tha ল a] থালা
৪। [u ল̤ t̤ o] উল্টো	৯। [aro] আরো
৫। [thaba] থাবা	১০। [pa ল] পাল

ধ্বনিকল্পের বাহ্যিক বা তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণের বিচারে [*l*] (উদা নং ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১০) [ল̲] (উদা নং ২) এবং [ল̤] (উদা নং ৪)-এই তিনটি হল একই ধ্বনিকল্প এর /// তিনটি বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্প। এই ধ্বনিবিকল্পের নির্দিষ্ট উচ্চারণ প্রতিবেশ হল ঃ

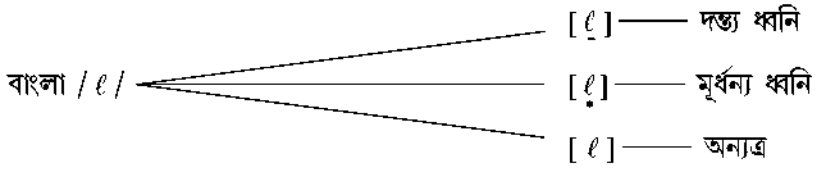

যদিও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ধ্বনিসূত্রটির পাঠ কেমন হবে তবুও আবার উল্লেখ করছি। এই সূত্রটি তিনটি পৃথক সাংকেতিক সমন্বয়।

তিনটি পৃথক সূত্র হল (ব্যাখ্যার পাশে বন্ধনীর মধ্যে সূত্রের সংকেত দেওয়া হল)

(১) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / (বাংলা / ল /) হয়ে ওঠে (→) দন্ত্য [ল̲]

[ল̲] দন্ত্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ব (— দন্ত্যধ্বনি) প্রতিবেশে (/)।

(২) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে ওঠে মূর্ধন্য [ল̤] মূর্ধন্য ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ব প্রতিবেশে।

(৩) বাংলা ধ্বনিকল্প / ল / হয়ে ওঠে দন্তমূলীয় / ল / অন্যসব প্রতিবেশ।

আবার ধ্বনিকল্পের কার্যকারী দৃষ্টিকোণের বিচারে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে [ল̲], [ল̤] ও [ল] একই ধ্বনিকল্প / ল / পরিবারের সদস্য হলেও [b] (উদা নং ৫) এবং [r] (উদা নং ৯) এবং [p] (উদা নং ১০) অন্য ধ্বনি পরিবারের সদস্য, / ল / এর নয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল, ন্যূনতম শব্দজোড় — উদাহরণ ৫ বনাম ৮ ; ৬ বনাম ৯ এবং ১ বনাম ১০।

এই বিশ্লেষণের সর্বস্তরেই [ল̲], [ল̤] ও [ল] এর বাস্তব অস্তিত্বের পাশাপাশি এর মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এখানে উল্লিখিত উদাহরণটি একটি অত্যন্ত সরল, কৃত্রিমভাবে বিন্যস্ত, আদর্শ বা উদাহরণ। বাস্তবে ধ্বনিতত্ত্বের সমস্যাগুলো এত সহজে সরলভাবে বিন্যস্ত নয়। তবে জটিলতার আভাস দিতে না পারলেও এই উদাহরণ থেকে আমাদের আলোচনা মূল প্রতিপাদ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দুটি প্রধান স্তরের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে আমাদের ধ্বনিবিকল্প সূক্ষ্ম উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলো আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালার বিভিন্ন সুপারস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট এর সংকেত ব্যবহার করে বোঝাতে হয়। যেমন এখানে তিন ধরনের /ℓ/ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে [ℓ̪], [ℓ̥] ও [ℓ]। এই ধ্বনিবিকল্প সম্বলিত লিপ্যন্তরের নাম phonetic transcription বা উচ্চারণ বৈচিত্র্যমূলক লিপ্যন্তর। ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুরু হয় এই উচ্চারণ বৈচিত্র্যমূলক বা ধ্বনিবিকল্পমূলক লিপ্যন্তরের স্তর থেকে।

ধ্বনিকল্প নির্ধারণের চূড়ান্ত স্তরে, অর্থাৎ যখন ভাষার ধ্বনিকল্পগুলো নির্ধারণ হয়ে যায় তখন একটি ধ্বনিকল্পের জন্য একটি সংকেত ব্যবহার করে লিপ্যন্তর করা হয়। এই লিপ্যন্তরকে বলে phonetic transcription বা ধ্বনিকল্পমূলক লিপ্যন্তর। উদাহরণে ২ ও ৪ নং এর ধ্বনিকল্পমূলক লিপ্যন্তর হবে [ca*l*ta] ও [uℓ̥o]।

অর্থাৎ বলা যায়, ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ধ্বনিকল্প নির্ধারণের সময় আমাদের লক্ষ্য থাকে ধ্বনিবিকল্পমূলক লিপ্যন্তর। কার্যত আমরা ধ্বনিকল্প মূলক লিপ্যন্তর দিয়ে শুরু করে আমাদের লক্ষ্য ধ্বনিবিকল্প লিপ্যন্তরের দিকে যাই।

বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার জগতে উল্লেখযোগ্য নাম হল হেনরি সুইট, পল প্যাসি, ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, বদিন দ্য কতেনি, ক্রবেৎস্কয়, রোমান য়ার্কপ্সন, সাপির, ব্লুমফিল্ড ইত্যাদি।

বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের পরবর্তী বিকাশ সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব নামে পরিচিত। এই সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের প্রবক্তা চমস্কি ও হ্যালে ১৯৬৮ তে।

৫.৭ ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের নীতি

বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব প্রধানত চারটি মুখ্য নীতির ভিত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিকল্প নির্ণয় করা। সেই ধ্বনিকল্পের ভিত্তিতে সেই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে। মুখ্য নীতি চারটি হল—

ক) বৈপরীত্য খ) পরিপূরক অবস্থান।

খ) ধ্বনিগত সাদৃশ্য ও ঘ) মুক্ত বৈচিত্র্য

৫.৭.১ বৈপরীত্য

সাধারণভাবে বৈপরীত্য বলতে বোঝায় দুটি ধ্বনির পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য। ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনির বৈপরীত্য সূচিত হয় ধ্বনিকল্পের বিরোধের মাধ্যমে। দুটি ধ্বনির মধ্যে বিরোধ থাকলে তবেই ধ্বনি দুই সেই ভাষার ধ্বনিমালায় দুটি স্বতন্ত্র্য বিন্দুতে অবস্থান করে এবং দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প হিসেবে গণ্য হয়। যেমন বাংলা /k/ ও /p/ দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প। কারণ এদের মধ্যে ধ্বনিকল্পের পারস্পরিক বিরোধ বর্তমান।

ধ্বনিকল্পের বিরোধ বলতে বোঝায় যে দুটি ধ্বনির কোনো ভাষায় একই ধ্বনি প্রতিবেশে ব্যবহার হওয়ার যোগ্যতা। কোনো ভাষায় কোনো দুটি ধ্বনিকল্পের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আছে কিনা তা নির্ণয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হল ন্যূনতম শব্দ জোড়ের সন্ধান। ন্যূনতম শব্দজোড় (যেমন- **[din] - [tin]**, [pan] - [kan] ইত্যাদি) সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ভাষায় যদি বিচার্য ধ্বনি দুটি দিয়ে তৈরি ন্যূনতম শব্দজোড় পাওয়া যায় তবে ধ্বনি দুটিকে নিশ্চিভাবে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে গণ্য করা যায়। যেমন বাংলায় আরও কয়েকটি উদাহরণ হল **[capa]** [caka] (চাপা-চাকা) **[dip]** [dik] (দীপ, দিক) শব্দজোড়ের সাহায্যে [p] ও [k] এই ধ্বনিদুটিকে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে প্রমাণ করা যায়।

ভাষায় দুটি পৃথক ধ্বনি সহযোগে তৈরি ন্যূনতম শব্দজোড়ের অস্তিত্বের অর্থ হল এই যে বিচার্য দুটি ধ্বনিই একই ধ্বনি প্রতিবেশে কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ **[-an]**-এই ধ্বনিপ্রতিবেশে [p] ও [k] এই দুটি ধ্বনিই কোনোরূপ শর্তনিরপেক্ষভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে। এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে **[p]** ও [k] ধ্বনিদুটি **[pan]** ও **[kan]** এই দুটি স্বতন্ত্রে অর্থের শব্দ তৈরি করে। তাই এরা বাংলায় স্বতন্ত্র দুটি ধ্বনিকল্প।

ধ্বনিকল্পের বিরোধ প্রমাণের অন্যতম উপায় হল ভাষার ন্যূনতম শব্দজোড় সন্ধান। কিন্তু ধ্বনিকল্পের বিরোধের প্রধান শর্ত হল দুটি ধ্বনির শর্তনিরপেক্ষ ব্যবহার। অর্থাৎ কোনো প্রতিবেশে একটি ধ্বনির ব্যবহার কোনোভাবেই অপর ধ্বনিটির ব্যবহার শর্তসাপেক্ষ নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যা বাংলায় [–*il*] এই ধ্বনিপ্রতিবেশে **[c, k, n, m, S, Kh, jh, dh, t, d, b, dh]** প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে, কোনো পারস্পরিক শর্তনিরপেক্ষভাবে ব্যবহার হয়ে **[cil, Kil, nil, mil, Sil, Khil, jhil, dhil, til, dil, bil, Bhil]** (চিল, কিল, নীল, মিল, শিল, খিল, ঝিল, ঢিল, তিল, ছিল, বিল, ভীল) এই স্বতন্ত্র শব্দগুলি গঠন করতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে ধ্বনিকল্পের বিরোধ প্রমাণের অন্যতম উপায় হল ভাষায় ন্যূনতম শব্দজোড় সন্ধান। ন্যূনতম শব্দজোড় কিন্তু সবক্ষেত্রে সহজলভ্য হয় না। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দজোড়ের কাছাকাছি ধারণা প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড় দিয়ে কাজ চালাতে হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।

৫.৭.২ পরিপূরক অবস্থান

অপর মুখ্যনীতি হল পরিপূরক অবস্থান। এই ধারণা অনুযায়ী ভাষায় দুটি ধ্বনির ব্যবহার সর্বদাই শর্তসাপেক্ষ। যেমন বাংলায় [r] ধ্বনি শব্দের আদিতে একটি কম্পিত ধ্বনি [raja, ritu, roj] (রাজা, ঋতু, রোজ) ইত্যাদি শব্দে [r] উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র কয়েকবার কম্পিত হয়। কিন্তু শব্দ মধ্যে ও শব্দান্তে উচ্চারিত [r] ধ্বনিতে জিহ্বাগ্র দন্তমূলক একবার মাত্র স্পর্শ করে অর্থাৎ এই দুই অবস্থানে [r] ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া তাড়িত ধ্বনির মতো। যেমন **[aram, tara, kar, har]** (আরাম, তারা, কার, হার ইত্যাদি)

বাংলা ধ্বনির এই উচ্চারণ বৈচিত্র্য কম্পিত ও তাড়িত [r] ধ্বনির উচ্চারণ নেহাৎই শর্তসাপেক্ষ। কম্পিত [r] এর উচ্চারণ শব্দে আদিতে অবস্থানের শর্তসাপেক্ষ এবং তাড়িত **[r]** এর উচ্চারণ শব্দে অন্যান্য অবস্থানের শর্তসাপেক্ষ। তাড়িত [r] এর জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানে কম্পিত [r] উচ্চারিত হয় না এবং কম্পিত এর নির্দিষ্ট স্থানে তাড়িত উচ্চারিত হয় না। এইভাবে বাংলায় কম্পিত এবং তাড়িত পারস্পরিক শর্তসাপেক্ষে পরস্পরের পরিপূরক অবস্থানে উচ্চারিত হয়।

পরিপূরক অবস্থানে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি ভাষার একটি ধ্বনিকল্পের বৈচিত্র্যমাত্র, স্বতন্ত্র ধ্বনি অর্থাৎ স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প নয়। বাংলা কম্পিত [r] ও তাড়িত [r] ধ্বনি দুটি বাংলা /r/ ধ্বনিকল্পের দুটি উচ্চারণ বৈচিত্র্য অর্থাৎ ধ্বনি কল্প।

৫.৭.৩ ধ্বনিগত সাদৃশ্য

মুখের ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনিকল্প বিশ্লেষণ করলে ধ্বনিগত কোনো একক আর পাওয়া সম্ভব নয়। পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র প্রতিটি ধ্বনিকল্পের ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি। যেমন-বাংলা /p/ ধ্বনিকল্পকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে ওষ্ঠ্য, স্পৃষ্ট, অঘোষ, অল্পপ্রাণ-এই ধ্বনিকগত বৈশিষ্ট্যগুলি।

দুটি ধ্বনির ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যত বেশি মিল থাকবে এবং তারা যত বেশি কাছাকাছি হবে, তাদের মধ্যে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মিল যত কমবে এবং বৈশিষ্ট্যগুলি যত দূরবর্তী হবে, দুটি ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিগত বৈসাদৃশ্য তত বাড়বে। যেমন, বাংলায় ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে /k, Kh, g, gh, p, n, S/ ধ্বনিকল্পগুলি নীচের মতো ঃ

/k/	অঘোষ	অল্পপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/kh/	অঘোষ	মহাপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/g/	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/gh/	ঘোষ	মহাপ্রাণ	কণ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/p/	অঘোষ	অল্পপ্রাণ	ওষ্ঠ্য	স্পৃষ্ট
/n/	— —	— —	দন্তমূলীয়	নাসিক্য
/S/	অঘোষ	— —	তালুদন্তমূলীয়	উষ্ম

(বাংলায় যেহেতু নাসিক্য ধ্বনিকল্পের ঘোষ অঘোষ ও মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণ এবং উষ্ম ধ্বনিকল্পের মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণ শ্রেণিভেদ নেই, তাই /n/ ও /s/ এর ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বহীন এবং বিবেচিত হল না।)

ওপরের তালিকা অনুযায়ী /K-Kh/, /k-g/, /g-gh/, /Kh-gh/, /K-p/-এর ধ্বনি শব্দজোড়ের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য অনেক বেশি, কারণ প্রতিটি জোড়ের দুই সদস্যের মধ্যে মাত্র একটি করে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য। /K-gh/, /Kh-p/, /K-n/, /S-p/, /S-n/ ইত্যাদি জোড়গুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে ধ্বনিগত সাদৃশ্যের পরিমাণ বেশ কম, কারণ এই জোড়গুলির দুই সদস্যের মধ্যে একাধিক ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য।

৫.৭.৪ মুক্ত বৈচিত্র্য

পরিপূরক অবস্থান ও মুক্ত বৈচিত্র্য উভয় ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ধ্বনিবিকল্পের সৃষ্টি হয়। তবে উভয়েই ধ্বনিবিকল্প সৃষ্টি করলেও উভয়ের মধ্যে তফাত এই যে পরিপূরক অবস্থানে সৃষ্ট ধ্বনিবিকল্পগুলির ব্যবহার শর্তনিরপেক্ষ। অর্থাৎ ধ্বনিকল্পের বিরোধের মতোই মুক্ত বৈচিত্র্যজনিত

ধ্বনিবিকল্পগুলি একই ধ্বনি প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়। তফাত শুধু ধ্বনিকল্পের বিরোধের ক্ষেত্রে শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থের পার্থক্য থাকে। যেমন-[nil - mil] । কিন্তু মুক্ত বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থের কোনো তারতম্য থাকে না।

ধ্বনিতত্ত্বে মুক্ত বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ কথোপকথনের সময়ে বাগ্‌যন্ত্রের উপর মানুষের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের অভাব। কথা বলার সময় অনেক ক্ষেত্রেই একটা ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করলে প্রতিটি উচ্চারণেই তার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে যেগুলি খুব সূক্ষ্ম নয়—অন্তত আমাদের মস্তিষ্ক যেগুলোকে পৃথক করতে পারে শুধুমাত্র সেগুলিই ধ্বনিতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ।

এই পার্থক্যগুলির কোনো শর্তাধীনতা বা ব্যাখ্যা নেই। যেমন—বাংলায় আখ কথাটা বার বার উচ্চারণ করলে শব্দটির প্রান্তিক ধ্বনি [Kh] কখনো [Kh] হবে, কখনো [K] হবে, কখনো বা এই দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু হবে। বাংলায় শব্দান্ত /Kh/ ধ্বনিকল্পের মহাপ্রাণতা ভেদে এই যে উচ্চারণ বৈচিত্র্য তা মুক্ত বৈচিত্র্যেরই ফলাফল।

আরও উদাহরণ হল বাংলা বানানে ঢ় এর উচ্চারণ। আষাঢ়, গাঢ়, মূঢ় ইত্যাদি শব্দের অত্যন্ত সচেতন পরিশীলিত উচ্চারণে ঢ় বর্ণের উচ্চারণ [r̤h], অন্যথায় [r̤] । ঢ় বর্ণ উচ্চারণে ধ্বনিকল্প /r̤/-তার উচ্চারণ বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্প [r̤] ও [r̤h]-ও মুক্ত বৈচিত্র্য ফল।

এই ধরনের বৈচিত্র্য যে কোনো বাংলা ভাষীর উচ্চারণেই অবশ্যম্ভাবী। শব্দান্ত অবস্থানে মহাপ্রাণ ধ্বনির বিভিন্ন মাত্রার মহাপ্রাণতা বৈচিত্র্য বা /r̤/ ধ্বনিকল্পের মহাপ্রাণতা বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ শর্তনিরপেক্ষভাবে উচ্চারিত হয়। এই বৈচিত্র্যের ফলে কোনোরকম অর্থপার্থক্য ঘটে না। [aKh – ak] [aSar̤h – aSar̤] শব্দজোড়গুলির মধ্যে ধ্বনির বিভিন্নতা থাকলেও অর্থের বিভিন্নতা নেই।

৫.৮ চারটি নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি

ধ্বনিতত্ত্বে প্রধানত এই চারটি নীতির প্রয়োগে কোনো ভাষার ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণ করা হয়। ধ্বনিকল্প বা ধ্বনিবিকল্প বলে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রতিটি অনির্ধারিত ধ্বনি বা অনির্ধারিত ধ্বনিকল্প বা অনির্ধারিত ধ্বনিবিকল্প ধ্বনিতত্ত্বে সাধারণ ধ্বনি বলে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্বে তিন ধরনের ধ্বনির অস্তিত্ব — অনির্ধারিত সাধারণ ধ্বনি বা ধ্বনি, ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প। এই তিন ধরনের ধ্বনির কথা ও প্রয়োজন বর্তমান এককের ৬ নং অংশে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো ভাষায় সাধারণ ধ্বনি বা ধ্বনি থেকে ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণ পদ্ধতির মূল সূত্রগুলি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল ঃ

৫.৮.১ ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

যদি একের বেশি ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে এবং যদি বিভিন্ন ধ্বনি প্রতিবেশ ধ্বনিগুলির সম্পূর্ণ শর্তাধীন উচ্চারণ হয় (অর্থাৎ ধ্বনিগুলি যদি পরিপূরক অবস্থানে উচ্চারিত হয়) তবে ধ্বনিগুলি ধ্বনিবিকল্প বলে নির্ণীত হবে। উদাহরণ বাংলা /n/ ধ্বনিকল্পের প্রতিবেশ ভেদে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন—

[n̄]	(তালব্য)	[Koñci] কঞ্চি
[n̤]	(মূর্ধন্য)	[than̤da] ঠান্ডা
[n̲]	(দন্ত্য)	[pan̲tua] পান্তুয়া
[n]	(দন্তমূলীয়)	[nanan] নানান

উপরের উদাহরণগুলিতে /n/ এর প্রতিটি উচ্চারণ বৈচিত্র্যই সম্পূর্ণভাবে শর্তাধীন। তালব্য ধ্বনি [c] এর আগে তালব্য [n̄] উচ্চারিত হয়, মূর্ধন্য ধ্বনি [d̤] এর আগে মূর্ধন্য [n̤] উচ্চারিত হয়, দন্ত্য ধ্বনি [t] এর আগে দন্ত্য [n̲] উচ্চারিত হয়, ও অন্যত্র দন্তমূলীয় [n] উচ্চারিত হয়। প্রতিটি ধ্বনিবিকল্পই নিজের জন্য নির্দিষ্ট ধ্বনি প্রতিবেশ ভিন্ন অন্যত্র উচ্চারিত হয় না।

এই উদাহরণে দেখা যাচ্ছে বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার [n] এর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্যও রয়েছে এবং প্রতিটি [n] ই সম্পূর্ণ শর্তাধীনভাবে পরিপূরক অবস্থানে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এই বিভিন্ন [n] ধ্বনিগুলি, অর্থাৎ [n̄, n̤, n̲, n] ধ্বনিকল্প হিসেবেই নির্ধারিত হবে। বিভিন্ন ধ্বনিবিকল্পের মধ্যে একটি (সাধারণত যে রূপটি সবচেয়ে বেশি ব্যাবহৃত সেইটি) দ্বারা ধ্বনিকল্পের রূপটি নির্দেশ করা হয়। সবকটি বৈচিত্র্যকেই এই ধ্বনিকল্পের বৈচিত্র্য বলে নির্দেশ করা হয়। ওপরের উদাহরণে দন্তমূলীয় [n] কে ধ্বনিকল্প ধরে বলা যায়।

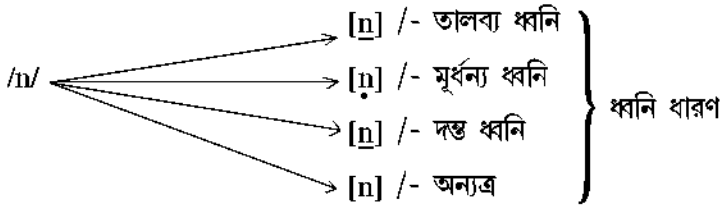

সংক্ষেপে ঃ ধ্বনিবিকল্প হিসেবে নির্ধারিত হবার আবশ্যিক শর্তদুটি—ধ্বনিগত সাদৃশ্য ও পরিপূরক অবস্থান।

৫.৮.২ ধ্বনিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

দুটি ধ্বনির মধ্যে কোনো ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাক বা না থাক, যদি ধ্বনিগুলি কোনোরকম শর্তনিরপেক্ষ ভাবে একই ধ্বনিপ্রতিবেশে অবস্থান করতে পারে এবং এই ধ্বনিগুলি দ্বারা তৈরি প্রায় একরকম শব্দ দুটির মধ্যে অর্থপার্থক্য থাকে তাহলে ধ্বনিদুটি আলোচ্য ভাষার দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ ধ্বনি দুটির সম্পর্ক যদি ন্যূনতম শব্দজোড় বা তার সমতুল্য ধারণার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে ধ্বনিদুটি সেই ভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায় উদাহরণ বাংলায়

[ban] বান
[pan] পান
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [b] ও [p] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

[gun] গুণ
[ghun] ঘুণ
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [g] ও [gh] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

[r ⊃ n̲] রং
[r ⊃ n] রণ
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [n] ও [n] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

[K ⊃ mola] কমলা
[K ⊃ rola] করলা
} এই ন্যূনতম শব্দজোড় দ্বারা [m] ও [r] স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

ন্যূনতম শব্দজোড়ের সমতুল্য আরো দুটি ধারণা হল ঃ

ক) প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড়-দুই এর বেশি ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিকল্পের বিরোধ নির্ণয়ের জন্য দুই এর বেশি প্রায় একরকম শব্দ সমূহকে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় বলা হয় যেমন—

[ti ℓ] তিল
[te ℓ] তেল
[ta*l*] তাল
[t⊃ ℓ] তল
[to ℓ] তোল
} এই প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড়ের ভিত্তিতে বাংলায় [i], [e], [a], [⊃] ও [o] এই পাঁচটি ধ্বনি স্বতন্ত্র স্বরধ্বনিকল্পের মর্যাদা পায়।

খ) প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়/কাছাকাছি ন্যূনতম শব্দজোড়-ভাষার ন্যূনতম শব্দজোড় সবসময় সহজলভ্য নয়। তাই ন্যূনতম শব্দজোড়ের অভাবে অনেক সময়ই প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে ধ্বনিকল্প নির্ধারণের কাজ করতে হয়। আমরা জানি যে ন্যূনতম শব্দজোড়ের সদস্যদের মধ্যে একটি মাত্র ধ্বনিকল্পের পার্থক্য থাকে। প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়ের ক্ষেত্রে শব্দ দুটির মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্যের পাশাপাশি একাধিক ধ্বনিকল্পের বৈসাদৃশ্য থাকে, যেমন বাংলায়।

[reSom] রেশম
[p⊃Som]
} এই ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে [r] ও [p] কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে নির্দেশ করা যায়।

[j ⊃ l] জল
[Kajol] কাজল
} এই ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে [⊃] ও [o] কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প বলে নির্দেশ করা যায়।

সুতরাং ধ্বনিতত্ত্বে প্রলম্বিত ন্যূনতম শব্দজোড় ও প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়—এই ধারণা দুটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে উল্লেখ্য যে ধ্বনিকল্পের বিরোধের ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলির মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য নেহাতই অপ্রয়োজনীয় শর্ত, প্রয়োজনীয় শর্ত হল আলোচ্য ধ্বনিগুলির শর্তনিরপেক্ষ অবস্থান।

সংক্ষেপে ঃ ভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প হিসেবে নির্ধারিত হবার আবশ্যিক শর্ত দুটি — শর্তনিরপেক্ষ অবস্থান ও শব্দজোড়ের মধ্যে অর্থ পার্থক্য।

৫.৮.৩ মুক্তবৈচিত্র্যে ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের সূত্র

দুটি ধ্বনির মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা যদি কোনোরকম শর্তনিরপেক্ষভাবে একই ধ্বনির প্রতিবেশে অবস্থান করে, কিন্তু এই ধ্বনি দুটি দিয়ে তৈরি প্রায় একরকম শব্দ দুটির মধ্যে কোনো অর্থ পার্থক্য না থাকে তাহলে ধ্বনি দুটি বিকল্প বলেই নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ দুটি ধ্বনির মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ বর্তমান থাকলে তারা ধ্বনিবিকল্প বলে নির্ধারিত হবে। উদাহরণ- [dudh – dud] দুধ, [megh – meg] মেঘ, [adh – ad] আধ, [aSarh - aSar] আষাঢ় ইত্যাদি। বাংলায় মহাপ্রাণতা স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের লক্ষণ হলেও শব্দান্ত অবস্থানে ধ্বনির মহাপ্রাণতা অল্পপ্রাণতার মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ বর্তমান। সুতরাং শব্দান্তে (অন্যত্র নয়) মহাপ্রাণ ধ্বনি ও তার অনুরূপ অল্পপ্রাণ ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিবিকল্পের সম্বন্ধ বর্তমান।

সংক্ষেপে ঃ— ভাষার মুক্ত বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে ধ্বনিবিকল্প হিসেবে নির্ধারিত হবার আবশ্যিক শর্ত তিনটি—ধ্বনিগত সাদৃশ্য, শর্তনিরপেক্ষ অবস্থান ও শব্দজোড়ের অভিন্ন অর্থ।

৫.৯ বাংলা ধ্বনিকল্প

ওপরের তিনটি মূলসূত্র অনুসরণ করে মান্য বাংলায় মোট ৪৬টি ধ্বনিকল্প নির্ধারণ করা হয়। এই ৪৫টির তালিকা এবং তাদের ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত শ্রেণিকরণ আগের এককে দেওয়া হয়েছে। ৪৫টি ধ্বনিকল্পের মধ্যে ২৯টি ব্যঞ্জন ধ্বনিকল্প, ৭টি স্বরধ্বনিকল্প, ৭টি অনুনাসিক ধ্বনিকল্প ও ২টি অর্ধস্বর ধ্বনিকল্প।

ধ্বনিকল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই শব্দে সব অবস্থানে উচ্চারিত হয়। অবস্থান বলতে শব্দের কোন জায়গায় ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় বা হতে পারে তাকেই বোঝায়। ধ্বনিতত্ত্বে মুখ্যত চারটি অবস্থান বিবেচনা করা হয়।

১। আদি অবস্থান অর্থাৎ শব্দের আদিতে উচ্চারণ

২। অন্ত অবস্থান অর্থাৎ শব্দের শেষে উচ্চারণ

৩। মধ্য অবস্থান অর্থাৎ শব্দে আদি ও অন্ত ছাড়া অন্য স্থানে উচ্চারণ

৪। সন্নিকৃষ্ট অবস্থান অর্থাৎ স্বর + স্বর অথবা ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশে উচ্চারণ

আগেই বলেছি বাংলার অধিকাংশ ধ্বনিকল্পই এর সবকটি অবস্থানেই উচ্চারিত হয়। যেমন /K/- /Kan, Kak, akal, ɔrko/ কান কাক, আকাল ও অর্ক এই চারটি শব্দে /K/ ধ্বনি নাই যথাক্রমে আদি, অন্ত, মধ্য ও সন্নিকৃষ্ট অবস্থানে উচ্চারিত হচ্ছে।

আবার কয়েকটি ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ নেহাতই অবস্থান নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ সব অবস্থানে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন /n̲/শব্দে মধ্য, অন্ত, সন্নিকৃষ্ট অবস্থানে উচ্চারিত হলেও, যেমন /Kan̲al, bæn̲, ban̲la/ বাঙাল, ব্যাং, বাংলা আদিতে হয় না। আবার /æ/ ও /ɔ/ স্বরধ্বনি কল্পদুটিকে অন্তঅবস্থানে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না কয়েকটি একাক্ষর শব্দ, যেমন /bæ, thɔ/ ব্যা, থ, ছাড়া।

কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সেই ভাষার মোট কটি ধ্বনিকল্প, বিভিন্ন অবস্থানের প্রেক্ষিতে কোন ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ কতটা প্রশস্ত বা সংকীর্ণ এবং কোন ধ্বনিকল্পের কটি ধ্বনিবিকল্প—মূলত এই তিন ধরনের বর্ণনা দেয় ও আলোচনা করে।

● **বিভিন্ন মত**

বাংলা ধ্বনিকল্পের মোট সংখ্যা নিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মধ্যে অল্পবিস্তর মতো পার্থক্য আছে।

ক) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৮) এর মতে বাংলায় ২৯টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর, ৭টি অনুনাসিক ও ২টি অর্ধস্বর মোট ৪৫টি ধ্বনিকল্প। দন্ত্য [S] কে তিন স্বতন্ত্র ধ্বনিমূলের মর্যাদা দিয়েছেন এবং [i] ও [u] অর্ধস্বরকে স্বীকার করেননি।

খ) পরেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৭৭) এর মতে বাংলায় ২৮টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর, ৭টি অনুনাসিক এবং ৪টি অর্ধস্বর মোট ৪৬টি ধ্বনিকল্প।

গ) রামেশ্বর শ (১৯৮৮) বাংলায় ২৮ টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর, ৭টি অনুনাসিক এবং ২টি অর্ধস্বর ধ্বনিমূলকে স্বীকার করেছেন।

ঘ) কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (১৯৯৩) তাঁর বাংলা ধ্বনির আলোচনায় ২৭টি ব্যঞ্জন, ৭টি স্বর—মোট ৩৪টি ধ্বনিকল্পের ও অনুনাসিকতার তালিকা দিয়েছেন।

বিভিন্ন মতের মধ্যে দেখা যায় যে মোটামুটি প্রধান দুটি কেন্দ্রবিন্দু [S] এবং অর্ধস্বরের সংখ্যাকে ঘিরেই মতপার্থক্য গড়ে উঠেছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া সকলেই [s] কে /S/এর ধ্বনিবিকল্প বলে নির্দেশ করেছেন। কারণ [s] বাংলা শব্দে কেবলমাত্র [K, Kh, t, th, n, p, ph, r,] ধ্বনিগুলির সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট ধ্বনির প্রথম সদস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়—যেমন, [St⊃b, snan, sthir, sp⊃ rSo, Sri, slil] স্তব, স্নান, স্থির স্পর্শ, শ্রী, শ্লীল ইত্যাদি।

কিন্তু যদি বাংলায় বহুব্যবহৃত ঋণ শব্দ, বিশেষত ইংরেজি শব্দগুলিকে বিবেচনা করা হয় তাহলে [s] কে স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেমন [sinema, gris, sistem] সিনেমা, গ্রিস, সিস্টেম ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত শব্দগুলিতে [s] ধ্বনি বাংলায় স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্পের মর্যাদা দাবি করে। এই যুক্তিতেই সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় [s] কে বাংলার স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প হিসেবে দেখিয়েছেন।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় দুটি অর্ধস্বর স্বীকার করেন, অন্যান্য মতে অর্ধস্বর বাংলায় নেই অথবা ৪টি আছে।

এখানে আমরা কোনো তর্কের অবতারণা না করে পূর্ববর্তী এককে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির তালিকাটির উল্লেখ করেছি।

৫.১০ ধ্বনি পরিবর্তন

সুকুমার সেনের মতে — 'কথা বলিবার সময় ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে পরপর উচ্চারিত হইলেও মনের মধ্যে সেগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে আসে, সুতরাং উচ্চারণকালে পূর্ববর্তী ধ্বনি অথবা পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করিতে পারে। উচ্চারণের দ্রুততার অথবা উচ্চারণ প্রযত্ন শিথিল করিবার চেষ্টার ফলে পরপর উচ্চারিত দুই ধ্বনির মধ্যে একটি অথবা উভয় ধ্বনি বিকৃত হইতে পারে। শ্বাসাঘাতে তীব্রতার জন্যও ধ্বনির বিকৃতি অথবা লোপ হয়। এইরূপে শব্দ ও পদ মধ্যস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন নানারকমের হয়।'

এই ধ্বনিপরিবর্তন মূলত চার ধরনের

ক) আগম

খ) লোপ

গ) পরিবর্তন ও

ঘ) বিপর্যাস

আগের এককেই এই চার ধরনের ধ্বনিপরিবর্তন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে।

ভাষায় ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে তৈরি ক্ষুদ্রতম এককের নাম পদাণু - যেমন ছাত্ররা শব্দে ছাত্র ও রা - এই দুটি পদাণু আছে। এক বা একাধিক পদাণু অর্থাৎ পদের অণুর সমন্বয়ে তৈরি হয় পদ বা শব্দ। ধ্বনিতত্ত্বে পদাণুস্থিত বা পদাণুপ্রান্তে স্থিত ধ্বনিকল্পের উচ্চারণ পরিবর্তনকে বলা পদাণুস্থ ধ্বনিকল্প পরিবর্তন বা marphophonemic change।

৫.১১ ধ্বনিতত্ত্বের একক

ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনিকল্প। ধ্বনিকল্পের পরবর্তী বৃহত্তর একক দল বা Syllable। ধ্বনিকল্পের আলোচনা হয়েছে। এবার দল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

দল হল ভাষার ক্ষুদ্রতম উচ্চারণ যোগ্য একক। দলের আবশ্যিক অংশ একটি স্বরধ্বনি কারণ স্বরধ্বনি স্বয়ং উচ্চারিত হতে পারে এবং স্বরধ্বনির সাহায্যে ভিন্ন কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে না। দলের আবশ্যিক অংশ এই স্বরধ্বনির আগে পরে কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি দলের ঐচ্ছিক অংশ।

স্বরধ্বনিকে V এবং ব্যঞ্জনধ্বনিকে C বলে উল্লেখ করে বাংলার বিভিন্ন ধরনের একদল শব্দের গঠন দেখানো হল নীচে

			V		[o]	ও
		C	V		[pa]	পা
		C	V	C	[kaj]	কাজ
	C	C	V	C	[prem]	প্রেম
C	C	C	V		[stri]	স্ত্রী
			V	C	[আজ]	আজ ইত্যাদি

আবশ্যিক স্বরধ্বনির পূর্ববর্তী এক বা একাধিক ঐচ্ছিক ব্যঞ্জনধ্বনি দল অনসেট (Oñ set) নামে পরিচিত এবং আবশ্যিক স্বরধ্বনির পরবর্তী ঐচ্ছিক ব্যঞ্জনধ্বনি দল কোডা (Coda) নামে পরিচিত। যেমন [Prem]— এই একদল শব্দে আবশ্যিক স্বরধ্বনি [e] অনসট [pr] ও কোডা [m]।

বাংলায় কোডাতে সাধারণত একটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তবে ঋণ শব্দে কখনো কখনো দুই হয় যেমন [b⊃ks, desk, art] 'box, desk, art' ইত্যাদিতে কোডা যথাক্রমে [Ks, sK, rt]

বাংলায় দলের অনসেটে যদি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাহলে প্রথমটি হয় [s] নয়তো দ্বিতীয়টি হল [r/l] - [Sthan, st⊃b, pran, mlan] স্থান, স্তব, প্রাণ, ম্লান ইত্যাদিতে অনসেট যথাক্রমে [sth, st, pr, ml]।

বাংলায় দলের অনসেটে তিনটি ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে এরা হয় [str/spr]—যেমন [stri, spriha] স্ত্রী, স্পৃহা ইত্যাদি।

একাধিক দলযুক্ত শব্দে স্বর মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন বাংলায় পরবর্তী দলের অনসেট বলে গণ্য হয়। যেমন, [a-mar] আমরা। এখানে স্বর মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন [m] শেষ দলের অনসেট। এই রকমই [bha – lo– ba– Sa] ভা-লো-বা-সা, [⊃-po-ra-ji-ta] অ-প-রা-জি-তা ইত্যাদি।

একাধিক দলযুক্ত শব্দে স্বর মধ্যবর্তী যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে যায়। ভাঙার প্রথম অংশটি পূর্ববর্তী দলের কোডা ও শেষ অংশটি পরবর্তী দলের অনসেট হিসেবে গণ্য হয়। যেসব [m⊃n-tro] মন্ত্র এখানে স্বর মধ্যবর্তী দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রথম অংশ [n] হয়েছে আদি দল [m⊃n] এর কোডা আর শেষ অংশ [tr] হয়েছে অন্তদল [tro] অনসেট। এইরকমই [pur – bo, poS – cim, ut – tor, doK – Khin] পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি।

দল প্রধানত দু-ধরনের রুদ্ধ দল ও মুক্ত দল। কোডা সম্বলিত দলকে বলে রুদ্ধদল। যেমন ওপরের উদাহরণে [Kaj, prem, aj, ut, – tor, dok, – Khin] ইত্যাদি।

কোডাহীন দলকে বলে মুক্ত দল—যেমন, ওপরের উদাহরণে [o, pa, stri, spri, ha a, bha, lo, ba, sa, ⊃ po, ra, ji, ta, bo, tro] ইত্যাদি।

এই হিসাবে [m⊃n-tro] শব্দের প্রথম দল রুদ্ধ ও দ্বিতীয় দল মুক্ত [bha-lo-ba-Sa], শব্দে চারটি দলই মুক্ত, আবার [ut-tor] এর দুটিই রুদ্ধ দল।

এক বা একাধিক ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে গঠিত ধ্বনিকল্প অপেক্ষা বৃহত্তর একক দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। ধ্বনিতত্ত্বে দল অপেক্ষা বৃহত্তর একক—যেমন, পর্ব ইত্যাদিও আছে—তবে তা আমাদের আলোচনার সীমানাভুক্ত নয়।

বিভাজ্য ধ্বনিকল্পই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অবিচ্ছিন্ন মুখের ভাষার যে ধ্বনিকল্পগুলি পর পর সাজানো থাকে এবং যাদের একটি একটি করে বিভাজন করা যায় তাদেরই বিভাজ্য ধ্বনিকল্প বলে—তা আগের এককেই বলা হয়েছে।

৫.১২ সারাংশ

বর্তমান এককটিতে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের কিছুটা তাত্ত্বিক ও কিছুটা ব্যাবহারিক আলোচনা করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে পড়ে

১। বাংলা ধ্বনির আলোচনায় ধ্বনি ধ্বনিকল্প ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণার ব্যাখ্যা এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা।

২। ধ্বনির আলোচনায় বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক — এই দুটি স্তরের তাত্ত্বিক গুরুত্ব।

৩। ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা ও

৪। ভাষায় ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণের নীতি।

ব্যাবহারিক আলোচনার মধ্যে পড়ে

১। ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণের নীতি প্রয়োগ করে কেমন করে বাংলার বিভিন্ন ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ধারণ করা হয় — উদাহরণ সহযোগে সেই পদ্ধতির ব্যাখ্যা অর্থাৎ নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি।

২। বাংলা ধ্বনিকল্পের ধারণা ও

৩। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিকল্প অপেক্ষা বৃহত্তর একক দল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা।

৫.১৩ অনুশীলনী

১। ক) উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ—

মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা, ধ্বনি, ধ্বনিকল্প, ধ্বনিবিকল্প, প্রতিবেশ, অবস্থান, ন্যূনতম, শব্দজোড়, প্রায় ন্যূনতম শব্দজোড়, প্রলম্বিত শব্দজোড়, ধ্বনিকল্পমূলক, লিপ্যন্তর, ধ্বনিবিকল্পমূলক, লিপ্যন্তর, দল, মুক্তদল, রুদ্ধ দল, অনসেট, কোডা।

খ) নিম্নলিখিত প্রতি জোড়া ধ্বনিকল্পের জন্য বাংলা ভাষায় ন্যূনতম শব্দজোড় তৈরি করুন। উত্তরের নমুনা হিসাবে প্রথমটি করে দেওয়া আছে।

ধ্বনিজোড়	ন্যূনতম শব্দজোড়
[K – p]	[Kaṭh – paṭh]
[n – m]	
[c – jh]	
[S – m]	
[t – th]	
[h – K]	
[S – r]	
[j – t]	
[n – n̲]	
[a – u]	
[e – o]	

গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির দল বিভাজন দেখান (ওপরের নমুনা হিসাবে প্রথমটি করে দেওয়া আছে) ঃ

[akaS]	আকাশ	[a-kaS]
[montri]	মন্ত্রী	
[jama]	জামা	
[r⊃kto]	রক্ত	
[⊃ndho]	অন্ধ	
[mondir]	মন্দির	
[dig⊃nto]	দিগন্ত	
[g⊃tokal]	গতকাল	

২। ক) ধ্বনি বিশ্লেষণের মুখ্য দুটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

খ) ধ্বনির ব্যাবহারিক চরিত্র কাকে বলে ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলুন।

গ) ধ্বনির দ্বৈত চরিত্র বলতে কী বোঝায় ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উদাহরণসহ লিখুন। ধ্বনিবিকল্প কাকে বলে ?

ঙ) ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই শব্দগুচ্ছের অন্যান্য সমার্থক শব্দগুলির উল্লেখ করুন।

চ) উদাহরণসহ শর্তসাপেক্ষতার ব্যাখ্যা করুন।

ছ) অবস্থান কী ও কত প্রকার ? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিন।

জ) দল কী ? বাংলার বিভিন্ন গঠনের একদল শব্দের উদাহরণ দিন।

৩। ক) ধ্বনিকল্প নির্ধারণে ধ্বনিকল্পমূলক লিপ্যন্তর ও ধ্বনিবিকল্পমূলক লিপ্যন্তরের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

খ) বাংলায় [s] অর্থাৎ দন্ত্য [s] ধ্বনিকে আপনি কোন মর্যাদা দিতে চান—ধ্বনিকল্প না ধ্বনিবিকল্প ? যুক্তি সহ উত্তর দিন।

গ) ধ্বনিসূত্রের উল্লেখ করে বাংলার কোন একটি ধ্বনিকল্পের বিভিন্ন ধ্বনিবিকল্পগুলির আলোচনা করুন।

ঘ) উদাহরণ সহ পরিপূরক অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

গ) ধ্বনিকল্প সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণের ব্যাখ্যা দিন।

ঘ) ধ্বনিকল্পের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য কাকে বলে। উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

ঙ) ধ্বনিকল্পের নির্ণয়ের সূত্র ব্যাখ্যা করুন ও উদাহরণ দিন।

৪। ক) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিকল্প ধারণার ব্যাখ্যা দিন।

খ) বাংলা ভাষায় ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প নির্ণয়ের নীতি ও রীতির ওপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

গ) ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক — এই দুটি স্তরের অবতারণার কী প্রয়োজন ?

ঘ) ভাষায় ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিবিকল্প নিরূপণের চারটি নীতি কী কী ? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

ঙ) ভাষায় ধ্বনিবিকল্প নির্ণীত হয় পরিপূরক অবস্থান ও মুক্তবৈচিত্র্যের ভিত্তিতে — উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

চ) ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প—এই তিনটি ধারণাই কি প্রয়োজন ? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

ছ) ভাষায় ধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য ঘটে কেন ?

জ) বাংলা দল সম্বন্ধে উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রবাল দাশগুপ্ত, ১৯৯৩ ভাষা বর্ণনার স্তর (প্রবন্ধ) নিসর্গ ৩য় সংখ্যা, ১-১১৩ পৃঃ

২। মহম্মদ আব্দুল হাই, ১৯৬৫ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাঙলা একাডেমি, ঢাকা।

৩। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা।

৪। সুকুমার সেন, ১৯৬৮, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিক, কোলকাতা।

৫। Bhattacharya, Krishna, 1993, Bengali Oriya Verb Morphology : A contractive study. Dasgupta & Co. Pvt. Ltd, Kolkata.

৬। Gleason, H. A. 1961, An Introduction to Descriptive Linguistics, Oxford & IBP Publishing Co. Delhi, Bombay, Calcutta.

৭। Hockett, C. F. 1976, A Course in Modern Linguistics Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi, Bombay, Calcutta.

একক ৬ ❐ রূপতত্ত্ব

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প

৬.৪ রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

৬.৫ রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ

৬.৬ রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয়ের পদ্ধতি

৬.৭ বাংলা শব্দবিভক্তি

৬.৮ বাংলা ক্রিয়াবিভক্তি

৬.৮.১ সমাপিকা ও অসমাপিকা

৬.৮.২ অকর্মক-সকর্মক-দ্বিকর্মক

৬.৮.৩ সংযোগমূলক ও যৌগিক ক্রিয়া

৬.৮.৪ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

৬.৮.৫ ধাতুরূপবিকল্প

৬.৮.৬ সাধু চলিত

৬.৮.৭ সমাসবদ্ধ শব্দ

৬.৯ সারাংশ

৬.১০ অনুশীলনী

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে জানতে পারবেন—

- ভাষাতত্ত্বে রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প—এই তিনটি ধারণা এবং তাদের সম্পর্ক
- রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
- রূপকল্পের শ্রেণি/রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ণয় পদ্ধতি

- বাংলা রূপতত্ত্বে শব্দরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- বাংলা রূপতত্ত্বে ক্রিয়ারূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৬.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন যে ধ্বনিকল্প হল ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক যার সমন্বয়ে ভাষার বিভিন্ন মাপের অর্থপূর্ণ এককগুলি তৈরি হয়।

আমরা ভাষার সবচেয়ে বড়ো একক হিসেবে বাক্য বা অনুচ্ছেদ ইত্যাদিকে জানলেও, সবচেয়ে ছোটো অর্থপূর্ণ একক কী—এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলেই একবাক্যে বলব শব্দ।

শব্দকে ভাষার সবচেয়ে ছোটো অর্থপূর্ণ একক হিসেবে গণ্য করার পিছনে অন্তত দুটি কারণ আছে।

প্রথমত আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো মাতৃভাষার ব্যবহারকারী হিসেবে সবচেয়ে বেশি সচেতন ভাবনা চিন্তা করি ভাষার শব্দ নিয়ে। কোনো কথা বলার জন্য কোন্ শব্দটির ব্যবহার সবচেয়ে উপযুক্ত, বা এই শব্দটির বদলে ওই শব্দটি ব্যবহার করলে কথার মানে বদলে যাবে, অথবা আরও প্রাঞ্জল হবে বা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে শ্রোতার কাছে বা শ্রোতা খুশি হবে এবং ফলে যে কাজের উদ্দেশ্যে ভাষা ব্যবহার করছি সেই কাজটা আরও ভালোভাবে সম্পন্ন হবে ইত্যাদি হিসেবগুলোই আমাদের ভাষাভাবনার বেশিরভাগ অংশটুকু জুড়ে থাকে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করার সময়ে আমরা কী কী ধ্বনি কেমনভাবে সমন্বিত করে কীভাবে উচ্চারণ করব বা শব্দগুলিকে কীভাবে পরপর বাক্যে সাজাব তা নিয়ে তেমন সচেতনভাবে ভাবনা চিন্তা করি না। অথচ এটা করা দরকার ভাষা ভাবনা মুখ্য উল্লেখযোগ্য কাজ হল পছন্দই শব্দ বাছাই। এটা সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত, একজন সাক্ষর মানুষ হিসেবে আমরা ভাষার শব্দকে একটা সুনির্দিষ্ট আভিধানিক চেহারায় দেখতে পাই। অর্থাৎ ভাষার ছাপানো অভিধানে সেই ভাষার সমস্ত শব্দকে একটা রেডিমেড চেহারায় দেখতে পাই। কিন্তু বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা এরকম কোনো রেডিমেড চেহারার সংকলন পাই না। যা পাই তা হল একগুচ্ছ ব্যবহারিক সূত্র। যে সূত্রগুলি শিখে ভাষায় তার প্রয়োগ করতে হয় এবং এই কাজটা চলে অবচেতনে। কিন্তু অভিধানের শব্দ শেখা স্মৃতির দাবি করে—ফলে শব্দ শেখার প্রক্রিয়া বেশ সচেতন।

এই সব কারণেই সাধারণ অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক বলতে আমরা শব্দকেই বুঝি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান শব্দকে ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককের মর্যাদা দেয় না। শব্দের চেয়েও ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ একক হিসেবে ভাষাবিজ্ঞান চিহ্নিত করে 'রূপ'কে (morph)। 'রূপ' কথাটি ধ্বনি বা শব্দের মতো তেমন স্বচ্ছ নয়। কারণ প্রথাগত ব্যাকরণ ও প্রচলিত অভিধানের সৌজন্যে আমরা ধ্বনি ও শব্দ কথা দুটির অর্থ যেভাবে বুঝি 'রূপ' কথাটি সেভাবে বুঝি না। ভাষা বিচ্যুত 'রূপ' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত সেই অর্থের সঙ্গে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ শব্দদুটিতে ব্যবহৃত রূপের সাযুজ্য আছে।

এবার আমরা 'রূপ' কথাটিকে অন্য নামে আর একটু স্পষ্টভাবে চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা করি।

প্রথাগত ব্যাকরণের সৌজন্যে আমরা জানি যে শব্দের, বিশেষ বিভক্তিযুক্ত শব্দের ব্যাকরণগত নাম পদ।

সুতরাং আকাশটা এই শব্দটা একটি পদ। এই পদটিকে ভাঙা যায় পদের দুটি অণুতে -আকাশ ও টা। আমরা জানি এই দুটি অণুরই নিজস্ব অর্থ আছে—আকাশ মানে কী তা সকলেই জানে এবং টা-এর অর্থ

নির্দিষ্টতা। এবং এই দুটি অণুকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অণুতে ভাঙা যায় না। বাংলায় কাশ বলে অর্থপূর্ণ শব্দ আছে বটে কিন্তু সেই কাশ আর আকাশ-এর কাশ যে এক নয় তা বলাই বাহুল্য।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আকাশটা পদটির দুটি পদাণু আকাশ ও টা। এই পদাণুই হল 'রূপ'। পদ ও পদাণু এই দুটি নাম যতটা স্বচ্ছ সম্পর্কে আবদ্ধ, পদ ও রূপ এই দুই নাম ততটা স্বচ্ছতা দেয় না। 'পদাণু' নামটি প্রবাল দাশগুপ্তের প্রস্তাব। শব্দটিতে স্বচ্ছতা থাকলেও যেহেতু বাংলা ভাষাতত্ত্বে বহুল প্রচলিত নাম হল 'রূপ', তাই এই আলোচনায় 'পদাণু'র বদলে 'রূপ' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্বের ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করে এখানে রূপতত্ত্বে তিনটি অনুরূপ ধারণার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এছাড়াও পদাণু নামটি ব্যবহার করলে তিনটি ধারণার জন্যে আমাদের বলতে হয় - পদাণু - পদাণুকল্প - পদাণুবিকল্প। এক্ষেত্রে নামগুলো একটু বেশি লম্বা লম্বা হয়ে যাচ্ছে যা কোনো টেকনিকাল আলোচনার পক্ষে খুব একটা সুবিধেজনকও নয়। 'পদাণুর' বদলে 'রূপ' ব্যবহার করা পক্ষে এটিও একটি যুক্তি।

বর্তমান এককে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে (১) রূপ (morph) - রূপকল্প (morpheme) - রূপবিকল্প (allmorphn)—এই তিনটি ধারণার। (২) রূপকল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা। (৩) রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয় পদ্ধতি (৪) বিভিন্ন প্রকার রূপকল্প ও রূপবিকল্পের আলোচনা এবং (৫) বাংলা রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

৬.৩ রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প

ধ্বনিস্তরে ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণার মতোই ভাষার 'রূপ'-এর স্তরে রয়েছে রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প—এই তিনটি ধারণা।

উদাহরণ ঃ

১।	ক	খ
	দেশ	দেশের
	পাখি	পাখির
	নদী	নদীর
	ঘর	ঘরের
	আকাশ	আকাশের
	পুজো	পুজোর
	রাত	রাতের
	পাখা	পাখার
	কথা	কথার
	মুখ	মুখের

ওপরের 'ক' ও 'খ' স্তম্ভের শব্দগুলোর মধ্যে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে 'ক' স্তম্ভের শব্দগুলোকে আর কোনো অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতর এককে ভাঙা যায় না। অর্থাৎ দেশ, পাখি, নদী, আকাশ, ঘর, পুজো, রাত, পাখা, কথা, মুখ—এইগুলি প্রত্যেকটি হল ভাষার অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক পদাণু বা রূপ।

তুলনায় 'খ' স্তম্ভের শব্দ বা পদগুলিতে একাধিক ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক রয়েছে। যেমন দেশ +এর = দেশের, পাশি +র =পাখির এই এইভাবেই নদী +র, আকাশ+এর, ঘর+এর, পুজো+র, রাত+এর, পাখা+র, কথা+র ও মুখ+এর। 'খ' স্তম্ভের প্রতিটি শব্দের অর্থ হল তার অনুরূপ 'ক' স্তম্ভের শব্দটির অর্থ সম্বন্ধ পদসূচক অর্থ। অর্থাৎ 'খ' স্তম্ভের প্রতিটি শব্দ/পদ দুটি করে রূপ/পদাণুর সমন্বয়ে তৈরি এবং দুটিরই নির্দিষ্ট চেহারা ও অর্থ আছে। 'খ' স্তম্ভের শব্দুগলির দ্বিতীয় রূপ/পদাণুগুলি নেওয়া যাক। এখানে আমরা এই রূপগুলির দুরকম চেহারা পাচ্ছি—কোথাও এর আবার কোথাও র। যেমন,

২। দেশ, আকাশ, ঘর, রাত, মুখ } + এর পাখি, নদী, পুজো, পাখা, কথা } + র

এর এবং র চেহারায় দুরকম হলেও এদের অর্থ কিন্তু এক। এবং বাংলাভাষী হিসেবে আমরা জানি যে ভাষায় এই দুটি রূপেরই দুটি ভিন্ন চেহারা, দুটি ভিন্ন রূপ নয়। দুরকম চেহারার পিছনে থাকা একটি রূপকে এখানে এর বা /er/বলে উল্লেখ করা যাক। সুতরাং বলা যায় বাংলায় / er/হল একটি রূপকল্প, যার বাস্তবে দুধরনের চেহারা বা রূপবিকল্প দেখা যায়—/ -er / ও / -r/সূত্রটা এইভাবে শুরু করা যায়—

৩। {–r} → / –er /
{–r} → / –r /

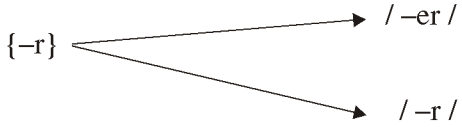

এটি অসমাপ্ত সূত্র। কারণ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা থেকে আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে ভাষায় বিকল্পের উচ্চারণ সবসময়েই শর্তাধীন। কিন্তু এই সূত্রে কোনো শর্তের উল্লেখ এপর্যন্ত নেই। এ প্রসঙ্গো পরে আসছি। আগে এই অসমাপ্ত সূত্রটিরই ব্যাখ্যা করি।

দ্বিতীয় বন্ধনীর { }-র অন্তর্ভুক্ত উপাদান হল রূপকল্প, আর বাঁকা দাগের অন্তর্ভুক্ত উপাদান হল ধ্বনিতাত্ত্বিক বা ধ্বনিকল্পের নিরিখে তারই উচ্চারণযোগ্য চেহারা। অর্থাৎ এখানে পড়তে হবে রূপকল্প {-er} এর উচ্চারণ হয় /-er/এবং /-r/ । -er/বা /-r/এর আগের ছোট্ট হাইফেনটির অর্থ /-er/বা /-r/কোন রূপকল্পের পরে বসে যেমন, দেশ, ঘর, পাখি ইত্যাদি রূপকল্পের পরে বসে /-er/বা /-r/ ।

আশা করি এ পর্যন্ত সূত্রের পাঠটি প্রাঞ্জল হয়েছে। এই পাঠটিই আরো সোজাসাপটা ভাষায় বলা যায়। রূপকল্প {-er} এর দুটি রূপবিকল্প /-er/এবং /-r/ ।

এবার শর্তাধীনতার প্রসঙ্গ। ২-এর দুটি গুচ্ছ (set) বিচার করে বলতে পারি আমরা ভাষায় /-er/ পাই কোনো ব্যঞ্জনান্ত রূপকল্পের পর (যেমন আকাশ, ঘর, দেশ, রাত মুখ) আর /-r/ পাই কোনো স্বরান্ত রূপকল্পের পর (যেমন—পাখি, নদী, পুজো, পাখা, কথা)। এই শর্তের উল্লেখ করলে অসম্পূর্ণ ৩ হয় ৪ ঃ

৪।

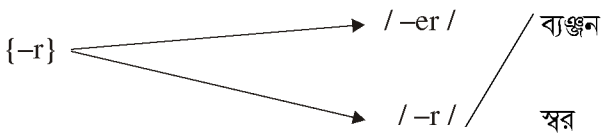

আশা করি ৪ এর পাঠে কোনো অসুবিধা নেই। এবার ফিরে যাই রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প প্রসঙ্গে।

ভাষায় বাস্তব উচ্চারণে ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হিসাবে আমরা যা পাই তাই হল রূপবিকল্প। একাধিক রূপবিকল্পের শর্তাধীন উচ্চারণের পশ্চাৎপটে আমাদের মানসিক স্তরে, যা বিরাজ করে তা হল রূপকল্প।

আর সাধারণভাবে প্রতিটি অনির্ধারিত রূপবিকল্পই হল 'রূপ'।

অর্থাৎ ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্পের মতোই রূপ ও রূপবিকল্প হল বাস্তব স্তরের ধারণা—এর মধ্যে রূপবিকল্প হল কোনো রূপকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপ মাত্র। আর রূপকল্প হল এই বাস্তব ধারণা রূপ ও রূপবিকল্পের তুলনায় বিমূর্ততর মানসিক স্তরের ধারণা।

আমাদের উদাহরণে /-er/ ও /-r/ দুটিই হল রূপ। তবে {-er} এই রূপকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে /-er/ ও /-r/ হল দুটি রূপবিকল্প।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের রূপকে শব্দাঙ্গ বা অঙ্গ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

রূপকল্প বিভিন্ন বইয়ে রূপিম, রূপমূল, মূলরূপ ও অঙ্গকল্প বলে উল্লিখিত।

রূপবিকল্পের বিভিন্ন নাম হল সহরূপ, উপরূপ, সহরূপমূল, পরিপূরক রূপ ও অঙ্গবিকল্প।

রূপতত্ত্ব হল ব্যাকরণের সেই অংশ যেখানে ভাষার রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাদের গঠন প্রক্রিয়া, শ্রেণিকরণ, রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ধারণ, রূপকল্পের সমন্বয়ে ভাষার বৃহত্তর একক শব্দ বা পদ গঠন ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের দুটি প্রধান ভাগ হিসেবে দেখানো হল রূপতত্ত্ব ও অন্বয়তত্ত্বকে। রূপতত্ত্বের বিষয়বস্তু তো উল্লেখ করা হল। অন্বয়তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল কীভাবে পদ ও শব্দকে পর পর অন্বিত করে বাক্যগঠন করা হয় সেই পদ্ধতি। বাক্যই যে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সবচেয়ে বড়ো একক তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণ হল ঃ

৬.৪ রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ভাষাবিজ্ঞানে রূপকল্পের সহজতম সংজ্ঞা হল ঃ ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। তবে বলাই বাহুল্য যে এটি সহজতম হলেও একমাত্র সংজ্ঞা নয়। ধ্বনিকল্পের মতোই রূপকল্পের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে এক একজন ভাষাবিজ্ঞানী এক এক রকম সংজ্ঞা দিয়েছে। যেমন গ্লিসন (১৯৬৬) বলেছেন সাধারণত রূপকল্প হচ্ছে ধ্বনিকল্পের ছোটো পরম্পরা। এইসব পরম্পরা বার বার ফিরে আসে তবে পুনরাবৃত্ত পরম্পরাগুলি সবই কিন্তু রূপকল্প নয় ... ... রূপকল্পকে ভাষা - কাঠামোর ক্ষুদ্রতম অর্থগত একক হিসেবে বর্ণনা করা দরকার ইত্যাদি।

আবার ব্লুমফিল্ড (১৯৬৩) বলেছেন—

রূপকল্প হল এমন একটি ভাষিক রূপ যার সঙ্গে অন্য একটি রূপের ধ্বনিগত অর্থগত কোনো আংশিক সাদৃশ্য নেই।

আর ভাষাবিজ্ঞানী নিডা (১৯৬৫) দিয়েছেন উপরোক্ত সহজ সরল সংজ্ঞাই অর্থাৎ রূপকল্প হল ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক।

আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য হল রূপকল্পের স্বরূপ চেনা। এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখে, বিভিন্ন সংজ্ঞার বহুমতের মধ্যে না জড়িয়ে, রূপকল্পের সংজ্ঞা হিসেবে সহজতমটির গ্রহণ করা হল। পাশাপাশি রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

● রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোটো ছোটো পরম্পরা—

রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোটো ছোটো পরম্পরা এ কথার অর্থ সাধারণত কয়েকটি ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে তৈরি হয় একেকটি রূপকল্প। যেমন বাংলায় /pa/ রূপকল্পে আছে /p+a/ দুটি ধ্বনিকল্প, /pata/তে চারটি /P+a+t+a/; r⊃Kto/তে পাঁচটি /r+⊃+k+t+o/, /din/এ তিনটি /d+i+n/, /prithibi/তে ছয়টি /P+r+i+t+h+i+b+i/ ইত্যাদি। প্রতিটি রূপকল্পের অন্তর্গত তার নিজস্ব ধ্বনিপরম্পরাটি কিন্তু সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ /din/ রূপকল্পে ধ্বনিকল্পের /d+i+n/-এই পরম্পরা সুনির্দিষ্ট। এটা কখনোই /n+i+d/ বা /i+d+n/ বা /i+n+d/ ইত্যাদির কোনোটাই হবে না।

● এই পরম্পরা ভাষায় বার বার ফিরে আসে—

৫। নীচের উদাহরণগুলো দেখা যাক—

/pa/	পা
/r⊃npa/	রণপা
/padani/	পাদানি
/pãcpa/	পাঁচপা (সাপের পাঁচপা)
/dupa/	দুপা (দুপা হাঁটা)

এখানে পা রূপকল্পে ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হল /pa/ এবং এই পরম্পরাটি ভাষার বিভিন্ন শব্দে বারবার ফিরে আসছে। এখানে অন্তত চারটি শব্দে—রণপা, পাদানি, পাঁচপা, দুপা—এই /pa/কে আমরা পাচ্ছি একই অর্থে।

আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক -/-be/ রূপকল্প

৬। /korbe/ করবে /pabe/ পাবে

/khabe/ খাবে /nebe/ নেবে

/porabe/ পড়বে /hasbe/ হাসবে

/Sobe/ শোবে /ghumobe/ ঘুমোবো

/jabe/ যাবে /kamrabe/ কামড়াবে /purbe/ পুড়বে ইত্যাদি

এখানে সর্বত্রই এবং এছাড়াও বাংলার অজস্র শব্দে ভবিষ্যৎ কাল অর্থে ধ্বনিকল্পের এই পরম্পরা বার বার ফিরে আসে, পুনরাবৃত্তি হয়।

● কিন্তু পুনরাবৃত্ত পরম্পরাগুলি সবই রূপকল্প নয়—

আরেক সেট উদাহরণ দেখা যাক

৫। /ɔporupa/ অপরূপা /kãpa/ কাঁপা

/Serpa/ শেরপা /hæpa/ হ্যাপা

/pagol/ পাগোল /KɔpaI/ কপাল

/pata/ পাতা

ওপরের উদাহরণগুলিতেও আমরা /pa/ এই ধ্বনিকল্প পরম্পরাকে পাচ্ছি। চারটি উদাহরণে /pa/ রয়েছে শব্দান্তে ঠিক ৫-এর উদাহরণের মতো। দুটিতে /pa/ শব্দের আদিতে এবং একটিতে শব্দের মাঝখানে। কিন্তু ৫-এর উদাহরণের ধ্বনিকল্প পরম্পরা /pa/ এবং ৭-এর /pa/ চেহারায় এক হলেও ভাষায় তারা কোনোভাবেই অভিন্ন নয়। অর্থাৎ রণপা-র পা এবং অপরূপা, শেরপা, কাঁপা, হ্যাপা ইত্যাদির পা সমার্থক নয়। বাংলাভাষী হিসেবে আমরা সকলেই সুস্পষ্টভাবে এই তথ্য জানি যে ৫-এর উদাহরণে /pa/ একটি রূপকল্প, কিন্তু ৭-এর উদাহরণে /pa/ কোনো স্বতন্ত্র রূপকল্পই নয়।

এই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে-কোনো রূপকল্পের ধ্বনিকল্প পরম্পরা মাত্রই সেই রূপকল্প নয়, তারা একই চেহারার ভিন্ন রূপকল্প হতে পারে বা অন্য রূপকল্পের অংশও হতে পারে।

● রূপকল্প ভাষার অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক

ভাষা শরীর প্রধানত দু-ধরনের ক্ষুদ্রতম মৌলিক উপাদানে গড়ে ওঠে—(১) ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক, অর্থাৎ ধ্বনিকল্প এবং (২) ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক, অর্থাৎ রূপকল্প। উদাহরণ ঃ

৫। /diner Sese ghumer dese ghomta pɔra oi cha ĕ a/ দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া। এই চরণে প্রতিটি শব্দকে রূপকল্পে বিশ্লেষণ করলে পাব

৯।	diner = din + er	দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ
	Sese = Ses + e	দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ
	ghumer = ghum + er	দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ
	deSe = deS + e	দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ
	ghomta	একটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ
	pɔra pɔr + a	দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ
	oi	একটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ
	cha ĕ a	একটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ

এখানে প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককই একেকটি রূপকল্প। তারমধ্যে /-er/ ও /-e/ দুবার এসেছে চরণটিতে।

ক্ষুদ্রতম কথাটির অর্থ সহজবোধ্য—অর্থ অবিকৃত রেখে যাকে আর ছোটো অংশে ভাগ করা যায় না। কিন্তু অর্থপূর্ণ কথাটি প্রায়শই সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ অর্থ নানা ধরনের হয়। অর্থ কখনো খুব স্পষ্ট ও মূর্ত—যেমন, এখানে দিন, ঘুম, দেশ, পর, ওই ছায়া, শেষ ইত্যাদির অর্থ খুব স্পষ্ট এবং তা স্পষ্টভাবেই অভিধানে উল্লিখিত। আবার এর, এ, আ ইত্যাদির তত স্পষ্ট অভিধানিক অর্থ নেই। কিন্তু এরা ব্যাকরণের খাতিরে শব্দের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। এই ব্যাকরণের প্রয়োজনকে যদি বলি ব্যাকরণগত অর্থ তাহলে বলা যায় এই যে, বাক্যগুলির আভিধানিক অর্থের তুলনায় ব্যাকরণগত অর্থটাই বেশি জরুরি। এবং তারই ভিত্তিতে এই এককগুলি এবং এদের সঙ্গে তুলনীয় আরও অজস্র একক ভাষায় অর্থপূর্ণ বলেই বিবেচিত।

অন্যভাবে বলি। অর্থ দু ধরনের অভিধানিক অর্থ এবং ব্যাকরণগত অর্থ। ভাষার কোনো ক্ষুদ্রতম এককের আভিধানিক বা ব্যাকরণগত যে-কোনো এক ধরনের অর্থ থাকলেই সেই এককটি ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক বলে গ্রাহ্য হবে।

● **অর্থ অবিকৃত রেখে এই ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককে আর ভাঙা যায় না।**

উদাহরণ দিই ঃ

১০।	/pa/ পা	/pagol/ পাগোল
	/bhu/ ভূ	/bhugol/ ভূগোল
	/gol/ গোল	

বাংলা পা, ভূ এবং গোল তিনটি স্বতন্ত্র রূপকল্প। এবার দেখা যাক ডানদিকের কলম। প্রথমে পাগল। পাগল এর মধ্যে আমরা /pa/ এবং /gol/ এই ধ্বনিকল্প পরম্পরাকে দেখতে পাই। অর্থাৎ পাগল কে আমরা /pa/ ও

/gol/ দুটি অংশে ভাগ করতে পারি—কিন্তু তাতে পাগল কথাটার অর্থ বজায় থাকবে না, অর্থ বিকৃত হবে। টুকরো অংশগুলোতে আমরা পাগল-এর অর্থ আদৌ খুঁজে পাবো না। পাবো /pa/ আর /gol/ এই দুটি স্বতন্ত্র রূপকল্পকে।

বিপরীত দিক থেকে বলা যায় যদি /pa/ আর /gol/ এর সমন্বয়ে pagol তৈরি হত তাহলে এই দুটি রূপকল্পের অর্থ /pagol/ রূপকল্পে খুঁজে পাওয়া যেত। যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি /bhugol/ এর ক্ষেত্রে। ভূগোল-এর চেহারাতে /bhu/ ও /gol/ এর সমহার এবং অর্থেও এই দুটি রূপকল্পের অর্থের সমন্বয়।

কিন্তু পাগল নিজেই একটি স্বতন্ত্র রূপকল্প।

অতএব সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ৮-এর উদাহরণে মোট চারটি রূপকল্প—পা, ভূ, গোল, পাগল। আর ভূগোল হল ভূ আর গোল মিলিয়ে তৈরি একটি শব্দ, স্বতন্ত্র রূপকল্প নয়।

● **রূপকল্প ধ্বনিকল্পের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায় না**

একটি রূপকল্প সাতটি ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হতে পারে। যেমন, /c⊃ndona/ চন্দনা (পাখি) ; ছটি ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হতে পারে যেমন /poscim/ পশ্চিম ; পাঁচটির হতে পারে, যেমন /uttor/ উত্তর ; চারটির হতে পারে, যেমন /tala/ তালা ; তিনটির, যেমন /car/ চার ; দুটির, যেমন - মা /ma/ ; আবার কেবলমাত্র একটি ধ্বনিকল্প দিয়েও তৈরি হতে পারে, যেমন /o/ ও।

অর্থাৎ কোন রূপকল্পে কটা ধ্বনিকল্প থাকবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে লম্বা লম্বা রূপকল্পের তুলনায় ছোটো ছোটো (তিন/চার ধ্বনিকল্পের পরম্পরা) রূপকল্পের সংখ্যা ভাষায় বেশি।

● **রূপকল্প এবং অক্ষর বা দল সমার্থক নয়**

অক্ষর বা দল হল ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে তৈরি ধ্বনিতত্ত্বের বৃহত্তর একক। ধ্বনিতত্ত্বের একক বলেই অক্ষর বা দল হল অর্থহীন একক। যেমন, কষ্ট /K⊃sṭo/শব্দে দুটি দল /k⊃S/ ও /ṭo/। দুটি যথাক্রমে তিন ও দুই ধ্বনিকল্পের সমন্বয় এবং অর্থহীন।

রূপকল্প হল উচ্চতর অর্থপূর্ণ স্তর রূপতত্ত্বের একক এবং আবশ্যিকভাবে ভাষার অর্থপূর্ণ একক।

কখনো কখনো দেখা যায় শব্দে দল ও রূপকল্পের পরিধি এক। যেমন, /din, rat, mon, ke, n⊃e/ দিন, রাত, মন, কে, নয় ইত্যাদি শব্দে একটি রূপকল্প ও একটি দল আবার /Se-o, Ke-re/ সেও, কেরে-র মতো শব্দে দুটি রূপকল্প ও দুটি দল। শব্দে কখনো কখনো দল ও রূপকল্পের সীমারেখা এক হবার জন্য আমাদের মনে ভুল ধারণা জন্মায় যে দলই বুঝি রূপকল্প।

কিন্তু দল যে রূপকল্প একেবারেই নয় তা বোঝা যায় যে শব্দে দল ও রূপকল্পের সংখ্যা ও সীমারেখা ভিন্ন সেগুলির দিকে তাকালে। যেমন /kha-bo, kha-be, Kha-ben, Kha-bi/ খাবো, খাবে, খাবেন, খাবি শব্দের প্রতিটিতে দুটি করে দল কিন্তু দু এর বেশি রূপকল্প। <u>খাবো</u> তে ধাতু /Kha/, ভবিষ্যৎ কালসূচক /b/ ও উত্তমপুরুষ বাচক /o/-এই তিনটি রূপকল্প ; <u>খাবে</u>-তে উত্তমপুরুষের জায়গায় আছে মধ্যম বা প্রথম পুরুষ সূচক /e/ মোট তিনটি রূপকল্প ; <u>খাবি</u>-তে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক /i/-কে নিয়ে তিনটি রূপকল্প, আবার <u>খাবেন</u> এ ধাতু, ভবিষ্যৎসূচক /-b/, মধ্যমপুরুষের /-e/ এবং সম্মানসূচক /-n/ মোট-চারটি রূপকল্প।

আবার /j⊃n-jal, mon-dir, pri-thi-bi, po-ri-dhi/ জঞ্জাল, মন্দির, পৃথিবী, পরিধি ইত্যাদি শব্দে একটি করে রূপকল্প কিন্তু প্রথম দুটিতে দুটি ও শেষ দুটিতে তিনটি করে দল।

ওপরের দুটি ক্ষেত্রেই রূপকল্প ও দলের সংখ্যা মিলছে না। নীচের উদাহরণগুলিতে মিলছে না সীমারেখা। /di-ne, mo-ne/ দিনে, মনে ইত্যাদি শব্দে দলের সীমারেখা অনুযায়ী শব্দের ভাগ দি-নে বা ম-নে, কিন্তু রূপকল্পের সীমানা অনুযায়ী ভাগ হল /din-e/ ; ও /mon-e/। অর্থাৎ সীমানা মিলল না।

অতএব দল বা অক্ষর এবং রূপকল্প যে ভিন্নার্থক দুটি একক তা বলাই বাহুল্য।

● প্রতিটা রূপকল্প ভাষার অন্যান্য রূপকল্পের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে বিন্যস্ত

প্রতিটি রূপকল্পই সেই ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিন্যাসদ্বয়ের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। সুতরাং প্রতিটি রূপকল্পই অন্যান্য রূপকল্পের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্বন্ধে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক দু ধরনের—আনুভূমিক ও সমান্তরাল।

১১।	/CheleKe/	ছেলেকে
	/Cheleder/	ছেলেদের
	/Chelera/	ছেলেরা
	/Cheler/	ছেলের
	/Chelete/	ছেলেতে

১১-তে /-Ke, -der, -ra, -r, -te/ এই পাঁচটি রূপকল্পের যে-কোনো একটিই /Chele/ রূপকল্পটির পরে বসতে পারে। অর্থাৎ এরা একে অপরের বদলি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই এদের পারস্পরিক সম্পর্কের নাম আনুভূমিক সম্পর্ক।

১২।	/ækṭa/	একটা
	/duṭo/	দুটো
	/tinṭe/	তিনটে

১২-র উদাহরণে দু এর পাশে /-ṭo/ বসবে, /-ṭa/ বা /-ṭe/ নয় ; তিন এর পাশে বসবে /-ṭe/, /-ṭo/ বা /-ṭa/ নয় ; এক এর পাশে বসবে /-ṭa/ অন্যগুলো নয়। এই যে এক, দুই ও তিন এর সঙ্গে যথাক্রমে -টা, -টো ও -টের পাশাপাশি সম্পর্ক এটাই হল সমান্তরাল সম্পর্ক।

● রূপকল্প হল এমন একটি একক যার অংশ বিশেষের সঙ্গে অন্য এককের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে না।

১৩।	/nam/	নাম
	/iṣṭonam	ইষ্টনাম
	/ḍaknam/	ডাকনাম
	/ramnam/	রামনাম

১৩-র উদাহরণে প্রতিটি শব্দেরই নাম অংশটি ধ্বনিগত ও অর্থগতভাবে অভিন্ন। সুতরাং নাম হল একটি রূপকল্প এবং ইষ্টনাম ; ডাকনাম ও রামনাম-এই তিনটি শব্দে দুটি করে রূপকল্প আছে।

রূপকল্পে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই রূপকল্প চেনার উপায়।

৬.৫ রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ

রূপকল্পের প্রধান শ্রেণিবিভাগ দুটি—স্বাধীন রূপকল্প (free morpheme) ও পরাধীন রূপকল্প (bound morpheme)।

যে রূপকল্পগুলি ভাষায় স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তারাই হল স্বাধীন রূপকল্প। যেমন, উদাহরণ ১-এর প্রথম কলমের সদস্যরা অর্থাৎ দেশ, পাখি, নদী, আকাশ, ঘর, পুজো, রাত, পাখা, কথা ও মুখ হল স্বাধীন রূপকল্পের উদাহরণ। উদাহরণ ১৩-তে মোট চারটি স্বাধীন রূপকল্প - নাম, ইষ্ট, ডাক ও রাম।

বাংলা ভাষাবিজ্ঞানে এই স্বাধীন রূপকল্পকে মুক্ত রূপিমও বলা হয়।

এবার আসি পরাধীন রূপকল্প প্রসঙ্গে। পরাধীন রূপকল্প ভাষায় স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, ব্যবহৃত হয় স্বাধীন শব্দের অংশ হিসেবে। যেমন - উদাহরণ ১-এর দ্বিতীয় কলমের শব্দগুলির প্রথম অংশটুকু স্বাধীন রূপকল্প। কিন্তু শেষ অংশটুকু, অর্থাৎ /-re/ ও /-er/ হলো পরাধীন রূপকল্প। কারণ ভাষায়-র বা এর কোনো স্বাধীন ব্যবহার নেই।

পরাধীন রূপকল্প শব্দ তৈরিতে সাহায্য করে। পরাধীন রূপকল্প বাংলায় প্রধানত দু-ধরনের। উপসর্গ ও প্রত্যয়। উপসর্গ শব্দের শুরুতে যোগ হয় আর প্রত্যয় যোগ হয় শেষে। যেমন—

১৩।	/benami/	বেনামী
	/isom⊃ĕ/	অসময়
	/dinante/	দিনান্তে
	/kuk⊃tha/	কুকথা
	/durdin/	দুর্দিন

১৪-তে /be-, -⊃, ku-, dur/ এই চারটি উপসর্গ কারণ এরা শব্দের শুরুতে যোগ হচ্ছে। আর /i-, -ant, -e/ এই তিনটি প্রত্যয় কারণ এরা শব্দের শেষে যোগ হচ্ছে। /dinante/-র ব্যাখ্যাটি হবে /din/ স্বাধীন রূপকল্পের সঙ্গে প্রথমে যোগ হল /-anto/ পরাধীন প্রত্যয় এবং আমরা যুগান্ত, বনান্ত, অতলান্ত ইত্যাদির মতো পেলাম দিনান্ত। তারপর দিনান্ত-র সঙ্গে /-e/ পরাধীন প্রত্যয় যোগ করে পাচ্ছি ঘরে, দেশে, শেষের মতো দিনান্তে। এই প্রত্যয় যোগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই /dinanto/-র অন্ত্য /o/ ধ্বনি বিলুপ্ত হয়।

উপসর্গ ও প্রত্যয় ছাড়াও আরবীর মতো কিছু কিছু ভাষায় মধ্যসর্গ বলেও এক ধরনের পরাধীন রূপকল্প আছে যেখানে মধ্যসর্গটি ধাতু ভেঙে ধাতুর অভ্যন্তরে যোগ হয়। বাংলায় মধ্যসর্গয় নেই।

পরাধীন রূপকল্প বা বন্ধ রূপিম আশ্রিত নামেও পরিচিত।

রূপকল্পের এই ভাগগুলি নীচের মতো করে দেখানো যায়—

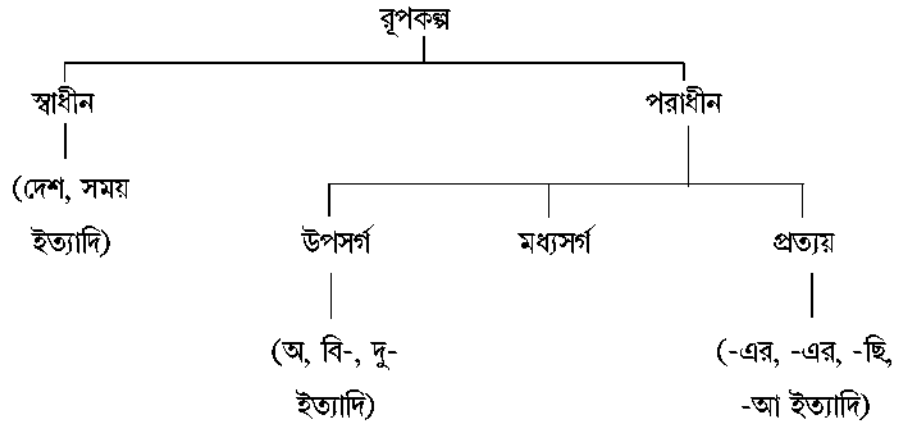

● বাংলা শব্দে স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্প

বাংলা শব্দে স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্পের বিন্যাস কেমন হতে পারে তারই কিছু উদাহরণ দেব এখানে।

১৫। /deS/ দেশ

/k⊃tha/ কথা

/Kobi/ কবি

/r⊃ŋ/ রং

/durdin/ দুদিন ইত্যাদি

১৬। একটি স্বাধীন ও একটি পরাধীন রূপকল্প

/aro/ আরও

/r⊃ŋer/ রং-এর

/bahari বাহারি

/S⊃kol-e সকলে

/dudhṭuku/ দুধটুকু

/⊃-dur/ অদূর

/bi-des/ বিদেশ ইত্যাদি

১৭। একটি স্বাধীন ও একাধিক পরাধীন রূপকল্প

/kha-ech-il-am/	খাচ্ছিলাম
/ja-cch-en/	যাচ্ছেন
/bi-des-e/	বিদেশে
/sp⊃sto-to-i/	স্পষ্টতই ইত্যাদি।

১৮। একাধিক স্বাধীন রূপকল্প

/kalo-jire/	কালজিরে
/din-rat/	দিনরাত
/b⊃rsa-ritu/	বর্ষাঋতু
/joăr-bhaṭa/	জোয়ারভাটা ইত্যাদি

১৯। একাধিক স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্প

/bondhu-tto-purno/	বন্ধুত্বপূর্ণ (বন্ধুত্ব, পূর্ণ = স্বাধীন ; ত্ব = পরাধীন)
/⊃-kal-p⊃ kko-ta/	অকালপক্কতা (কাল, পক্ক = স্বাধীন ; অ-, -তা = পরাধীন)
/S⊃rbo-S⊃mmot-i-Krom-e/	সর্বসম্মতিক্রমে (সর্ব, সম্মত, ক্রম = স্বাধীন ; ই-, -e=পরাধীন ইত্যাদি।

২০। একাধিক পরাধীন রূপকল্প

/upo-rodh/	উপরোধ
/onu-rodh/	অনুরোধ
/proti-rodh/	প্রতিরোধ
/bi-rodh/	বিরোধ

২০-র প্রতিটি শব্দই দুটি করে রূপকল্পের সমন্বয়ে তৈরি। কিন্তু দুটির কোনোটিই বাংলায় স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

একটি স্বাধীন রূপকল্প নিয়ে তৈরি শব্দ হল মৌলিক বা সরল শব্দ। যেমন, উদাহরণ ১৫।

একটি স্বাধীন ও যে-কোনো সংখ্যক পরাধীন অথবা একাধিক পরাধীন রূপকল্প নিয়ে তৈরি শব্দ হল জটিল শব্দ। যেমন উদাহরণ ১৬, ১৭ ও ২০।

একাধিক স্বাধীন ও যে-কোনো সংখ্যক পরাধীন রূপকল্প নিয়ে তৈরি শব্দ হলো সমাসবদ্ধ শব্দ। যেমন, উদাহরণ ১৮ ও ১৯।

৬.৬ রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয়ের পদ্ধতি

ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্পের মতো রূপকল্প রূপবিকল্প নির্ণয়েরও পদ্ধতি আছে।

রূপকল্প নির্ণয়ের জন্য প্রধানত রূপকল্পের চতুষ্কোণ ধারণার ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রবাল দাশগুপ্তের অনুসরণে চতুষ্কোণের ব্যাখ্যাদি।

২১। /deSer loker/

/deSke lokke/

এই চারটি শব্দের চতুষ্কোণের এই চার সদস্যকে অর্থ ও উচ্চরণের যৌথ বিচার অনুযায়ী তুলনা করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এখানে মোট চারটি রূপকল্প আছে /deS, lok, -er, -ke/-অর্থাৎ শব্দ চারটির গঠন হলো /deS-er, deS-ke, lok-er, lok-er/। রূপকল্পের সীমা নির্দেশ করছে শব্দস্থ হাইফেনগুলো। অর্থ ও উচ্চারণের মধ্যে তুলনার মাধ্যমেই আমরা বিচার করি শব্দের কতটুকু উচ্চারণ বা কতটুকু ধ্বনিকল্প পরস্পরার সঙ্গে কতটুকু অর্থকে মেলানো যাচ্ছে। যেমন, /deS/ এই উচ্চারণ = দেশ এই অর্থ ; /-Ke/=কে, /lok/= লোক, /-er/-এর ইত্যাদি। এখানে IPA দিয়ে উচ্চারণ ও বানান দিয়ে অর্থ বুঝিয়েছি। ২১ একটি সমচতুষ্কোণের উদাহরণ।

এবার চতুষ্কোণটিকে পাশাপাশি বাড়ানো যাক।

২২।	/deSer	loker	moner	bagher	rater/
	/deSke	lokke	monke	baghke	ratke/

২২-এর সদস্যদের তুলনা করলে বেরিয়ে আসে আরও তিনটি রূপকল্প - /mon, bagh, rat/।

চতুষ্কোণ অন্যদিকেও বাড়ানো যায়।

২৩।	/deSer	loker	moner	bagher	rater/
	/deSke	lokke	monke	baghke	ratke/
	/deSe	loke	mone	baghe	rate/
	/deSṭa	lokṭa	monṭa	baghṭa	raṭṭa/
	/deS	lok	mon	bagh	rat/

২৩ থেকে বেরিয়ে আসে আরো দুটি রূপকল্প /-e, -ṭa/ এবং /des, lok, mon, bagh, rat/ এর স্বাধীন সত্তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আশাকরি রূপকল্পে চতুষ্কোণ জিনিসটা কী তা স্পষ্ট হয়েছে। কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয় এই চতুষ্কোণ হল বেশ কয়েকটি শব্দজোড় নিয়ে তৈরি একটি শব্দ চতুষ্কোণ যার প্রতিটি শব্দজোড়ের দুজন সদস্যের পরস্পরের মধ্যে উচ্চারণগত ও অর্থগত দিক দিয়ে কিছুটা মিল ও কিছুটা অমিল থাকবে। যেমন এখানে /deSer-deSKe/ এই শব্দজোড়ে /deS/ অংশটুকুতে (উচ্চারণ ও অর্থের যৌথ বিচারেই) দুজন সদস্যের মধ্যে মিল, কিন্তু /-er/ ও /-ke/ অংশটুকুতে অমিল।

২১, ২২ ও ২৩ বেশ সরল চতুষ্কোণ। কারণ এখানে প্রাপ্ত সবকটি রূপকল্পেই প্রতিটা প্রতিবেশে একই রকম চেহারা বা উচ্চারণ তাদের কোনো বিকল্প চেহারা এখনো অবধি পাইনি। কিন্তু ভাষায় রূপবিকল্প অত্যন্ত সুলভ। এই রূপবিকল্পগুলি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করলেই আলোচনা জটিল হতে শুরু করে। ২৪-শে জটিলতার সূত্রপাত করছি।

২৪।	/deser	pakhir	moner	nodir/
	/deske	pakhiKe	monke	nidike/

২৪ থেকে আমরা মোট সাতটি রূপ পাচ্ছি /des, pakhi, mon, nodi, -er, -r, -ke/। যেহেতু এবার আমরা রূপের কল্প-বিকল্প নির্ধারণ করতে চলেছি তাই রূপকল্প না বলে সাধারণ নাম রূপ-ই ব্যবহার করছি।

এখানে আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করছে /-er, -r/। অর্থগত বিচারে এরা এক হলেও উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে দেখতে হবে আলোচ্য রূপদুটি বৈপরীত্যের সম্পর্কে রয়েছে না শর্তাধীন সম্পর্কে আছে।

/-er/ ও /-r/ এর ক্ষেত্রে এই দুটি রূপ শর্তাধীন সম্পর্কে রয়েছে -/-r/ বসে স্বরান্ত রূপের পর কিন্তু /-er/ বসে ব্যঞ্জনান্ত রূপের পর অর্থাৎ এই শর্তাধীনতার ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে তা সংক্ষেপে হল /-er/ও /-r/ রূপ দুটি

ক. উচ্চারণে ভিন্ন

খ. অর্থে অভিন্ন

গ. উভয়ে শর্তাধীন প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ. এই শর্তাধীনতার ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব

এক্ষেত্রে /-er/ এবং /-r/ একটি রূপকল্পেরই দুটি রূপবিকল্প বলে বিবেচিত হবে। দুটি স্বতন্ত্র রূপকল্প হিসেবে নয়। উদাহরণ ৪-এ বিকল্পের সূত্রটি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার /des, pakhi, mon, nodi/ এই চারটি রূপ পরস্পরের সঙ্গে বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এরা একজনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অন্যজন বসতে পারে—যেমন /-Ke/ এই রূপটির আগে /deS, pakhi, mon, nodi/ এদের যে-কোনো একটি রূপই বসতে পারে। এরা পরস্পরের সঙ্গে কোনো শর্তাধীন সম্পর্কে ভাষা নেই।

এমনকি /-er/ ও /-r/ এর সঙ্গে এই রূপটির বৈপরীত্যের সম্পর্কে রয়েছে। অর্থাৎ /-or/, /-r/ যেখানে বসতে পারে সেখানেই /-Ke/ বসতে পারে কোনো শর্তাধীনতা নেই। উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিপরীত সম্পর্কের দুটি উদাহরণে যা ঘটছে তা সংক্ষেপে হল /deS, pakhi, mon, nodi/- রূপ চারটি বা /-er/ ও /-r/ রূপ দুটি

ক. উচ্চরাণে ভিন্ন

খ. অর্থে ভিন্ন

গ. প্রত্যেকেই একই প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ. পরস্পরে মধ্যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক বর্তমান

এক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র রূপকল্প হিসেবে গণ্য হবে, বিকল্প নয়। কারণ রূপ বিকল্পতার প্রধান দুটি শর্ত হল অর্থের অভিন্নতা এবং উচ্চারণের শর্তাধীনতা।

এখানে উল্লেখ করা নেওয়া ভালো যে রূপকল্প বোঝাতে { } এই বন্ধনীর ব্যবহার হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত ছটি রূপকল্পকে আমরা লিখবো {deS], {pakhi}, {mon}, {nodi}, {-Ke} ও {-er}। আর রূপবিকল্প লেখা হবে বাঁকা দাগের মধ্যে যেমন /-er/ ও /-r/।

রূপবিকল্পের শর্তাধীনতার সবচেয়ে সরল চেহারা হল ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা। শর্তাধীনতার আরও জটিল চেহারাও আছে। আপাতত একটি উদাহরণ দিয়ে পরে শর্তাধীনতার বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

২৫।	/ækṭa	duṭo	tinṭe	carṭe/
	/ekṭi	duṭi	tinṭi	carṭi/

২৫-এ প্রতিটি শব্দ দুটি করে রূপের সমন্বয়ে তৈরি। এর মধ্যে /æk, du, tin, car/ স্বতন্ত্র রূপকল্প /ek/। /æk/ এর আরেকটি রূপবিকল্প হল /ek/। /-ṭa, -ṭo, -ṭe/র সঙ্গে /-ṭi/ বৈপরীত্যের সম্পর্কে রয়েছে। সুতরাং আরেকটি রূপকল্প হল {-ṭi}।

/-ṭa, -ṭo, -ṭe/র উচ্চারণ শর্তাধীন -/-ṭo/ বসে /du/ এর পর, /-ṭe/ বসে /tin, car/ এরপর, আর /ṭa/ বসে অন্য সব সংখ্যার পর। বলাবাহুল্য এরা একে অপরের জায়গায় বসে না। এই শর্তাধীনতার কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নেই। এই শর্তাধীনতাকে একমাত্র এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি নির্দিষ্ট সংখ্যার রূপের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব—যেমনভাবে ওপরে বলা হয়েছে। এই শর্তাধীনতাকে বলা যায় রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা। এক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা সংক্ষেপে /-ṭa, -ṭo, -ṭe/—

ক) উচ্চরণে ভিন্ন

খ) অর্থে অভিন্ন

গ) শর্তাধীন প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ) এই শর্তধীনতার রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

এক্ষেত্রেও /-ṭa, -ṭo, -ṭe/ একটি রূপকল্পের তিনটি পৃথক রূপবিকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে রূপবিকল্প হিসেবে গণ্য হবার জন্য যে-কোনো ধরনের শর্তাধীনতাই যথেষ্ট।

বৈপরীত্য ও শর্তাধীন সম্পর্কের পরে আসা যাক মুক্ত বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে।

২৬।	/Khelam	Korlam/
	/Khelum	Korlum/

২৬-এ রূপ চারটি—/Khe, Kor, -lan, -lun/। এর মধ্যে আমাদের আলোচ্য /-lam/ ও /-lum/। এই দুটি রূপের চেহারা ভিন্ন। কিন্তু অর্থ অভিন্ন। দুটির মধ্যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক বর্তমান, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হতে পারে। বৈররীত্যের সম্পর্ক অনুযায়ী এরা দুটি পৃথক রূপকল্প হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু অর্থের বিচারে এরা দুটি রূপবিকল্প। এক্ষেত্রে অর্থের বিচারই গুরুত্ব পাবে কারণ বাংলাভাষী হিসেবে আমরা জানি

যে /-lam/ ও /-lum/ একই প্রত্যয়ের দুটি বিকল্প রূপ মাত্র। যে-কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে যে-কোনো একটি ব্যবহার করলেই চলে তাতে অর্থের কোনো তারতম্য হয় না। অর্থাৎ বাংলাভাষীর ভাষানুভূতি অর্থের বিচারকেই সমর্থন করে।

এই ধরনের বৈপরীত্যের সম্পর্ক বা শর্তহীন উচ্চারণ যেখানে অর্থ সবসময়েই অভিন্ন তা মুক্ত বৈচিত্র্য বলে পরিচিত ধ্বনিতত্ত্বেও আমরা এধরনের মুক্ত বৈচিত্র্যের উদাহরণ দেখেছি।

তাহলে /-lam/ ও /lum/ এর ক্ষেত্রে ঘটনাটা যা দাঁড়াল তা সংক্ষেপে হল ঃ রূপ দুটি

ক) উচ্চারণে ভিন্ন

খ) অর্থে অভিন্ন

গ) একই প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ) আপাত বিচারে বৈপরীত্যের সম্পর্ক দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্পর্ক রয়েছে।

এক্ষেত্রে /-lam/ ও /-lum/ একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

খুব সংক্ষেপে ভাষার রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ধারণের সূত্রগুলি নিম্নরূপ ঃ

২৬। বৈপরীত্যের সম্পর্ক এবং অর্থের ভিন্নতা = রূপকল্প

শর্তাধীন উচ্চারণ এবং অভিন্নতা = রূপবিকল্প

বৈপরীত্যের সম্পর্ক এবং অর্থের তা ভিন্নতা = মুক্ত বিচিত্র্য

● শর্তাধীনতা

ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে মুক্তবৈচিত্র্য ছাড়া সবক্ষেত্রেই রূপবিকল্পের উচ্চারণ শর্তাধীন। এই শর্তাধীনতা দু ধরনের—

১) ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা যেক্ষেত্রে শর্তটি ধ্বনিতত্ত্বের উপকরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থের ধ্বনির বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি প্রতিবেশ বা শব্দে ধ্বনির বিভিন্ন অবস্থানে উচ্চারণ ইত্যাদির সাহায্যে শর্তটি ব্যাখ্যাযোগ্য। যেমন—উদাহরণ ২ ও ২৪। ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা ধ্বনি-প্রভাবিত বিকল্পতা নামেও পরিচিত।

২) রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা যেক্ষেত্রে শর্তটি কোনো রূপ বা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, অর্থাৎ শর্তটি ব্যাকরণের কোনো উপকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা যোগ্য। যেমন উদাহরণ ২৫। এই রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতাকে ব্যাকরণ প্রভাবিত বিকল্পতাও বলা হয়।

আমরা দেখেছি যে রূপবিকল্পতার ক্ষেত্রে শর্তাধীন উচ্চারণ ও অর্থের অভিন্নতা—এই দুটি হল আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু ধ্বনিসাদৃশ্য কোনো আবশ্যিক শর্ত নয়। রূপবিকল্পের মধ্যে ধ্বনিসাদৃশ্য থাকতেও পারে, নাও পারে। বিশেষত রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতার ক্ষেত্রে ধ্বনিসাদৃশ্য ব্যাপারটা পুরোপুরিই অনুপস্থিত থাকতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চেহারা দেখে দুটি রূপকে একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প বলে একেবারেই চেনা যায় না।

রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতার ক্ষেত্রে ধ্বনিসাদৃশ্য কতটা অপ্রয়োজনীয় এবং তার ফলে কতরকমের বিকল্পতা দেখা যায় আমরা এখন তারই আলোচনা করব।

২৭। /Korchi Korchilam Korbo
Khaechi Khaechilam Khabo
achi chilam thakbo/

এই চতুষ্কোণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে /ach/ ধাতুর রূপ অতীত কালে /-chi/ এবং ভবিষ্যৎকালে /thak/। ধাতুর এই তিনটি রূপবিকল্প, অর্থাৎ /ach, chi, thak/ রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীন। এদের মধ্যে /ach/ ও /chi/ র মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই দুটির সঙ্গে /thak/-এর কোনোই মিল নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের কোনো গুরুত্ব নেই। ধ্বনিতাত্ত্বিক সাদৃশ্যহীন এই ধরনের রূপকে ইংরেজিতে বলে সাপ্লেটিভ রূপ। বাংলার আরেকটি সাপ্লেটিভ (suppletive) রূপ হল /ge বা gæ/ যা /ja/ ধাতুর রূপবিকল্প। যেমন—যাচ্ছি, যাবে কি, গেছিল, গেল ইত্যাদি।

অনেক সময় দেখা যায় ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো রূপকল্পের ধ্বনিতাত্ত্বিক কোনো চেহারাই নেই অর্থাৎ রূপকল্পটি চেহারায় অনুপস্থিত বা শূন্য কিন্তু অর্থে উপস্থিত। এইরকম রূপকে শূন্যরূপ বলে। যেমন—

২৮। /Chagole ki na kha ē / ছাগলে কি না খায়
/Chagol ki na Kha ē / ছাগল কি না খায়

প্রথম বাক্যে কর্তৃকারক অর্থে এই পরাধীন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে আমরা পাচ্ছি /Chagol-e/। দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশিত কিন্তু তার জন্য কোনো প্রত্যয় অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে আমরা বলছি /Chagol + ø / (ø = শূন্য)। অর্থাৎ কর্তৃকারকের শূন্য রূপের ব্যবহার হয়েছে।

আরেক ধরনের রূপও দেখা যায় ভাষায় যার নাম ইংরেজিতে ইউনিক (unikque) রূপ। একটি শব্দ বা পদ বিশ্লেষণ করে তার থেকে চেনা রূপগুলো সরিয়ে নেবার পর দেখা গেল যে, যে অংশটি পড়ে আছে তা ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক বটে কিন্তু একমাত্র ওই শব্দটি ছাড়া ওই রূপটি ভাষায় আর কোথাও ব্যবহার হয় না। এর ভিত্তিতে ওই রূপগুলোকে হয়ত একমাত্র রূপ নাম দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণ—

২৯। /ṭerpawa/ টের পাওয়া
/m⊃gḍal/ মগডাল

এই টের এবং মগ বাংলায় যথাক্রমে পা ধাতু ও ডাল শব্দ ছাড়া আর কোনো রূপের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না, এক্ষেত্রে যেহেতু পা ও ডাল দুটি স্বতন্ত্র রূপকল্প তাই এদের সঙ্গী টের ও মগকেও আলাদা রূপকল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়। এদের বলা হয় ইউনিক বা একমাত্র রূপকল্প। ইউনিক রূপ ও রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীন।

চেহারায় বৈসাদৃশ্যের বিপ্রতীপে চেহারায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত স্বতন্ত্র রূপকল্প। যেমন -/beS/। বাংলায় দুটি রূপকল্প আছে /beS/ এই ধ্বনিতাত্ত্বিক চেহারার। একটির পূর্ণ অর্থ সাজ, অন্যটির অর্থ ভালো/ঠিক আছে। পূর্ণ ধ্বনিসাদৃশ্য থাকলেও দুটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ধরনের রূপকল্পকে সমধ্বনি রূপকল্প বলে। বলা বাহুল্য সমধ্বনি রূপকল্পের ক্ষেত্রে কোনোরকম শর্তাধীনতারই কোনো ভূমিকা নেই।

● বাংলা রূপতত্ত্ব

প্রচলিত বা প্রথাগত বা আমাদের চেনা বাংলা ব্যাকরণে বাংলা রূপতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়, কিন্তু সেখানে রূপতত্ত্ব নামটি ব্যবহার করা হয় না। রূপতত্ত্ব হল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা। প্রচলিত ব্যাকরণের পরিভাষার পদ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, শব্দবিভক্তি, ধাতুবিভক্তি, কারক, অনুসর্গ, ধাতু, ক্রিয়ার কাল ও ভাব, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ইত্যাদি বলতে যা বুঝি মোটামুটি তাই আসে রূপতত্ত্বের আলোচনায়। শুধু আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গির কিছু তফাত হয়।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে, যাকে আমরা পদ বলে চিনি, বিশ্লেষণ করে বাংলার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্থ একক এবং তার জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি উচ্চারণের এককের সমীকরণটা বোঝা ও বোঝানো। এই বোঝানোর মধ্যে পড়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি রূপকে তুলনা করে তাদের মধ্যে থেকে রূপকল্প ও রূপবিকল্পগুলোকে চিনে নেওয়া এবং শব্দগঠনে তাদের ব্যবহারসূত্র প্রণয়ন করা। যেমন বাংলা ক্রিয়ারূপ/Korlam/করলাম-কে বিশ্লেষণ করলে পাবো তিনটি রূপ ঃ

/Kor-/-কর্ ধাতু যা শব্দের মূল অর্থটা প্রকাশ করছে

/-l-/-ল্ প্রত্যয় নিত্য অতীতের অর্থ প্রকাশক

/-am/-আম প্রত্যয় উত্তম পুরুষের অর্থ প্রকাশক

আরও অন্যান্য তুলনীয় রূপের সঙ্গে তুলনা করে, বর্ণনামূলক রূপতত্ত্বের রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী এখানে আমরা নীচের মতো আরও কিছু পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করতে পারি।

ক) /Kor/ ও /K⊃r/ দুটি রূপবিকল্প, এরা ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীন (এখানে শর্তাধীনতার বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছিনা, কারণ এই শর্তাধীনতা অত্যন্ত জটিল)

খ) /-am/ ও /-um/ দুটি রূপবিকল্প, এদের মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্পর্ক।

গ) বাংলা ক্রিয়া শব্দ শুরু হয় ধাতু দিয়ে, শেষ হয় পুরুষবাচক প্রত্যয় দিয়ে এবং মাঝে মাঝে কাল, ভাব ইত্যাদি বাচক প্রত্যয় নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী বসে।

এছাড়াও প্রয়োজনীয় সূত্র প্রণয়ন করে প্রতিটি রূপকল্পের ব্যবহারিক নিয়মকানুন নির্দেশ করা সম্ভব।

এখানে আমরা বাংলার প্রতিটি ব্যাকরণগত শ্রেণি ও তার রূপবৈচিত্র্যের বিস্তৃত আলোচনা ও তালিকা তৈরি করব না, কারণ প্রচলিত ব্যাকরণে এই আলোচনা ও তালিকা ইতিমধ্যেই দেখেছি ও জেনেছি আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই।

এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে বাংলার বিভিন্ন রূপকল্পের এবং তাদের সমন্বয়ে তৈরি প্রধান পদসমূহের পরিচয় দেব।

● বাংলা শব্দ ও পদ

৫.১ এ আমরা পেয়েছি সরল, জটিল ও সমাসবদ্ধ বাংলা শব্দের গঠন পদ্ধতি। রূপতত্ত্বের বিচারে বাংলা জটিল শব্দের গঠন বিশ্লেষণই সবচেয়ে আকর্ষণীয় কারণ বাংলা জটিল শব্দকে কেন্দ্র করেই রূপতত্ত্বের নিয়মকানুন আবর্তিত হয়, সে তুলনায় বাংলা সরল ও সমাসবদ্ধ শব্দের গঠন যথেষ্ট সহজ সরল—ফলে তেমন আকর্ষণীয় নয়। বাংলা রূপতত্ত্বের সিংহভাগ দখল করে জটিল শব্দ বিশ্লেষণ, তাই আমরাও জটিল শব্দেই মনোনিবেশ করছি।

ভাষায় শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য করে বলা হয় পদ হলো শব্দের বিভক্তি যুক্ত চেহারা। প্রবাল দাশগুপ্তের কথায়—শব্দকে শব্দ হিসেবে শব্দকোষের ভিতর দেখা যায়। আর শব্দ কোষ থেকে বেরিয়ে শব্দ যদি বাক্যে কাজ করতে আসতে চায় তাহলে সে উপযুক্ত বাইরের পোশাক পরে আসে। এই পোশাকের নাম বিভক্তি। বিভক্তি পরা শব্দকে বলে পদ।

বলাবাহুল্য, বিভক্তি-পরা শব্দ জটিল শব্দও বটে। তাই ব্যাকরণের আলোচনায় প্রায়শই শব্দ ও পদ নাম দুটি সমার্থে ব্যবহৃত হয় এবং এখানেও তাই হচ্ছে।

আমরা জানি যে সাধারণত জটিল শব্দের মূল অর্থ প্রকাশক প্রধান অংশটি হল ধাতু। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হয়। প্রত্যয় পরাধীন রূপকল্প। ধাতুও পরাধীন রূপকল্প, কারণ শুদ্ধ ধাতুর স্বাধীন ব্যবহার বাক্যে নেই। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হলেও কিছু কিছু ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগের আগে আরেকটি রূপকল্প যোগ করে তারপর শেষে প্রত্যয়টি যোগ করতে হয়। এই ধাতু মধ্যবর্তী রূপকল্পটি মিলে তৈরি হয় প্রাতিপাদিক। মধ্যবর্তী রূপকল্পটিকে বলা হয় বিকরণ। অর্থাৎ ধাতু + বিকরণ = প্রতিপাদিক এবং প্রাতিপাদিক + প্রত্যয় শব্দ। যেমন হরণ শব্দটিতে হৃ ধাতু থেকে প্রাতিপাদিক তৈরি হয়েছে হর তার সঙ্গে অনট প্রত্যয় যোগ হয়ে শব্দ হয়েছে হরণ। এখানে সবই পরাধীন রূপকল্প।

শব্দে সর্বশেষ যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দকে পদে পরিণত করে তাকে বিভক্তি বলে। অর্থাৎ সকল বিভক্তিই প্রত্যয়। এখানে বিভক্তি অর্থে বিভক্তি ও প্রত্যয় দুটি নামই ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার আসি পদের কথায়। বাংলা পদ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত—(১) নাম বা বিশেষ্য (২) সর্বনাম (৩) বিশেষণ (৪) ক্রিয়া ও (৫) অব্যয়। এর মধ্যে বিভক্তি যোগে বিশেষ্য, সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদেরই কেবল রূপবৈচিত্র্য ঘটে। সাধারণত বিভক্তি এবং ক্রিয়া ধাতু পরাধীন রূপকল্প ; বিশেষ্য ও সর্বনাম শ্রেণির শব্দ হল স্বাধীন রূপকল্প। বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে যে বিভক্তি যোগ হয় তাকে বলে শব্দ বিভক্তি। আর ক্রিয়া বা ধাতুর সঙ্গে যে বিভক্তি যোগ হয় তাকে বলে ক্রিয়া বিভক্তি বা ধাতু বিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তি দু রকম— (১) শব্দ বিভক্তি ও (২) ধাতু বা ক্রিয়া বিভক্তি।

আমরা প্রথমে শব্দ বিভক্তি ও পরে ক্রিয়া বিভক্তির আলোচনা করব।

৬.৭ বাংলা শব্দবিভক্তি

বাংলা বিশেষ্য ও সর্বনামের রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে কারক ; শ্রেণিবাচক প্রত্যয়, বচন ও লিঙ্গ—এই চার ধরনের ব্যাকরণিক সংবর্গ বা ব্যাকরণিক কোটি।

(ক) কারক — বাক্যে ক্রিয়া পদের সঙ্গে অন্য সকল পদের সম্পর্ককে বলা হয় কারক। প্রচলিত ব্যাকরণ আটটি কারক নির্দেশ করে — কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্ত বা সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, সম্বন্ধ পদ ও অধিকরণ কারক। কারকের এই ভাগ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী।

এই সাতটির মধ্যে বাংলায় নিমিত্তবোধক কিছু অনুসর্গ ছাড়া সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব নেই। আর সম্বন্ধকে পদ বলার কারণ সম্বন্ধ বাক্যে নাম শব্দের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে— যেমন ভারতের স্বাধীনতা এখানে ভারত ও স্বাধীনতা। এই দুটি নামপদের সম্পর্ক নির্দেশ করছে সম্বন্ধ পদের বিভক্তি — এর। তাই সম্বন্ধ কারকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি পদ বলেই অভিহিত।

এই সাতটি কারক অনুসারে প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা শব্দবিভক্তিকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন কর্তৃকারক বা প্রথম শ্রেণি বিভক্তি রূপকল্প /-e, -te, -ra/ এবং শূন্য (পাগলে কিনা বলে)। সম্বন্ধ পদ বা ষষ্ঠ শ্রেণির বিভক্তি রূপকল্প /-r, -er, -kar, -der/ ইত্যাদি।

সাতটি শ্রেণির মধ্যে সম্বন্ধ অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণি ছাড়া প্রতিটি কারকের বিভক্তির শূন্য বিকল্প পাওয়া যায়—যেমন শিকারী বাঘ মেরেছে। এখানে কর্তা ও কর্মে শূন্য বিভক্তি।

সম্বন্ধ, কর্তৃ ও কর্মকারক ছাড়া অন্যান্য কারক সম্পর্ক অনুসর্গ পদের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। বিশেষত অপাদান কারক তো অনুসর্গ ছাড়া প্রকাশই করা যায়না। যেমন— (অপাদান) গাছ থেকে ফল পাড়ো, (করণ) হাত দিয়ে ভাত মাখো, (নিমিত্তার্থক) কার জন্যে অপেক্ষা করছ ? (অধিকরণ) মাঠের মাঝে গরু চরছে ইত্যাদি।

কোনো কোনো অনুসর্গ পদের পূর্ববর্তী পদে বিভক্তি আবশ্যিক। যেমন রামকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ো, শ্যামের দ্বারা এ কাজ হবে না, সীতার কাছে ওষুধ আছে ইত্যাদি।

শব্দের এই কারক বিভক্তি যুক্ত রূপবৈচিত্র্যকে বলা হয় শব্দরূপ। এই বিভক্তির বিচারে বলা যায় বাংলায় কারক মোট চারটি—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ-অধিকরণ কারক ও সম্বন্ধ পদ।

এবার সর্বনামের বিভক্তির উদাহরণ ঃ

৩০।	/ami	amake	amar	amate
	tumi	tomake	tomar	tomate
	bon	bonke	boner	bone
	deS	deSke	deSer	deSe/

প্রথম দুটি সর্বনাম পদ আমি ও তুমি কে পরের দুটি বিশেষ্য কোনও দেশ এর সঙ্গে তুলনা করে, পূর্বোল্লিখিত চতুষ্কোণের নীতিতে, বিভক্তিগুলি চিনে নিতে হয়। মূল সর্বনাম রূপকল্পটির শর্তাধীন রূপবিকল্পতাও এখানে লক্ষণীয় - যেমন /ami ও ama-/, /tumi ও toma/।

খ) শ্রেণিবাচক প্রত্যয়— বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণিবাচক প্রত্যয়। শ্রেণিবাচক প্রত্যয়গুলি হল— -টা, -টি, -খানা, -গাছা, -টুকু, -জন, -ছড়া ইত্যাদি। এই প্রত্যয়গুলো বিশেষ্য, সংখ্যাবাচক ও প্রশ্নবাচক শব্দের সঙ্গে বসে। যেমন ছেলেটা, পাঁচটা ছেলে, ছেলে পাঁচটা, বইখানা, তিনখানা বই, খানতিনেক বই, দুধটুকু, লাঠিগাছা, চারজন লোক, কজন লোক, লোক চারজন, তিন ছড়া মালা ইত্যাদি।

গ) বচন— বাংলায় বচন দু রকম - একবচন ও বহুবচন। বিশেষ্য ও সর্বনামের বচন ভেদ আছে। সর্বনামে এক ও বহু বচনের রূপ আলাদা হয়। যেমন—আপনি-আপনারা, আমি-আমরা, তুমি-তোমরা ইত্যাদি।

বিশেষ্যের পরে রা, গুলি ইত্যাদি বসিয়ে বহুবচন হয়। যেমন ছেলেরা, ছেলেগুলো/ছেলেগুলো/ছেলেগুলি ইত্যাদি। কখনো বহুত্ববাচক শব্দও যোগ হয়। যেমন - অনেক লোক। কখনো বিশেষ্য বা বিশেষণের দ্বিত্বদ্বারাও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন গাছে গাছে, লাল লাল। আবার কখনো সমার্থক অনুগামী শব্দজুড়েও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন-গাছ-গাছড়া, ফলপাকুড়, ছেলেপুলে ইত্যাদি।

ঘ) লিঙ্গ — বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব তেমন নেই। যেটুকু আছে তা বিশেষ্য শব্দের ক্ষেত্রেই আছে। কিছু কিছু স্ত্রী লিঙ্গ বাচক প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৈরি করা হয়। যেমন পাঠক-পাঠিকা ; ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধবী ইত্যাদি। আর আছে ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-মহিলা ইত্যাদির মতো কিছু পুং ও স্ত্রী শব্দের জোড়।

বাংলায় লিঙ্গ প্রধানত অর্থনির্ভর। অর্থাৎ শব্দের দ্বারা পুরুষ জাতীয় প্রাণী বোঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী জাতীয় প্রাণী বোঝালে স্ত্রীলিঙ্গ এবং অপ্রাণী বোঝালে ক্লীবলিঙ্গ হয়। রূপতত্ত্ব বা অন্বয়ের প্রেক্ষিতে লিঙ্গের গুরুত্ব বাংলায় নেই।

৬.৮ বাংলা ক্রিয়াবিভক্তি

বাংলা ক্রিয়াপদের রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে কাল, পুরুষ ও ভাব— এই তিন ধরনের ব্যাকরণিক সংবর্গ বা ব্যাকরণিক কোটি। এই তিন সংবর্গে ক্রিয়ার যে রূপবৈচিত্র্য হয় তাকে ক্রিয়ারূপ বলে। এবং ক্রিয়ামূলকে বলে ধাতু।

ধাতুর গঠন তিন ধরনের—(১) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু ও (৩) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু একটি মাত্র রূপকল্প দিয়ে গঠিত ও একাক্ষরী। যেমন— কর, খা, শো, লেখ, পড়, দ্যাখ ইত্যাদি।

সাধিত ধাতুতে একাধিক রূপকল্প থাকে। ক্রিয়ামূলরে সঙ্গে আরও একটি রূপকল্প যুক্ত সাধিত ধাতু দ্ব্যক্ষরী হয়। যেমন— প্রযোজক ধাতু—করা (কর্ আ), লেখা (লেখ্ আ), শোনা (শোন্ আ) ইত্যাদি।

বিশেষ্য, বিশেষণ শব্দের সঙ্গে বা অন্য ক্রিয়াপদের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু ধাতু যোগ করে সংযোগমূলক ধাতু ও যৌগিক ধাতু তৈরি হয়। যেমন—জিজ্ঞেস কর, বলো হ্, পড়ে যা, দেখে নে ইত্যাদি।

বাংলায় ক্রিয়ার সমাপিকা ও অসমাপিকা রূপ আছে। আমরা প্রথমে সমাপিকা ক্রিয়া আলোচনা করব।

ক) কাল — বাংলায় ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে কালের প্রভাব ও বিস্তার সবচেয়ে বেশি।

প্রধান কাল তিনটি— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ক্রিয়ার কালকে গঠনগত ও অর্থগত দিক থেকে দুভাগে ভাগ করা যায়—সরল মৌলিক কাল এবং মিশ্র বা যৌগিক কাল।

সরল বা মৌলিক কালে একটি ধাতুর সঙ্গে একটি বিভক্তি যোগ হয়ে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। সরল কালের উপবিভাগ চারটি—১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান - আমি পড়ি ২) সাধারণ বা নিত্য অতীত - আমি পড়লাম ৩) নিত্যবৃত্ত বা অভ্যস্ত অতীত - আমি পড়তাম। ৪) সাধারণ ভবিষ্যৎ - আমি পড়ব।

যৌগিক কালে ক্রিয়ামূলের সঙ্গে আছ/থাক্ ধাতুর রূপ বিভক্তি হিসেবে যোগ হয়। যৌগিক কালের উপবিভাগ দশটি ৫) ঘটমান বর্তমান - আমি পড়ছি। ৬) ঘটমান অতীত - আমি পড়ছিলাম। ৭) ঘটমান ভবিষ্যৎ — আমি পড়তে থাকব। ৮) পুরাঘটিত বর্তমান - আমি পড়েছি ৯) পুরাঘটিত অতীত — আমি পড়েছিলাম। ১০) ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাব্য অতীত — আমি পড়ে থাকব। ১১) নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঃ আমি পড়ে থাকি। ১২) নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান — আমি পড়তে থাকি। ১৩) ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত (অতীত বোধক) — আমি পড়তে থাকতাম। ১৪) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (অতীত বোধক) — আমি পড়ে থাকতাম।

এছাড়াও ডঃ রামেশ্বর শ আরও দুটি যৌগিক কালের ব্যবহার দেখিয়েছেন। সে দুটি ১৫) পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান — আমি পড়ে আসছি ও ১৬) পুরাঘটিত ঘটমান অতীত — আমি পড়ে আসছিলাম।

ছকের সাহায্যে এই শ্রেণি উপশ্রেণিগুলি নীচের মতো করে দেখানো যায় ঃ

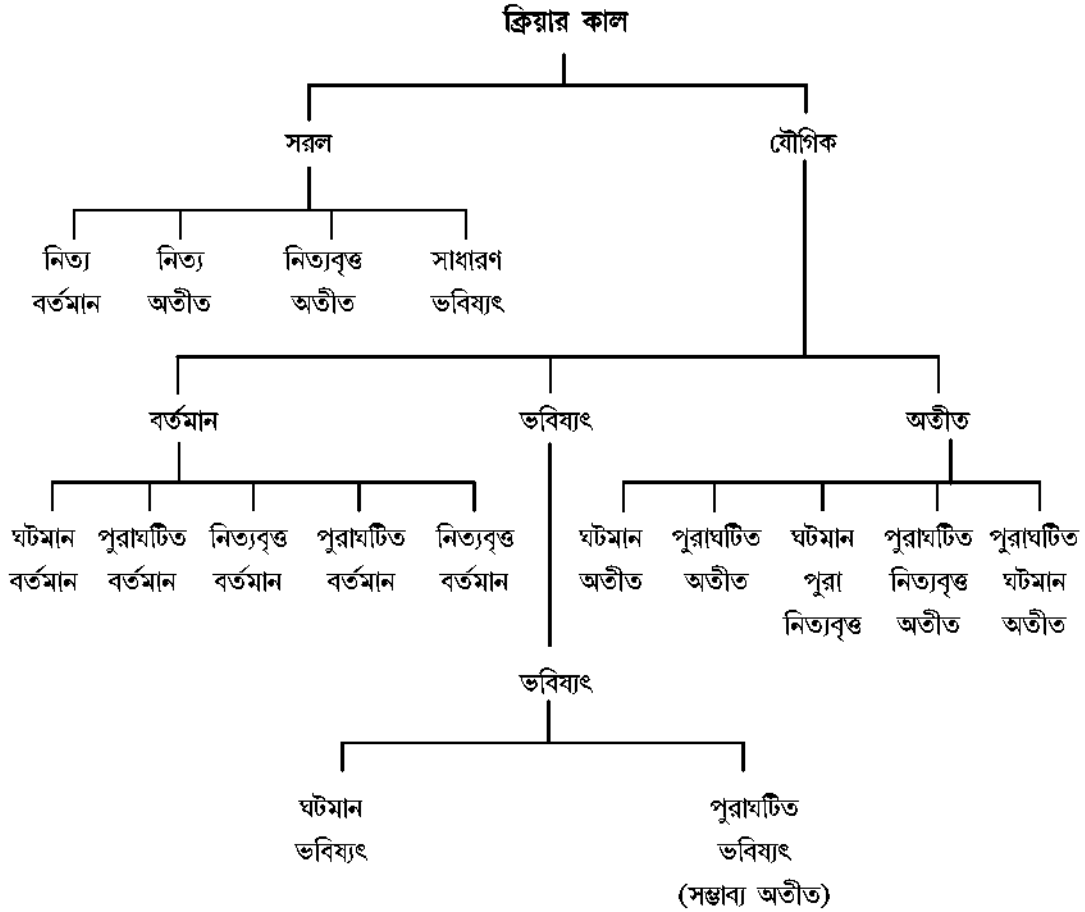

খ) পুরুষ — বাংলার ক্রিয়ারূপের কালের পরেই পুরুষের প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যে কর্তার পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়। যেমন—আমি যাই, তুমি যাও, সে যায় ইত্যাদি।

বাংলায় পুরুষ তিন ধরনের — উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের আবার তিনটি ভাগ—তুই-তোরা, তুমি-তোমরা, আপনি-আপনারা। প্রথম পুরুষের দুটি ভাগ-সে-তারা ও তিনি-তারা।

তিনটি প্রধান কালে — অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — পুরুষবাচক বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তিগুলি ছকের সাহায্যে নীচে দেওয়া হল ঃ

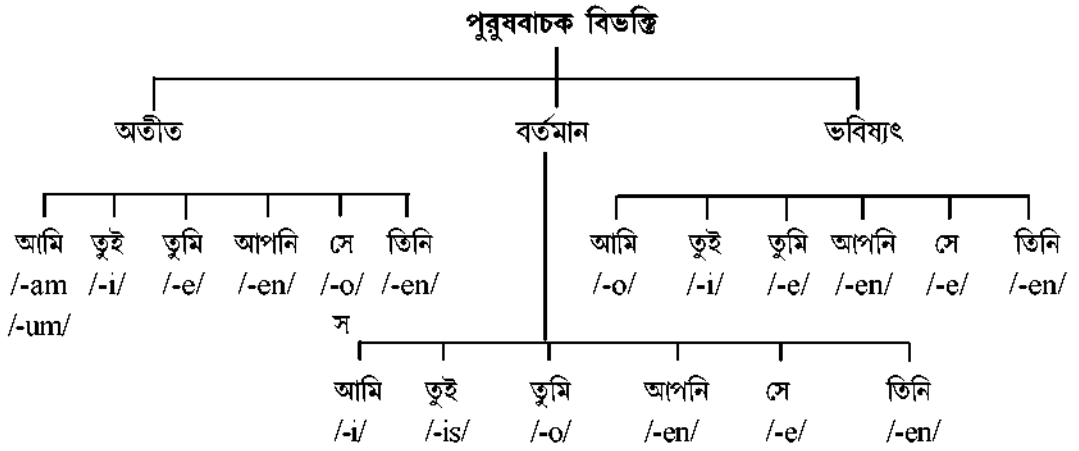

গ) ভাব— বাংলায় ক্রিয়ার ভাব দুরকম— ১) নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক আর ২) অনুজ্ঞা।

ওপরে বর্ণিত ক্রিয়ার ষোলোটি কালই নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক ভাবের দ্যোতক।

অনুজ্ঞা ভাবের দুটি ভাগ— ক) বর্তমান অনুজ্ঞা — যেমন তুই পড়, তুমি পড়ো, আপনি পড়ুন, সে পড়ুক, তিনি পড়ুন।

খ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা — যেমন তুই পড়িস, তুমি পোড়ো, আপনি পড়বেন, সে পড়ুক, তিনি পড়বেন।

উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা ভাবের ক্রিয়ারূপ হয় না।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ক্রিয়ারূপের বিশ্লেষণ করা যাক।

৩১।	Korlam	= Kor-l-am	ধাতু + নিত্য অতীত + পুরুষ বিভক্তি
	Korbo	= kor-b-o	ধাতু + ভবিষ্যৎ + পুরুষ বিভক্তি
	Kortam	= kor-t-am	ধাতু + নিত্যবৃত্ত অতীত + পুরুষ বিভক্তি
৩২।	Korechi	= kor-e-chi	ধাতু + পুরাঘটিত + আছ ধাতু + পুরুষ বিভক্তি
	Korchilam	= kor-e-ch-li-am	ধাতু + পুরাঘটিত + আছ ধাতু অতীত + পুরুষ বিভক্তি
	Kortam	= kor-t-am	ধাতু + নিত্যবৃত্ত অতীত + পুরুষ বিভক্তি

বাংলায় লিঙ্গ ও বচন ভেদে ক্রিয়াপদের কোনো পরিবর্তন হয় না।

৬.৮.১ সমাপিকা ও অসমাপিকা

ক্রিয়াপদের দুটি অতি পরিচিত শ্রেণি সমাপিকা ও অসমাপিকা। এ পর্যন্ত আলোচনা শুধুমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াপদেরই হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ গঠিত হয় তিনটি প্রত্যয় যোগে ঃ

৩৩। ইয়া/এ ঃ পড়ে

ইতো/তে ঃ পড়তে, পড়িতো

ইলে/লে ঃ পড়লে, পড়িলে

এরা মধ্যে ইয়া/এ এবং ইতে/তে দ্বিত্ব প্রয়োগ আছে। ইয়া/এর দ্বিত্ব দ্বারা অবিরাম ঘটমানতা বোঝায়। যেমন— মেয়েটি কেঁদে কেঁদে সারা। আর ইতে/তে-র দ্বিত্ব দ্বারা সবিরাম ঘটমানতা বোঝায়। যেমন— দুধটা ফেলতে ফেলতে গেল।

৬.৮.২ অকর্মক - সকর্মক - দ্বিকর্মক

বাংলা বাক্যে ক্রিয়া কর্মপদহীন, বা একটি কর্মপদ বা দুটি কর্মপদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। কর্মপদহীন ক্রিয়াকে বলে অকর্মক ক্রিয়া। যেমন— মেয়েটি লাফাচ্ছে। কর্মযুক্ত ক্রিয়াপদ হল সকর্মক ক্রিয়া। যেমন— রাতুল বল খেলছে। কর্মপদ দুটি থাকলে সেই ক্রিয়া হবে দ্বিকর্মক ক্রিয়া। যেমন— পূজারি দেবতাকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন।

রূপের দিক থেকে এই তিন ধরনের পদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

৬.৮.৩ সংযোগমূলক ও যৌগিক ক্রিয়াপদ

সংযোগমূলক ও যৌগিক ধাতুর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় শ্রেণিই দুটি শব্দ দিয়ে দ্বিপদী ক্রিয়াপদ তৈরি করে।

সংযোগমূলক ক্রিয়াপদে প্রথম শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুসর্গ ও দ্বিতীয়টি ক্রিয়া রূপকল্প। যেমন—

বিশেষ্য + ক্রিয়া = জিজ্ঞেস কর্, বই পড়্, অঙ্ক কষ্ ইত্যাদি।

বিশেষণ + ক্রিয়া = বড়ো হ্, কম কর্, শেষ হ্ ইত্যাদি।

অনুসর্গ + ক্রিয়া = পেছনে লাগ্, পাশে থাক্ ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়াপদে প্রথম শব্দটি /e/ বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি বাংলায় নির্দিষ্ট বাইশটি ক্রিয়া রূপকল্পের কোনো একটি দ্বারা গঠিত ক্রিয়া পদ। সংক্ষেপে এই শ্রেণির চেহারা হল ঃ

ক্রিয়া$_{১}$ + ক্রিয়া$_{২}$

ক্রিয়া$_{১}$ = ধাতু + e উদাহরণ পড়ে ফেলেছে, করে নে, শুনে ফেললাম, মরে গেল, তাড়িয়ে দাও, শুয়ে পড় ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় ধাতুটির সমাপিকা, অসমাপিকা সবরকম ক্রিয়ারূপই সম্ভব।

৬.৮.৪ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয় প্রধানত দুভাবে—

ক) ধাতুর সঙ্গে /-a/oa/ ; /-no/; -ɔn//-on/; -ɔna/ -na/ -ona/ ইত্যাদি রূপ যোগ করে, যেমন /Khaoa/

খাওয়া, /C⊃l-on/ চলন ; /Sun-ani/ শুনানি ; /pala-no/ পালানো ; /taka-no/ তাকানো ; /K⊃ra-no/ করানো ; /Samla-no/সামলানো ইত্যাদি।

খ) ধাতুর সঙ্গে /-ba/ যোগ করে। তারপরে /-r/ -er/ বা /matro/ বসে। যেমন /K⊃r-ba-r/ করবার, /Son-ba-r/ শোনবার, /-d ækh-ba-r/ দেখবার, /K⊃r-ba-mattro/ করবামাত্র, /b⊃l-ba-mattro/ বলবামাত্র ইত্যাদি।

৬.৮.৫ ধাতুরূপে বিকল্প

সাধারণত বাংলা ক্রিয়াপদে স্বরধ্বনি ভেদে ধাতুর দুটি করে রূপবিকল্প দেখা যায়। স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগের নীতি অনুযায়ী দুটির একটিতে সংবৃত বা উচ্চরূপ ও অন্যটিতে বিবৃত/নিম্নরূপ বলা যায়। যেমন /likh ও lekh/, /dekh ও dækh/, /Su ও So/, /Kor ও K⊃r/, /Khe ও Kha/-পাওয়া যায় যথাক্রমে /likhi ও lekhen/, /dekhun ও dæKhen/, /Sui ও Sobe/, /Korche ও K⊃ren/, /Khete ও Khan/ ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে। এর মধ্যে /likh, dekh, Su, Kor, Khe/ হল উচ্চ বা সংবৃত রূপ এবং /lekh, dækh, So, K⊃r, kha হল নিম্ন বা বিবৃত রূপ।

৬.৮.৬ সাধু চলিত

বাংলার সাধু ও চলিত শৈলী ভেদে ক্রিয়ারূপের পার্থক্য হয়। যেমন - যাচ্ছি বনাম যাইতেছি, খাব বনাম খাইব, করে বনাম করিয়া, চলছিল বনাম চলিতেছিল ইত্যাদি।

৬.৮.৭ সমাসবদ্ধ শব্দ

এ পর্যন্ত জটিল শব্দের আলোচনা হল এবার সমাসবদ্ধ বাংলা শব্দ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে দু-চার কথা বলি।

সমাস হল একাধিক শব্দ জুড়ে তৈরি একটা শব্দ। বাংলায় সমাস কে কার ওপর কতটা নির্ভরশীল তার ওপর ভিত্তি করে চাররকম সমাসের কথা বলা যায়।

ক) সব সদস্যই প্রধান — দ্বন্দ্ব সমাস — যেমন ভাইবোন, ছাত্রছাত্রী ইত্যাদি।

খ) প্রথম সদস্যের প্রাধান্য — অব্যয়ীভাব সমাস — যেমন প্রাকস্বাধীনতা, উত্তর আধুনিকতা ইত্যাদি। এখানে প্রাকস্বাধীনতা বলতে কোনো ধরনের স্বাধীনতা নয়, বরং এক ধরনের প্রাক্ বোঝাচ্ছে।

গ) দ্বিতীয় সদস্য প্রধান — তৎ পুরুষ সমাস — যেমন গঙ্গাজল, ঘরবন্দি ইত্যাদি কর্মধারায় সমাস যেমন উড়োজাহাজ, সিংহাসন ইত্যাদি।

ঘ) কোনো সদস্যই প্রধান নয় — বহুব্রীহি — যেমন চারপেয়ে — এখানে চার পেয়ে কোনোটাই প্রধান নয়।

বাংলায় সমাসের মতো দেখতে আরেক ধরনের শব্দ দেখা যায় যে শব্দের দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশেরই প্রতিধ্বনির মতো। এরকম শব্দকে বলে অনুকার শব্দ। যেমন—বইটই, ভাতটাত, আকাশটাকাশ, টিকিটফিকিট ইত্যাদি।

এই এককের পরিসরে এই হল বাংলা রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

৬.৯ সারাংশ

সমগ্র এককে আলোচিত রূপতত্ত্বের প্রধান প্রধান সূত্র ঃ—

১। ধ্বনিতত্ত্বের মত রূপতত্ত্বেও তিনটি প্রয়োজনীয় ধারণা হলো রূপ - রূপকল্প - রূপবিকল্প।

২। রূপকল্প ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। তবে রূপকল্পকে সংজ্ঞার চেয়েও তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে চেনাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

৩। রূপকল্পের দুটি প্রধান ভাগ — স্বাধীন রূপকল্প ও পরাধীন রূপকল্প। পরাধীন রূপকল্পের উপবিভাগ — উপসর্গ, মধ্যসর্গ ও প্রত্যয়।

৪। ভাষায় রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয় করা হয় শব্দ চতুষ্কোণের সাহায্যে।

৫। রূপকল্পের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণের সদস্যদের মধ্যে অর্থের ভিন্নতা ও বৈপরীত্যের সম্পর্ক থাকবে।

৬। রূপবিকল্পের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণের সদস্যদের মধ্যে অর্থের অভিন্নতা ও উচ্চারণের শর্তাধীনতা বা মুক্ত বৈচিত্র্য থাকবে।

৭। বাংলা রূপতত্ত্বের প্রধান দুটি ভাগ — শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ।

৮। শব্দরূপে রূপবৈচিত্র্যে দেখা যায় প্রধানত বিশেষ্য ও সর্বনামে।

৯। শব্দ প্রত্যয়ের মধ্যে প্রধান হলো কারকসূচক প্রত্যয়। এছাড়া অন্যান্য প্রত্যয় হল — শ্রেণিবাচক, বচনবাচক ও লিঙ্গবাচক প্রত্যয়।

১০। ক্রিয়ারূপে রূপবৈচিত্র্য আনে কালবাচক, পুরুষবাচক ও ভাববাচক প্রত্যয়। বাংলায় কালের উপশ্রেণি ১৬টি, পুরুষের তিনটি — যার রূপ হয় ৬ রকম আর ভাবের দুটি।

১১। ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে এছাড়াও সমাপিকা - অসমাপিকা, অকর্মক-সকর্মক-দ্বিকর্মক, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এই ধারণাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ।

৬.১০ অনুশীলনী

১। ক) উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

রূপ, শূন্যরূপ, রূপকল্প, রূপবিকল্প, সাপ্লেটিভ রূপ, স্বাধীন রূপ, উপসর্গ, প্রত্যয়, মুক্ত বৈচিত্র্য, শব্দ চতুষ্কোণ, ইউনিক রূপ, সমধ্বনি রূপকল্প, জটিল শব্দ, সরল শব্দ, বিভক্তি, পদ, অনুসর্গ, শ্রেণিবাচক, প্রত্যয়, সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু, সরল কাল, বাংলা মধ্যম পুরুষ, দ্বিকর্মক ক্রিয়া, অনুকার শব্দ।

খ) নীচের বাংলা পদগুলিকে বিশ্লেষণ করুন ঃ

দেখেছিলেন	=	ফুলটুল	=
দেখছিলেন	=	চেষ্টা করে	=
পড়তে	=	গাছপালা	=

বাড়িতে	=	ভারতের	=
খাতাগুলো	=	নটী	=
দিনরাত	=	তোমাকে	=
গল্পগুচ্ছ	=		

গ) নীচের চতুষ্কোণ থেকে রূপকল্প ও রূপবিকল্পগুলি দেখান ঃ

/pakhi	Pakhike	pakhir	pakhira
ke	Kake	kar	Kara/

২। ক) উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন ঃ

অ) রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোটো ছোটো পরম্পরা

আ) রূপকল্পস্থ ধ্বনিকল্পের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায় না।

ই) রূপকল্প এবং অক্ষর বা দল সমার্থক নয়

ঈ) পুনরাবৃত্ত সব পরম্পরাই রূপকল্প নয়

খ) উদাহরণসহ ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা ব্যাখ্যা করুন।

গ) মুক্তবৈচিত্র্য বলতে কী বোঝেন ? উদাহরণসহ বোঝান।

ঘ) রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ করুন।

ঙ) রূপবিকল্প নির্ধারণের সূত্রগুলি কী কী ?

চ) বাংলা শব্দরূপে বচন ও লিঙ্গের ভূমিকা আলোচনা করুন।

ছ) বাংলা যৌগিক ও সংযোগমূলক ক্রিয়ারূপ বর্ণনা করুন।

৩। ক) রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প—এই তিনটি ধারণা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

খ) বাংলা ক্রিয়ারূপে কালের ভূমিকা ও শ্রেণি আলোচনা করুন।

গ) শর্তাধীনতা বলতে কী বোঝেন ? ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্পের প্রেক্ষিতে বাংলা শব্দের গঠন আলোচনা করুন।

ঙ) বাংলা শব্দরূপের কারক-বিভক্তির ভূমিকা আলোচনা করুন।

চ) বাংলায় যৌগিক কাল কী ? কতরকম যৌগিক কাল আছে ? উদাহরণ দিন।

ছ) বাংলা সমাসবদ্ধ পদের আলোচনা করুন।

৪। ক) বাংলা রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

খ) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে রূপকল্পের ধারণা স্পষ্ট করুন।

গ) শব্দ চতুষ্কোণের সাহায্যে রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করুন। যথেষ্ট উদাহরণ দিন।

ঘ) বাংলায় কোন্ কোন্ পদের রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের রূপবৈচিত্র্য উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রবাল দাশগুপ্ত, ১৯৯৩ ভাষা বর্ণনার স্তর (প্রবন্ধ) নিসর্গ ৩য় সংখ্যা, ১-১১৩ পৃঃ

২। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা।

৩। সুকুমার সেন, ১৯৬৮, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স কলকাতা।

৪। Gleson, H. A. 1961, An Introduction to Descriptive Linguistics, Oxford & IBP Publishing Co. Delhi, Bombay, Calcutta.

৫। Hockett, C. F. 1976, A Course in Modern Linguistics Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi, Bombay, Calcutta.

একক ৭ ❐ অন্বয় ও অন্বয়-তত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ ধারণা

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ বাক্যের সংজ্ঞা

৭.৪ বাক্য ও অর্থ

৭.৫ অন্বয় তত্ত্ব

৭.৫.১ ভারতীয় অন্বয় তত্ত্ব

৭.৫.১ পাশ্চাত্য অন্বয় তত্ত্ব

৭.৬ সারাংশ

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করলে জানতে পারবেন—

- বাক্য কাকে বলে তা বোঝা যাবে। বাক্য সম্পর্কিত অতীতের নানা ধারণা এবং বর্তমান ধারণা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।
- বাক্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক কোথায় তা বোঝা যাবে।
- ব্যাকরণ সম্মত বাক্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।
- অন্বয় তত্ত্বর গতিপ্রকৃতি বোঝা যাবে।
- আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বিশেষভাবে অন্বয়তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই লেখার মাধ্যমে সে বিষয়ে কৌতূহল তৈরি হবে।

৭.২ প্রস্তাবনা

আমরা মুখ দিয়ে যে কথা বলি তার মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানের সবকটি এককেই উপলব্ধি করতে পারা যাবে। যেমন—ধ্বনি-রূপ-পদগুচ্ছ-বাক্য-বচন ইত্যাদি ইত্যাদি। ধ্বনি জুড়ে তৈরি করি রূপিম। রূপিম জুড়ে তৈরি হয় পদ। পদ জুড়ে পদগুচ্ছ। আর পদগুচ্ছ জুড়ে বাক্য। এক বা একের বেশি বাক্য নিয়ে বাচন বা Discourse তৈরি হয়। তবেও আমাদের মুখের ভাষায় সবচেয়ে বড়ো একক হল বাক্য।

অন্বয়ের আলোচনা এই সবচেয়ে বড়ো একক বাক্যকে অবলম্বন করেই হয়। সুতরাং অন্বয় সম্পর্কিত আলোচনা আসলে বাক্য নিয়েই আলোচনা। তাই প্রথমে বাক্য কাকে বলে সে সম্পর্কে আধুনিক একটি ধারণার পরিচয় দিয়ে অন্বয় ও অন্বয় তত্ত্ব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এই একক-১-এ করব। প্রথমে বাক্য কাকে বলে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৭.৩ বাক্যর সংজ্ঞা

একটু আগেই জেনেছি ভাষার একটি বড়ো একক হল—বাক্য বা Sentence। কিন্তু ঠিকঠাকভাবে একটি বাক্য বলতে কী বোঝায় ? এই নিয়ে নানা যুগে নানা তাত্ত্বিক নানা ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সে সব অজস্র সংজ্ঞার মধ্যে কয়েকটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে বাক্য সম্বন্ধে ধারণা সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘদিন আগেই ছিল। অনেকে বাক্য আলোচনা প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবনায় চলে গেছেন। অনেকে বাক্যর গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ভাবনায় স্পষ্ট দুটি ভাগ পাওয়া যায়। ভর্তৃহরি "বাক্যপদীয় গ্রন্থে" বাক্যকে গুরুত্ব দেন। স্ফোটবাদী ভর্তৃহরির অনুসারী বৈয়াকরণগন তাঁরই মতো "বাক্য" কে অখন্ড বলে মনে করতেন। অন্যদিকে নৈয়ায়িক দার্শনিক ও মীমাংসকগণ খন্ডবাদী ছিলেন। তাঁরা পদকে গুরুত্ব দিতেন। অর্থাৎ পদ জুড়ে বাক্য তৈরি হয়। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বিশ্বনাথ কবিরাজ বাক্যর সংজ্ঞা দেন—

"বাক্যংস্যাদযোগ্যতাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়।"

অর্থ বাক্য হল — যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমুচ্চয়। "যোগ্যতা" অর্থাৎ অর্থ ঠিক ঠাক আছে এরকম পদটি বাক্যে ব্যবহৃত হবে। "আকাঙ্ক্ষা" অর্থাৎ সহবস্থানযোগ্য বা একসঙ্গে পাশাপাশি বসতে পারে এমন পদই বাক্যে ব্যবহৃত হবে। 'আসত্তি' অর্থাৎ যে সমস্ত পদ বাক্যে জুড়ে গিয়ে এককের মতো কাজ করে সেগুলি পাশাপাশি বসবে। একটা অন্যটার থেকে দূরে বসবে না।

প্রাচীন গ্রিস ও রোম সাম্রাজ্যে বাক্য নিয়ে নানা ধারণা তৈরি হয়েছিল। প্লেটো থেআতেতুথ গ্রন্থে সক্রেটিসের মুখে বাক্যের একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

'ভাষা হল ওনোমাতা ও হ্রিমাতা-র মাধ্যমে চিন্তা ভাবনার প্রকাশ।

মুখনিঃসৃত বায়ুস্রোতে বক্তার চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়। 'ওনোমাতা' বলতে নাম, বিশেষ্য, বিশেষ্যপদীয়, কর্তা বোঝানো হয়। 'হ্রিমাতা' বলতে বোঝায় পদ, উক্তি, ক্রিয়া, ক্রিয়াপদীয়, বিধেয়, কর্ম প্রভৃতি। বাক্য বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সংগঠন বা উদ্দেশ্য ও বিধেয়র সংগঠন—সে ধারণা এখানে পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটল (Aristotle) বাক্যকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' উক্তি হিসাবে দেখেছেন। পূর্ণ অর্থ প্রকাশক উক্তি হিসাবে তিনি বাক্যকে গ্রহণ করেছেন।

রোমান ব্যাকরণে দিওনিসিউস থ্রাকস (Dionysium Thrax) বাক্যকে পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক ধ্বনিসমষ্টি বলে মনে করতেন। আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস (Apollonius Dyscolus) জানান, অক্ষর জুড়ে যেমন শব্দ হয় তেমনি ভাবের সমাবেশে প্রতিটি স্বাধীন বাক্য গঠিত হয়। প্রিকিয়ান (Priscian) বাক্যকে 'পদের গ্রহণযোগ্য বিন্যাস যা পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে'—এই হিসাবে দেখেন।

ইংরেজি ব্যাকরণে অজস্র সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে লাউথ (Lowth, Robert) বাক্যকে বলেন, সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি—যা পূর্ণভাব প্রকাশ করে তাই হল বাক্য।

"A sentence is a assembloge of words, expressed in proper form, arranged in proper order and occuring to make a compelte snese." [Lowth, R. 1762, a short Introduction to English Grammar with critical notes]

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নেসফিল্ড (Nesfield, J. C. 1895) বলেছেন, "A combination of words that makes a complete snese is called a sentence." [Nesfield : 1895 Idiom, Grammar and Synthesis] আর তাই বলা চলে যে, বাক্য হল শব্দের বিন্যাস যা সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করে।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়েসপার্সেন (Otto Jespersen) বলেন, "A Sentence is a (relatively) complete and independent human utterenance...The completenss and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alon i.e. of being uttered by itself." [Jesperson, O. 1924, The Philosophy of Grammar] অর্থাৎ আপেক্ষিকভাবে বাক্য সম্পূর্ণ ও স্বাধীন মানবী উচ্চারণ। বাক্য যে একাই অবস্থান করতে পারে সেই শক্তিই এই সম্পূর্ণতা ও স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে। বাক্যকে নিরপেক্ষভাবে উচ্চারণ করা যায়। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে এসব সংজ্ঞা গুরুত্ব পায় নি। সেখানে ব্লুমফিল্ডের (Bloomfield) সংজ্ঞা গুরুত্ব পেয়েছে।

"A maximum form is any utterance is asentence." (Bloomfield 1926; "A set of postulates for the Science of Language") অর্থাৎ যে-কোন উচ্চারণ-হল বাক্য। যেমন, 'যাই', 'আচ্ছা' 'ঠিক আছে', 'যাবেখন'—এগুলি সবই বাক্য।

লায়ন্স (J. Lyons), হকেট (C. F. Hockett), হ্যারিস (Z. Harris), ফ্রাইস (C.C.Frice) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডের সংজ্ঞাকেই অনুসরণ করেছেন। ফ্রিজ বাক্যকে ন্যূনতম স্বাধীন উক্তি হিসাবে দেখেন।

বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ব্যাকরণের সংজ্ঞাকেই নেওয়া হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজের সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, হরনাথ ঘোষ, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ বৈয়াকরণ যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমষ্টিকে বাক্য বলেন। অন্যদিকে রামমোহন রায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ বলেন,

"পদসকল পরস্পর অন্বিত অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদয়কে বাক্য কহি।" [রামমোহন রায়, ১৮৩৩, গৌড়িয় ব্যাকরণ]

জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কালিদাস রায় প্রমুখ পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পদসমষ্টিকে বাক্য বলেন। এখানে পাশ্চাত্য ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে।

সঞ্জননী (Generative) ব্যাকরণে বাক্যকে একটি উপাদান গুচ্ছ বা একটি দীর্ঘ একক বলে ধরা হয়। চমস্কি (Noam A. Chomsky) বাক্যকে ভাষার সমষ্টি বলেছেন। 'Syntactic Structure' (1965) গ্রন্থে রূপিম পরস্পরকে বাক্য বলেছেন। 'Aspects of the Theory of Systase' (1965) গ্রন্থে বললেন, পদগুচ্ছ দিয়ে বাক্য চিহ্নিত হয়। আর একটি পদগুচ্ছ চিহ্নিত উপাদান একটি বীজবাক্য হিসাবে গঠিত হয়।

"Among the sentences with a single base phrase-marker as basis, we can delimit a proper subset called "Kernet sentences." [Chomsky : 1965 : 17]

চমস্কির মতো পোস্টাল (Postan)-ও বাক্যকে বিমূর্ত ধারণা হিসাবে দেখেছেন। বাক্যকে 'Basic unit of Grammaer' বললেন স্মিথ ও উইলসন [Smith and Wilson 1979, Modern Linguistics, p. 271]। বাক্যকে সুগঠিত শব্দশৃঙ্খল হিসাবে দেখলেন জেকবস্ ও রোসেনবাম (Jacobs and Rosenbum)।

"A sentence is a structured string whose wards fall into natural groups." [1968, English Transformational Grammar, P.15]

আমরা বাক্যকে তাই বিমূর্ত গঠন হিসাবে যখন দেখব তখন তার মধ্যে আছে আদর্শ আন্বয়িক নিয়মসমূহ। আর এই নিয়ম নিয়ে গঠিত যুক্তিনিষ্ঠ গঠনটি বাক্যের ভেতরকার গঠন। সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে অধোগঠন (Deep Structure)। আর সেই গঠনকে অবলম্বন করেই মুখের ভাষায় ব্যবহৃত হয় বাক্য। সে বাক্য একদিকে যেমন শব্দ শৃঙ্খল তেমনি অন্যদিকে তা ভাবপ্রকাশক। আদর্শ যুক্তিনিষ্ঠ গঠনের হুবহু প্রতিফলন তাতে ঘটে না। কিন্তু সেটিই প্রকৃত উচ্চারিত ধ্বনি রূপ। আর সেই উচ্চারিত ধ্বনিরূপের ক্রমাগত প্রকাশ যখন একটি বিষয় অবলম্বনে বলা হয় তাকে বলা হবে বাচন (discourse)। সেই বাচনের অন্তর্গত সবচেয়ে বড়ো একক হল বাক্য। একটি মাত্র বাক্যখণ্ড (clause) নির্ভর উচ্চারণকে একটি সরল বাক্য বলা হয়। সরলবাক্যগুলি জুড়ে জুড়ে আমরা নানাবিধ দীর্ঘবাক্য তৈরি করি।

৭.৪ বাক্য ও অর্থ

তাহলে, বাক্য হল শব্দশৃঙ্খল। শব্দের অর্থ আছে। আবার বাক্যেরও অর্থ আছে। বাক্য কোনো কিছু অর্থ বা বক্তব্য আমাদের কাছে প্রকাশ করে। যেকোনো ব্যাকরণসম্মত শব্দের দুটি অর্থ থাকে বলে ফ্রাইস [Fries, 1952, The Structure of English] জানিয়েছেন। এই দুটি অর্থ হল—

ক. আভিধানিক অর্থ। আভিধানে শব্দের যে অর্থ দেওয়া থাকে তাকে আভিধানিক অর্থ বলে। এই অর্থ ধারণাগত। সাধারণত সমনাম শব্দ দিয়ে তা বোঝান হয়। যেমন 'বালক' শব্দের আভিধানিক অর্থ — হল শিশু, অল্পবয়স্ক পুরুষ ইত্যাদি।

খ. গঠনগত অর্থ। পদগঠন অনুসারে শব্দটির অর্থ। এখানে 'বালক' শব্দটির অর্থ হবে বিশেষ্য। তৃতীয় একটি অর্থের কথা আমরা বলতে পারি। সেটি হল—

গ. অন্বয়গত অর্থ। বাক্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে যে ভূমিকা পালন করে তাকে অন্বয়ার্থ বা অন্বয়গত অর্থ বলে। [উদয় কুমার চক্রবর্তী, ১৯২২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন]। বাক্য ছাড়া এই অন্বয়ার্থ সম্ভব নয়। যেমন বালকটি যায়। সে বালকটিকে ডাকল। এখানে প্রথম বাক্যে 'বালকটি'-র অন্বয়ার্থ হল কর্তা। দ্বিতীয় বাক্যে 'বালক'টি-র অন্বয়ার্থ হল—কর্ম।

সুতরাং বাক্যে পদটির অবস্থান ও ভূমিকা দিয়ে এই অন্বয়ার্থ দিয়ে বোঝা যায়। একই পদের অবস্থান বদলে গেলে বা ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হলে তার পদভূমিকা বদলে যায়। বদলে যায় তার অন্বয়গত অর্থ।

অতএব একটি পদের অন্বয়গত অর্থ চলনশীল বা পরিবর্তনশীল। গঠনগত অর্থ আংশিক ধ্রুব বা নির্দিষ্ট। আভিধানিক অর্থ ধ্রুব বা স্থির। তার পরিবর্তন আপাতভাবে ঘটে না। দেশ-কাল-ইতিহাসের দীর্ঘ পটভূমিকায় তার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আভিধানিক অর্থযুক্ত শব্দ পদগঠনগত অর্থ যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। সেই পদ বাক্য ব্যবহৃত হয়ে আন্বয়িক অর্থ প্রকাশ করে। অন্বয়তত্ত্ব এই অন্বয়গঠন ও অন্বয়গত অর্থ ব্যাখ্যা করে।

৭.৫ অন্বয়তত্ত্ব

সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হত বাক্যবিন্যাস, বাক্যবিবেক, পদন্বয় বা অন্বয়। বাক্য তৈরির নানা নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হত এই শব্দগুলি। বাক্যপদ্ধতি শব্দও ব্যবহৃত হত। ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' বাক্যগঠনের বিজ্ঞান নিয়ে এই লেখা। মনিয়র উইলিয়মস (Monior Williams) তাঁর অভিধানে (A Sanskrit English Dictionary) অন্বয় শব্দের অর্থ দিয়েছেন Syntax বা পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। আধুনিক বাংলায় কেউ বা বলেছেন বাক্যতত্ত্ব, কেউ বা অন্বয়তত্ত্ব।

গ্রিক সিনট্যাসিক্স শব্দ থেকে এসেছে 'সিট্যাক্স' (Syntax) শব্দটি। ইংরেজি সিনট্যাক্স শব্দের নানা ধরনের অর্থ পাওয়া যায়। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হুমায়ন আজাদ [১৯৮৪ বাক্যতত্ত্ব]। এখানে সংক্ষেপে একটি ধারণা তৈরি করা যেতে পারে।

● একটি বাক্য শব্দ দিয়েই তৈরি হয়। সেইসব শব্দ বাক্যে বিন্যস্ত করার নানাবিধ সূত্র আছে। সেই সূত্রগুলির বিশ্লেষণ হল সিনট্যাক্স।

● নানা ধরনের ইনফ্লেকশন অর্থাৎ বিশেষ্য পদের কারক, ক্রিয়ার ভাব প্রভৃতির এবং বিভিন্ন পদের অর্থ ও ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় যে শাস্ত্রে তাকে সিনট্যাক্স বলে।

● যে-কোনো ভাষার বাক্যের মধ্যে নানা ধরনের যুক্তিসম্মত অর্থ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থাকে। সিনট্যাক্স এগুলি বিশ্লেষণ করে দেখায়। এবং সিনট্যাক্সের সাহায্যে এই অর্থগত সম্পর্ক প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত ধারণা থেকে বোঝানো যায় অন্বয়তত্ত্বের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব যুক্ত হয়ে আছে। অন্বয়তত্ত্বকে পৃথক একটি শাস্ত্র হিসাবে তাঁরা দেখেন নি। বর্তমানে অন্বয়তত্ত্বকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু সে নিয়ে নানা বিতর্ক বর্তমান।

৭.৫.১ ভারতীয় অন্বয়তত্ত্ব

সংস্কৃত অন্বয়তত্ত্বে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। একটি দর্শনের ধারা। সেখানে দর্শন শাস্ত্র অনুসারে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যটি হল — বৈয়াকরণ ধারা। এখানে প্রণালীবদ্ধভাবে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈয়াকরণ ও দার্শনিকদের আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

ক. বাক্যবাদী গোত্র। পদকে এঁরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন স্ফোটবাদী, অন্বিতাভিধানবাদী এবং বৈয়াকরণগণ।

খ. পদবাদী গোত্র। পদকে এঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। পূর্বমীমাংসক, ন্যায়-বৈশেষিক ও অভিহিতান্বয়বাদীগণ এই মতবাদের সমর্থন করেন।

স্ফোটবাদীরা বাক্য ছাড়া আর কিছুকে স্বীকার করতে চাননি। বাক্য তাঁদের কাছে নিরংশ, নির্বিভাগ অর্থাৎ বাক্যকে ভাগ করা যায় না। ভর্তৃহরি, পতঞ্জলি, শেষকৃষ্ণ, নাগেশ, ভট্টোপি প্রমুখ এই মতকে বিশ্বাস করতেন। বাক্যকে ভেঙে বিশ্লেষণ করা যায় না। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। তারা এই বিশ্লেষণের নাম দিয়েছিলেন—অপোদ্ধার।

অন্বিতাভিধানবাদীরা মনে করতেন বাক্যের অর্থকে ভাগ করা যায় না। তাই বাক্যকেও ভাগ করা যায় না। প্রভাকর এই মতকে বিশেষভাবে সমর্থন করতেন। শব্দগুলি একটার সঙ্গে অন্যটা পরস্পর যুক্ত বা অন্বিত হয়ে একটি অখণ্ড অর্থ গড়ে তোলে। শ্রোতা তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'সম্মুগ্ধ বুৎপত্তি'। প্রভাকর শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অর্থের নাম দিয়েছিলেন 'ব্যতিষক্ত'।

বৈয়াকরণগণ-ও 'অখণ্ড বাক্য' ও 'অখণ্ডবাক্যার্থে' বিশ্বাসী ছিলেন। বাক্যকে যে ভাঙা যায় না সে বিষয়ে তাঁরা চরমপন্থী ছিলেন।

পদবাদীরা মনে করতেন বাক্য বিভিন্ন পদের সমষ্টি। কুমারলি ভট্ট ছিলেন অভিহিতান্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা। এঁরা বাক্যের অবিভাজ্যতায় বিশ্বাস করতেন না। পূর্বমীমাংসক এবং ন্যায় বৈশেষিকগণও বিশ্বাস করতেন বাক্য পদ দিয়ে গঠিত। বাক্য একটি অখণ্ড উচ্চারণ নয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন পদ-এর কথা বলেন। পদ চার রকমের—নাম (বিশেষ্য), আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও নিপাত। অনেকে পাণিনির সূত্র অনুসারে দু ধরনের পদের কথা বলেচেন — সুবন্ত বা বিশেষ্য জাতীয় পদ এবং তিঙন্ত বা ক্রিয়াপদ। অনেকে যাস্কের চার প্রকার পদের সঙ্গে যোগ করেছেন কর্মপ্রবচনীয় নামক একটি পদ।

বাক্য বা অন্বয়তত্ত্বের পৃথক আলোচনা না হলেও 'কারক' অধ্যায়ে বাক্যের আন্বয়িক নিয়ম নিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.৫.২ পাশ্চাত্য অন্বয়তত্ত্ব

প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক সোফিস্টরা বিশেষত প্রোতাগোরাস (Protagoras) বাক্যকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। প্রার্থনা, প্রশ্ন, বিবৃতি ও আদেশ এই চার শ্রেণির বাক্যের কথা তিনি বলেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। একবার অনেকের মতে বর্ণনা, প্রশ্ন, উত্তর, আদেশ, প্রতিবেদন, প্রার্থনা ও আমন্ত্রণ এই সাত ধরনের বাক্যের কথা তিনি বলেছিলেন। প্লেটো (Plato) বাক্যের দুটি অংশ আবিষ্কার করেছিলেন। এ দুটি হল—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। থ্রাকস (Thrax) বাক্যের নানা অঙ্গের কথা বলেছিলেন। দিস্কোলুস (Appllonius Dyscolus) বাক্যকে একত্র বিন্যস্ত শব্দসমষ্টি বলেছেন। তিনি বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আর্টিকেল, ইনফিনিটিভ ও পার্টিসিপল-এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। সর্বনাম, প্রিপজিসন, কর্তা সম্বন্ধপদ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উনিশ শতকের গ্রিক ব্যাকরণে দিস্কোলুস-এর পদ্ধতিকে নিয়েই নতুন করে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ লেখা হয়।

গ্রিক অন্বয়তত্ত্বকে অবলম্বন করেই লাতিন অন্বয়তত্ত্ব গড়ে ওঠে। ভারো (Marcus Terenitus Varro) রচিত ব্যাকরণে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়তো ছিল কিন্তু সে গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রিসাকিয়ান (Priscian) দিস্কোলুস অনুসারে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। একটি বাক্য নিয়ে দেখান যে সংযোজক ছাড়া সব রকমের পদ তাতে আছে। সংযোজক আর একটি বাক্যকে জুড়ে দেয়। তিনি ব্যক্তিবাচক কর্তা অনুসারে চার রকমের বাক্য গঠনের কথা বলেন। এগুলি হল - ক. অকর্মক সংগঠন খ. সকর্মক সংগঠন গ. পারস্পরিক সংগঠন ও ঘ. পুনঃসকর্মক সংগঠন। উনিশ শতকের লাতিন ব্যাকরণ গ্রিক ব্যাকরণকে অনুসরণ করেই রচিত হয়। সরল বাক্য, সংযুক্তবাক্য, উদ্দেশ্য, বিধেয়, বাচ্য, ভাব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইংরেজি অন্বয়তত্ত্ব গ্রিক-লাতিন অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে রচিত হয়েছে। অন্বয়তত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্দেশমূলক ব্যাকরণের মধ্যে বাক্য ও অন্বয় নিয়ে নির্ভুল বাক্য রচনা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। ইংরেজি ব্যাকরণের অন্বয়তত্ত্বের কিছু ধারণা এখানে লক্ষ করা যেতে পারে।

Part speech বা বাক্যে অবস্থিত পদগুলির শ্রেণিবিন্যাস। বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, প্রিপজিশন, ইন্টারজেকশন ও কনজাংশন প্রভৃতি শ্রেণিতে শব্দকে ভাগ করা হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া থেকে তৈরি শব্দগুলিকে তিন ভাগে দেখা যায়। ক্রিয়া থেকে জাত বিশেষ্য বা জিরান্ড, ক্রিয়া থেকে জাত বিশেষণ বা পার্টিসিপল এবং ক্রিয়াজত বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ অর্থাৎ ইনফিনিটিভ।

বাক্য বিশ্লেষণের জন্য নানারকম ধারণা ইংরেজি ব্যাকরণে পাওয়া যায়। যেমন - উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate), কর্ম (Object), পূরক বাক্য (Compliment), পদগুচ্ছ (Phrase), বাক্যখণ্ড (Clause) ইত্যাদি। বাক্যকে গঠন অনুসারে সরল (Simple), যৌগিক (Compound), জটিল (Complex), যৌগিক মিশ্র (Compound-Complex) প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

ভূমিকা অনুসারে বাক্যকে বিবৃতিমূলক, প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞা বা আদেশমূলক (Command-Wish) এবং আবেগসূচক এই চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

বাংলা ব্যাকরণে অন্বয়তত্ত্বকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বাংলা ব্যাকরণে শব্দকে বাক্য বিচ্ছিন্ন ভাষাবস্তু বলে মনে করা হয়। আর পদকে বাক্যে বিন্যস্ত ভাষাবস্তু হিসাবে দেখা হয়। বাংলায় পাঁচ প্রকার পদের কথা বলা হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। প্রথানুসারী বাংলা ব্যাকরণের অন্বয়তত্ত্বে বাক্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণ, বাক্যের প্রকার পরিবর্তন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি, বাচ্য, পদক্রম, বাক্য সমক্ষেপণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা পরবর্তী এককে বাংলা বাক্যের অন্বয় নিয়ে আলোচনা করব।

৭.৬ সারাংশ

বাক্য সম্বন্ধে ধারণা ভারতবর্ষে, গ্রিসে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। আধুনিককালে যে-কোন উপাদানের গঠনকে বাক্য বলা হয়েছে। সঞ্জননীতত্ত্বে বাক্যকে বিমূর্ত ধারণা বলা হয়েছে। তার মূর্ত রূপ উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি। বাক্যের আভিধানিক অর্থ, অন্বয়গত অর্থ ও গঠনগত অর্থ দেখা যায়। শব্দগুলির সম্পর্ক নিয়ে অন্বয় ও অন্বয়ের নানাবিধ নিয়ম কানুন নিয়ে তৈরি হয় অন্বয়তত্ত্ব। ভারতে বাক্যবাদী গোত্র, পদবাদী গোত্র

প্রভৃতি দেখা যায়। প্রাচীন গ্রিসে সোফিস্টরা বাক্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করেন। গ্রিক অন্বয়তত্ত্বকে অবলম্বন করে লাতিন অন্বয়তত্ত্ব গড়ে ওঠে। গ্রিক-লাতিন অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে ইংরেজি অন্বয়তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। বাংলা অন্বয়তত্ত্ব পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত অন্বয়কে নিয়ে তৈরি হয়েছে। এর নিজস্ব রূপ তৈরি করা প্রয়োজন।

৭.৭ অনুশীলনী

১. বাক্য কাকে বলে ? পাশ্চাত্যে ও ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে যে ধারণাগুলি পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

২. প্রথানুসারী ও সঞ্জননী ব্যাকরণে বাক্য সম্বন্ধে ধারণার পার্থক্য আছে কী ? আলোচনা করুন।

৩. বাক্য কাকে বলে ? বাক্যর সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. ভারতীয় ও পাশ্চাত্য অন্বয়তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. বাক্য ও অর্থ খ. ভারতীয় মতে বাক্যের সংজ্ঞা গ. গ্রিস ও রোমের ধারণায় বাক্যের সংজ্ঞা
ঘ. বাক্যবাদী গোত্র ঙ. পদবাদী গোত্র চ. গ্রিক অন্বয়তত্ত্ব
ছ. লাতিন অন্বয়তত্ত্ব জ. ইংরেজি অন্বয়তত্ত্ব

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন। প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ১৯৪২, ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২য় সং, কলিকাতা

দাশ, নির্মল, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

Bloomfield, L., 1993(ed) Language, Allen & Unwin, London

Chomsky, N, 1965 Aspects the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge Mass.

Gleason, H. A. 1979 An Introduction to Descriptive Linguistics, Oxford & IBH Publishing Co. Calcutta.

1965 Linguistics and English Grammer, Halt, Rinehant and Winston

Hockett, C. F., 1985, A Course in Modern Linguistics, New York : Mac Millan

Jesperson, O., 1965, The Philosophy of Grammar, The Morton Library New York.

Matheus, P. H. 1981, Syntex, Cambridge University Press.

Planner, F. R. 1983, Grammar, Penjuin, London.

একক ৮ ❐ প্রথানুযায়ী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয়গত নানা দিক

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ বাংলা বাক্যখণ্ড (Clause)

৮.৩.১ বাংলা বাক্যখণ্ড-র প্রকার

৮.৩.২ গঠন অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

৮.৩.৩ বাক্যে ভূমিকা অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

৮.৪ উদ্দেশ্য বিধেয় সংগঠন

৮.৪.১ উদ্দেশ্য

৮.৪.২ বিধেয়

৮.৫ সম্পূরক

৮.৫.১ সম্পূরক বাক্যখণ্ড

৮.৫.২ বাক্য যোজক

৮.৬ কারক বিভক্তি

৮.৭ সারাংশ

৮.৮ অনুশীলনী

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করলে জানতে পারবেন—

- বাক্য গঠনতত্ত্ব ও বাংলা বাক্য গঠন নিয়ে নানা ধারণা উপলব্ধি করা যাবে।
- প্রথানুসারী ব্যাকরণের অন্বয়তত্ত্বের আলোচনার দিকগুলি জানা যাবে।
- বিভিন্ন পাঠ্য ব্যাকরণের বিশেষত স্কুল পাঠ্য নির্দেশমূলক ব্যাকরণের অন্বয়সংক্রান্ত আলোচনার দিকগুলি স্পষ্ট হবে।

- প্রথানুসারী ব্যাকরণ না জানলে ব্যাকরণের পরবর্তী অগ্রগতি বোঝা সম্ভব হবে না।
- প্রথানুসারী ব্যাকরণের গুণগুলি যেমন জানা যাবে তেমনি ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এখানে প্রথানুসারী ব্যাকরণের পাশাপাশি সংগঠনমূলক (Structural), বর্ণনামূলক (Descriptive) ও ক্রিয়ামূলক (Functional) ব্যাকরণের সূত্র ও ধারণা গ্রহণ করে একটি নতুন বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করা হয়েছে সেটি বোঝা যাবে।

৮.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষার প্রথানুসারী ব্যাকরণ নানা যুগে নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বর্তমানে বিশেষ একটি রূপ লাভ করেছে। বাক্য বিশ্লেষণের নানা দিক এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রথাগত ব্যাকরণের সূত্র ও নিয়মগুলি যথাসম্ভব যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সূত্র ও নিয়মগুলির সঙ্গে আধুনিক নানা ভাবনা চিন্তা ও তত্ত্ব যুক্ত করা হয়েছে। ফলে, প্রথানুসারী এই অভিধা থাকলেও এই ব্যাকরণে যুক্ত হয়েছে সংগঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান (Structural Linguistics), বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Linguistics), ক্রিয়ামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Functional Linguistics) প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও নিয়ম। আর এই মিলিত তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা বাংলা ভাষার অন্বয় ও আন্বয়িক গঠন নিয়ে আলোচনা করব।

৮.৩ বাংলা বাক্যখণ্ড

সবচেয়ে ছোটো বাক্য তৈরি হয় একটি বাক্যখণ্ড (Clause) দিয়ে। একটি উদ্দেশ্য (Subject) আর একটি বিধেয় (Predicate) যুক্ত ব্যাকরণ সম্মত গঠনকে বাক্যখণ্ড বলা হয়। যেমন, রহিম স্কুলে যায়।

এখানে উদ্দেশ্য—রহিম। বিধেয়—স্কুলে যায়। একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় দিয়ে এই বাক্যটি গঠিত। তাই এটি একটি বাক্যখণ্ড।

সঞ্জননী ব্যাকরণে বাক্যখণ্ডর ধারণা উদ্দেশ্য বিধেয়-র সংগঠন নয়। সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় ক্রিয়াপদকে।

'Every besical verb must belongs to a separate clause.' [R. L. Trask, 1997, A students Dictionary of Language and Linguistics, p. 42]

প্রত্যেকটি প্রধান ক্রিয়া অবশ্যই আলাদা আলাদা বাক্যখণ্ড তৈরি করে। যেমন, 'সে খেয়ে গাইবে' এখানে 'সে খাবে' ও 'সে গাইবে' - এই দুটি বাক্যখণ্ড আছে। সহায়ক ক্রিয়া (Auxilary Verb) পৃথক বাক্যখণ্ড তৈরি করবে না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তাই বলা হয়—

"A Syntactic constitutent containing a single main verb. Technically, any part of a tree exhaustively dominated by an Srode." [Smith and Wilson : 1979 : 271]

অর্থাৎ একটি প্রধান ক্রিয়া আছে এমন আন্বয়িক উপাদানের গঠন হল—একটি বাক্যখণ্ড। বাক্য চিহ্নিত একটি গঠনে যে-কোনো অংশই বাক্যখণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, 'রাম বাড়ি যায়'—একটি বাক্যখণ্ড। আবার যদি বলা হয়—'রাম যায়', 'যায়', 'বাড়ি যায়', 'বাড়ি', 'রাম'—তাহলে এর প্রত্যেকটি বাক্যখণ্ড বলে গ্রহণ করা হবে। কথাবার্তা বলার সময় এ ধরনের বাক্যখণ্ড আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন,

কে যায় ? — রাম বা রাম যায় [= রাম বাড়ি যায়]

কোথায় যায় ?—বাড়ি যায় বা বাড়ি [= রাম বাড়ি যায়]

অর্থাৎ, যায় ক্রিয়া দ্বারা গঠিত এই আন্বয়িক গঠনটি একটি বাক্যখণ্ড।

৮.৩.১ বাক্যখণ্ড-র প্রকার

বাক্যে ব্যবহার অনুসারে দুধরনের বাক্যখণ্ড পাওয়া যায় —

১. অধীন বাক্যখণ্ড (Subordinate Clause) এবং

২. স্বাধীন বাক্যখণ্ড (Main Clause)

একটি বাক্যে এক বা একের বেশি বাক্যখণ্ড থাকতে পারে। একটি বাক্যে যদি একটিমাত্র বাক্যখণ্ড থাকে তবে সে বাক্যখণ্ড অবশ্যই স্বাধীন বাক্যখণ্ড। বাক্যে একাধিক বাক্যখণ্ড থাকলে সবগুলিই স্বাধীন বাক্যখণ্ড হতে পারে। কিন্তু সবগুলিই অধীন বাক্যখণ্ড হবে না। অন্ততপক্ষে একটি বাক্যখণ্ডকে স্বাধীন বাক্যখণ্ড হতে হবে। যে বাক্যখণ্ড একাই একটি বাক্য তৈরি করে তাকে স্বাধীন বাক্যখণ্ড বলে। একটি দীর্ঘ বাক্যে অর্থাৎ একাধিক বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্যে যে বাক্যখণ্ডটি স্বাধীন বাক্যখন্ডের ওপর নির্ভর করে তাকে অধীন বাক্যখণ্ড বলে। যেমন,

সে বলল	[স্বাধীন বাক্যখণ্ড]	=	একটি বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য।
সে বলল যে	সে যাবে না	=	একাধিক বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য।
অধীন বাক্যখণ্ড	স্বাধীন বাক্যখণ্ড		

সে বলল এবং	সে গাইল	=	একাধিক বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য।
স্বাধীন বাক্যখণ্ড	স্বাধীন বাক্যখণ্ড		

৮.৩.২ গঠন অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

গঠন অনুসারে বাক্যগুলিকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ফ্লোর আর্টস ও জন আর্টস এই তিনটি শ্রেণিকে নিম্নলিখিত রূপে দেখান [Flor Aarts & Jan Aarts, 1982,, English Syntactic Structures. pp., 79-98]।

১. সমাপিকা বাক্যখণ্ড (Finite Clause)

২. অসমাপিকা বাক্যখণ্ড (Non-finite Clause)

৩. ক্রিয়াহীন বাক্যখণ্ড (Verbless Clause)

এক এক করে এই বাক্যখণ্ডগুলির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

সমাপিকা বাক্যখন্ডে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। যেমন, আমি জানি। সে গান গাইছে। তারা গেল। সে তাকে দেখল। ইত্যাদি।

অ-সমাপিকা বাক্যখন্ডে অ-সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। বাংলা ভাষায় ইয়া>এ, ইতে>তে, ইলে>লে জাতীয় অসমাপিকা ব্যবহৃত হবে। যেমন,

সে কাজটা করে [করিয়া > করে] খেতে গেল।

আমি ধমকাতে [ধমকাইতে > ধমকাতে] সে থামল।

সে ওখানে গেলে [যাইলে > গেলে] আমি নিশ্চিত হলাম।

ক্রিয়াহীন বাক্যখন্ডে কোনো ক্রিয়ারূপ (Verb form) ব্যবহৃত হয় না। এখানে 'হয়' ক্রিয়ার বিলোপন ঘটে থাকে। যেমন—

তুমি চালাক = তুমি হও চালাক

মূল ক্রিয়ারূপটিও বাদ যেতে পারে। নীচের উদাহরণে 'রয়েছে' জাতীয় ক্রিয়াপদের বিলোপন ঘটেছে।

বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত আর লোকেরা খেলা দেখায় মগ্ন।

একটি বাক্য অনেক সময় বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ হয়ে যায়। ক্রিয়াপদটি তখন ক্রিয়াবিশেষ্য পরিণত হয়।

তার গান গাওয়া সে পছন্দ করল না। [গা + আ = গাওয়া (ক্রিয়া বিশেষ্য)] শেষেরটি ক্রিয়াহীন বাক্যখণ্ড-র অন্তর্গত না রেখে আমরা বাক্যখণ্ডর চতুর্থ একটি শ্রেণি তৈরি করতে পারি। ফলে গঠন অনুসারে চার ধরনের বাক্যখণ্ড পাব। এগুলি হল—

১. সমাপিকা বাক্যখণ্ড ২. অসমাপিকা বাক্যখণ্ড ৩. ক্রিয়াহীন বাক্যখণ্ড এবং ৪. বিশেষ্যধর্মী বাক্যখণ্ড

৮.৩.৩ বাক্যে ভূমিকা অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

বাক্যের মধ্যে বাক্যখণ্ডগুলির ভূমিকা অনুসারে নানা শ্রেণি হতে পারে বলে ফ্লোর আর্টস ও জন আর্টস [1982] জানিয়েছেন। বাংলা বাক্যখণ্ডগুলি এই নানা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে দেখানো হল।

ক. **কর্তাধর্মীখণ্ড** (Subject Clause) সমাপিকা, অসমাপিকা যে-কোনো ধরনের বাক্যখণ্ডই কর্তাধর্মী বাক্যখণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যথা,

বিছানায় বসে খাওয়া আমার দু চোখের বিষ।

এখানে অসমাপিকা বাক্যখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. **মুখ্য কর্ম-খণ্ড** (Direct Object Clause) — মুখ্য কর্মকে গুরুত্ব দিচ্ছে এই ধরনের বাক্যখণ্ড সমাপিকা, অসমাপিকা উভয় প্রকারেরই হতে পারে। সমাপিকা বাক্যখণ্ড যথা—

তার বাবা পন্ডিত জানতাম না।

গ. গৌণ-কর্মখণ্ড (Indirect Object Clause) — গৌণ কর্মখণ্ড সমাপিকা-অসমাপিকা উভয়ই হতে পারে। যথা,

যে যায় তাকে সে ধমকায়।

এখানে ব্যবহৃত গৌণকর্মখণ্ডটি সমাপিকা ক্রিয়ার।

ঘ. **হিতসাধনমূলক কর্মখণ্ড** (Benefactive Objective)— কোনো কিছু উপকার করার বিষয় এখানে থাকে। যেমন,

যে খায় তাকে খেতে দাও।

এই জাতীয় কর্মখণ্ড সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে থাকে।

ঙ. **কর্তার বিশেষক-খণ্ড** (Subject attribute clause)—সমাপিকা-অসমাপিকা উভয় প্রকার বাক্যখণ্ডই কর্তার বিশেষক খণ্ড হতে পারে। যথা—

খুব চালাক চতুর লোকটা এখানে আসবে।

চ. **কর্মর বিশেষক খণ্ড** (Object attribute clause)— কর্মকে বিশেষিত করে। সমাপিকা-অসমাপিকা উভয় ধরনের বাক্যখণ্ডই হতে পারে।

ছ. **বিধেয়-পুরকখণ্ড** (Predicator complement clause) — বিধেয় পূরক বাক্যখণ্ড হিসাবে যে বাক্যখণ্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তুমি কি কিছু মনে করবে যদি এখন খেতি বসি !

এ ধরনের বাক্যখণ্ড সমাপিকা-অসমাপিকা উভয় প্রকারের-ই হতে পারে।

জ. **ক্রিয়া বিশেষণ খণ্ড** (Adverbial Clause)— ক্রিয়াবিশেষণ খণ্ড সমাপিকা, অসমাপিকা এবং ক্রিয়াহীন—এই তিন ধরনেরই হতে পারে। যেমন—

যদি এটা সে বিশ্বাস করে তবে সে পাগল।

বাংলা ভাষায় মোটামুটি এই আট ধরনের বাক্যখণ্ড হতে পারে।

৮.৪ উদ্দেশ্য - বিধেয় সংগঠন

৮.৪.১ উদ্দেশ্য

প্রথানুসারী ভাষাবিজ্ঞানে একটি বাক্যকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়। একটি হল উদ্দেশ্য (subject) অন্যটি হল বিধেয় (Predicate)। উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানে নানা ধরনের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। আর সেই সংজ্ঞা থেকে প্রধান কতকগুলি দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় এমন ভাব প্রকাশক শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বাক্যের উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন, 'সে এখানে আসবে না'—এই বাক্যে 'সে' হল উদ্দেশ্য। আবার 'এ দিকের ঘরে বসে থাকা ওই লম্বা-

রোগা-কালো ধূর্ত লোকটা কথা বলছে' বাক্যে 'এ দিকের ঘরে বসে থাকা ওই লম্বা-বোকা কালো ধূর্ত লোকটা' হল উদ্দেশ্য।

ট্রাস্ক (Trask) উদ্দেশ্য বলতে একধরনের ব্যাকরণগত সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "In English, the subject is usually (not always) the first noun phrase in the sentence, and it is the only noun phrase the vdrb ever agrees with (English does not have much agreement, of course)." [Trask, 1997, A Students Dictionary of Language and Linguistics, p. 211]" ইংরেজি ভাষায় সাধারণত বাক্যের প্রথম বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছকে উদ্দেশ্য বলা হয়। সবসময়ে যে প্রথম বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ হবে এমন নয়। বাক্যে এটিই একমাত্র বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ যার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সাযুজ্য (agreement) আছে। অবশ্য ইংরেজি ভাষায় খুব বেশি সাযুজ্য সব জায়গায় নেই—একথাও ঠিক। ট্রাস্ক উদ্দেশ্যকে আন্বয়িক গঠন হিসেবে দেখেছেন। এবং বলেছেন, "Like all grammatical relations, subject is identified by its grammatical behaviour, not by its meaning, and it is not true that a subject necessairly represents the doen of an action." [Ibid]

অর্থাৎ বাক্যের ব্যাকরণগত আচরণ বা কাজ দিয়ে 'উদ্দেশ্য' বোঝা যায়। অর্থ অনুসারে উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। কোনো কাজ যে করছে তাকে বা সেই কর্তাকে উদ্দেশ্য বলা হবে—এমনটা সব সময় ঘটে না। যেমন, 'এই নোংরা জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া উচিত' বাক্যের উদ্দেশ্য হল 'এই নোংরা জিনিসপত্র'। বাক্যের উদ্দেশ্য পদ কোনো কাজ করছে না। সুতরাং বাক্যের ব্যাকরণগত আচরণ অনুসারে এটি উদ্দেশ্য কোনো কাজ করছে না। সুতরাং বাক্যের ব্যাকরণগত আচরণ অনুসারে এটি উদ্দেশ্যপদ। অর্থগত ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৮.৪.২ বিধেয়

উদ্দেশ্য পদের মতো বিধেয় পদেরও অজস্র সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলা যায়। বাক্য সম্বন্ধে যা উক্ত হয় সেই ভাবজ্ঞাপক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ হল—বিধেয়।

আবার, কর্তা সম্বন্ধে বিবৃতিকে বিধেয় বলা হয়।

যেমন, 'আমি এখানে থাকব না' বাক্যের কর্তা হল—'আমি' আর সে সম্পর্কে বিবৃতি হল—'এখানে থাকবো না।' সুতরাং এটি হল বিধেয়।

একটি ক্রিয়াপদ নিয়ে গঠিত বিধেয় হল - সরল বিধেয়। যেমন, 'এ বাড়ির লোকেরা যাবে' 'যাবে' এই একটি মাত্র ক্রিয়াপদ নিয়েই বিধেয়টি গঠিত। তাই এটি সরল বিধেয়।

ক্রিয়া এবং অন্যপদের সমবায়ে গঠিত বিধেয় পদকে পূর্ণ বিধেয় বলে। যেমন, 'এ বাড়ির লোকেরা বনে যাবে।' এখানে 'বনে যাবে' পূর্ণ বিধয়। একাধিক সম্পূরক, সম্পূরক বিশেষক প্রভৃতি যুক্ত হয়ে পূর্ণ বিধেয় জটিল রূপ নিতে পারে। যেমন,

'সে আজ সকালে সবাই যখন ঘরে শীতে কাঁপছে তখন সেই ঘন কুয়াশা মাখা অন্ধকার, ভিজে স্যাঁতসেঁতে রাস্তার ওপর দিয়ে আপমনমনে গান গাইতে গাইতে লাল সূর্য দেখার আশায় হেঁটে যাচ্ছিলো।'

এখানে 'সে' হল উদ্দেশ্য। আর বাকি সব অংশটাই হল বিধেয়।

ট্রাস্ক বিধেয় বলতে বাক্যের গঠনকে বুঝিয়েছেন। অর্থকে নয়। ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছকে তিনি বিধেয় হিসাবে দেখান। [Trask, 1997, p-174]

প্রথাগত উদ্দেশ্য-বিধেয় ধারণাকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা। আর প্রথাগত সংজ্ঞায় যখন অর্থকে জোরে দেওয়া হয়েছে এঁরা তখন জোর দিয়েছেন গঠনকে বা পদ ভূমিকাকে।

চমস্কি (Noam A. Chomsky) প্রবর্তিত সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব গ্রহণ করে এই উদ্দেশ্য বিধেয় ভাগটি তাঁরা দেখেছেন। চমস্কির সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি। এখানে আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে উদ্দেশ্য বিধেয় গঠনটি বোঝবার জন্য একটি রেখাচিত্র দেওয়া হল।

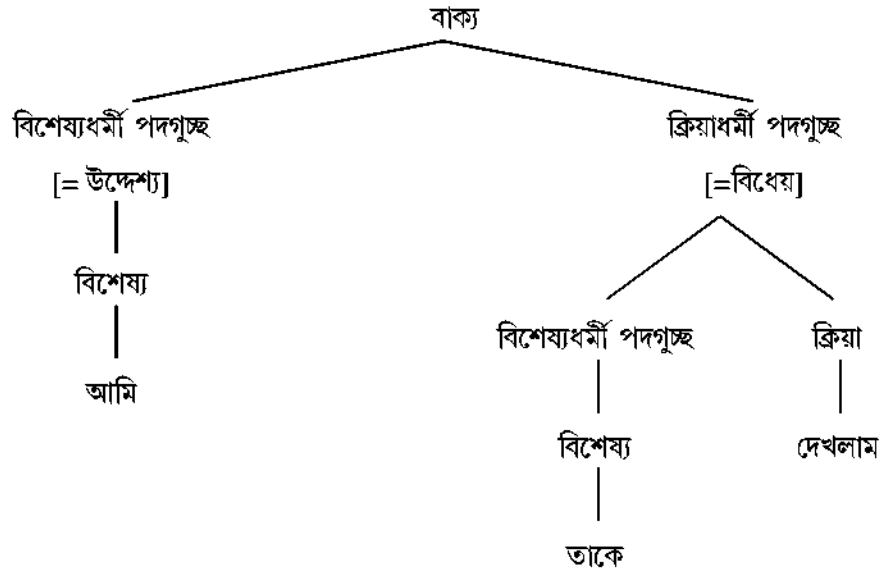

এভাবেই আমরা দেখতে পাই — গঠন অনুসারে উদ্দেশ্য হলো বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ। আর বিধেয় হল — ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে অবশ্য উদ্দেশ্য-বিধেয় গঠন-এর থেকে গুরুত্ব দেওয়া হলো পদগুচ্ছ গঠনকে। পদগুচ্ছ গঠন নিয়ে আমরা সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

৮.৫ সম্পূরক

ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করবার জন্য যে পদ বা পদগুচ্ছ ব্যবহার করা হয় তাকে সম্পূরক (Complement) বলা হয়। যেমন, 'লোকটা বুদ্ধিমান'—এ বাক্যে বুদ্ধিমান বিশেষণটি বাক্যের কর্তাকে বিশেষিত করছে তাই এটি বিধেয় বিশেষণ বা বিশেষণীয় সম্পূরক। আরো উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে,

ছেলেটা খুব একটা চালাক চতুর নয়।

ভদ্রমহিলাটি একজন সবজি বিক্রেতা

শেষ উদাহরণটিতে 'একজন সবজিবিক্রেতা' বিশেষ্যপদটি বাক্যের কর্তাকে নির্দেশ করছে। তাই এটি কর্তা সম্পূরক।

৮.৫.১ সম্পূরক বাক্যখণ্ড

যে বাক্যখণ্ড শব্দ দিয়ে ব্যাকরণগত একটি গঠন তৈরি করে তাকে সম্পূরক বাক্যখণ্ড (Complement Clause) বলে। সম্পূরক বাক্যখণ্ডকে সম্পূরক বাক্যও বলা হয়। স্মিথ ও উইলসন বলেন,

"When the Subject, direct object or other NP constitutent of a sentence is itself a sentence, as in :

That he kissed her made Mary think she was beautifyl.

it is referred to as a sentential complement." [Smith & Wilson : 1979, Modern linguistics, p. 272]

অর্থাৎ, যখন কোনও বাক্যের কর্তা, মুখ্য কর্ম বা অন্য কোনো বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ একটি বাক্যখণ্ড বা বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে সম্পূরক বাক্যখণ্ড বাক্য বলা হয়। যেমন, ইংরেজি উদাহরণটিতে 'That he kisser her' এবং 'She was beautiful' সম্পূরক বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা বাক্য যথা, হাসান হোসেন, যাঁরা একদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলেন তাঁদের কথা আজ বলব। এখানে, 'যাঁরা একদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিল তাঁদের' সম্পূরক বাক্য।

৮.৫.২ বাক্য যোজক

সম্পূরক বাক্যখণ্ড বা বাক্য যে শব্দ দিয়ে যুক্ত করা হয় তাকে বাক্যযোজক (Complementizer) বলে। ইংরেজি ভাষায় that, whether প্রভৃতি শব্দ সম্পূরক বাক্যখণ্ডকে যুক্ত করে। যেমন,

I don't know whether Susie can drive.

বাংলা ভাষায় যে, যেমন, যেমনটা, যখন, যাবো, ভাবা, যার-তার, যখন-তখন, যে-সে প্রভৃতি শব্দ, প্রতিনির্দেশক ব্যবহার করে সম্পূরক কাব্যখণ্ড যুক্ত করা হয়। যেমন,

ওই লোকটা যে কাল এসেছিল চলে গেছে।

এই জামাটা যেমন জামা তুমি সচরাচর পরোনা কাল কিনে এনেছি।

আজ সকালে যখন সূর্য উঠেছে তখন বৃষ্টির কথা না বলাই ভালো।

৮.৬ কারক বিভক্তি

ভারতীয় ব্যাকরণে কারককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কারক কে অনেকে রূপতত্ত্বের অন্তর্গত করতে চান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারকের আলোচনা অন্বয়তত্ত্বের মধ্যে হওয়াই সঙ্গত। সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক বলতে বোঝানো হয়েছে 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্‌বা' অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে পদের সম্পর্ক বা অন্বয়কে কারক বলে। ইংরেজি ব্যাকরণে পাওয়া যায় Case-এর কথা। Case বলতে বোঝায়

"Specific syntactic relation between nouns (and nominal groups) and other sentence constitutents." [Robins, R. H. 1964 (1989), General Linguistics, p. 230)

ভাষাবিজ্ঞানে পদের সঙ্গে পদের আন্বয়িক সম্পর্ক বা পদের ব্যাকরণগত কাজকে বা ভূমিকাকে কারক বলা হয়।

প্রথানুসারী ব্যাকরণে রূপতত্ত্বগত কারক বলতে বিভক্তি শ্রেণি অর্থাৎ যার দ্বারা কারক চিহ্নিত হয় তাকেই বোঝায়। কারক-বিভক্তি সাধারণভাবে বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এক এক ভাষায় এক এক সংখ্যক কারক। যেমন, প্রাচীন সংস্কৃতে কারক ছিল ৭টি। প্রাচীন গ্রিসে ছিল ৫টি কারক। প্রাচীন ফরাসিতে দুটি। লাতিনে ৭টি। রুশ ভাষায় ১০টি। হাঙ্গেরির ভাষায় ছিল ১৮টি।

রূপতত্ত্বগত কারক অর্থাৎ বিভক্তি চিহ্ন দ্বারা নির্ধারক কারক নানা শ্রেণিতে হতে পারে। ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগুলিতে কারক অনেকটা নিম্নরূপ আচরণ বা ভূমিকা পালন করে।

ক. কর্তৃ (Nominative)	ঃ	ব্যাকরণগত কর্তা
খ. কর্ম (Accusative)	ঃ	মুখ্য কর্ম
গ. সম্প্রদান (Dative)	ঃ	গৌণ কর্ম
ঘ. করণ (Instrumental)	ঃ	উপায়
ঙ. সম্বন্ধ (Genetive)	ঃ	নাম পদের সঙ্গে যুক্ত

এই ভূমিকাগুলির একটির ওপর আরেকটি চাপতে পারে। যেমন রুশ ও সংস্কৃত ভাষাতে করণ কারকে কর্তাকেও চিহ্নিত করতে পারে। ভূমিকা বা আচরণের এই মিশে যাওয়াকে Syncretism বলে।

প্রথানুসারী বাংলা ব্যাকরণে ছটি কারকের কথা বলা হয়েছে। কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। সম্বন্ধকে কারক বলা হয়নি। পদ বলা হয়েছে। কর্ম ও সম্প্রদান-এর বিভক্তিগত পার্থক্য নেই। তাই বলা হয়েছে সাধারণভাবে দিলে হবে কর্ম কারক। যেমন রামকে দাও। আর নিঃস্বার্থভাবে দিলে হবে সম্প্রদান কারক। যেমন ভিখারিকে বস্ত্র দাও। ব্যাকরণগত আচরণ না দেখে মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কারকের শ্রেণি নির্ণয় করা সঙ্গত নয়। তাই সম্প্রদান কারক নামক পৃথক একটি শ্রেণিতে আমরা গ্রহণ করব না।

বাংলা ভাষায় করণ এবং অপাদান কারকের কোনো বিভক্তি চিহ্ন নেই। অনুসর্গ যোগ করে এই দুটি কারক তৈরি করা হয়। তাই এই দুটি শ্রেণিকে গ্রহণ করা হয় না। আর ভাষাবিজ্ঞানীগণ চারটি কারককে স্বীকার করেন। এগুলি হল—কর্তৃ, কর্ম, করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে ড. পবিত্র সরকার বিভক্তি এবং অনুসর্গ উভয়কেই গ্রহণ করতে চান কারক-চিহ্ন (Case Marker) হিসাবে। আর কারকচিহ্ন না থাকায় কর্তৃকারককে মূল ধরে তিন ভাবে কারক গঠিত হচ্ছে বলে জানান।

ক. বিভক্তি যোগ। রামকে, ঘরের, জীবনে ইত্যাদি।

খ. অনুসর্গ যোগ। গাছ থেকে, ঘর হতে ইত্যাদি।

গ. বিভক্তি অনুসর্গ যোগ। তাকে দিয়ে, তোর দ্বারা ইত্যাদি

এভাবে তিনি কর্ম, সম্বন্ধ, অধিকরণ, অপাদান এবং করণ—এই পাঁচটি কারককে গ্রহণ করেছেন [সরকার, বহু বচন পত্রিকা, ১৯৯৮, পৃ-৯৬]

অন্তর্নিহিত কারক সব ভাষাতেই আছে বলেই মনে করনে অ্যান্ডারসন [Anderson, 1971, The

Grammar of Case, pp. 19]। তিনি জানান বাক্যর অধোগঠনে (Deep Structure) থাকে শব্দার্থতত্ত্বগত প্রকাশ। কারক সম্পর্কিত ধারণা সেখান থেকেই গ্রহণ করা হয়। বাংলা ভাষার কারকগুলি এখানে এক এক করে আলোচনা করা হবে।

ক. কারক-চিহ্ন হীন।

কর্তৃকারক

কারক-চিহ্ন ব্যবহৃত না হলেও অর্থগত দিক দিয়ে এটি কারক। একে আন্বয়িক কারকের অন্তর্গত করা যেতে পারে। কারণ, কাজ বা আচরণ বা ভূমিকা যিনি পালন করছেন তিনিই বাক্যের কর্তা। কর্তায় শূন্য বিভক্তি বলা যায়। কিন্তু শূন্য বিভক্তি বলে কোনো বিভক্তি নেই। সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তি বাংলা ভাষায় লোপ পেয়েছে এরকম ধারণা করা সঙ্গত নয়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে কর্তৃকারক কারকচিহ্নহীন আন্বয়িক কারক হিসাবে দেখাই যুক্তিসংগত। অনির্দিষ্ট কর্তায় কারক চিহ্ন আছে। যেমন, লোকে বলে। পাখিতে খেয়েছে। এই বিভক্তিগুলি হল-এ (-য়ে, য়), -(এ) তে বিভক্তি।

খ. কারক-চিহ্ন যুক্ত।

কর্মকারক।

পরেশচন্দ্র মজুমদার জানান যে মুখ্য কর্ম কারকও বিভক্তিহীন। গৌণ কর্ম বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত। বিভক্তিহীন রূপই কিন্তু কর্মকারকের - অচেতন - চেতন নির্বিশেষে সমস্ত মুখ্যকর্মের প্রকৃতরূপ।

[পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৯৩, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯২]

মুখ্যকর্ম - বিভক্তিহীন। সে বই কিনবে। তুমি মাছ কুটবে।

অবশ্য নির্দেশক প্রত্যয় যোগ করে তারপর বিভক্তি যোগ হতে পারে। যথা—তুমি মাছটাকে ভেজে আবার মশলা দেবে। গৌণ কর্ম বিভক্তি যুক্ত। আমি তোমাকে বলব না। সে ভিখারিকে পয়সা দেবে।

সম্বন্ধ কারক।

সম্বন্ধ কারক না বলে সম্বন্ধ পদ বলা হত। ক্রিয়ার সঙ্গে এই পদের অন্বয় তৈরি হয় না বলেই সম্বন্ধ পদকে কারকের অন্তর্গত করতে চাননি অনেকে। ভাষাবিজ্ঞানে পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই সম্বন্ধ বিভক্তি - 'র' বা '-এর' যোগ করে সম্বন্ধ কারক তৈরি করা হয়। যেমন, রাম-এর ভাই যাবে। সম্বন্ধকারক বাক্যে পৌনপুনিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

রাম-এর ভাই-এর বন্ধু-র ছেলের সঙ্গে দেখা হল।

অধিকরণ কারক।

স্থান, কাল, পাত্র প্রভৃতি অবস্থান বোঝাতে অধিকরণ কারক হয়। এর বিভক্তি হল - 'এ', 'তে'। সে ঘরে এলো। বনেতে বাসা বেঁধেছে সে। গাছেতে সে বসে ছিল।

গ. কারক-চিহ্ন হিসাবে অনুসর্গ ব্যবহার।

অপাদান কারক

সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চমী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বাংলায় হতে (হইতে), থেকে (থাকিয়া), প্রভৃতি অনুসর্গ যোগ করা হয়। কোনও পূর্ব অবস্থান বোঝাতে অপাদান কারক হয়। যথা, গাছ থেকে সে নেমে এল। ঘর হতে বেরোল।

ঘ. কারক-চিহ্ন হিসাবে বিভক্তি + অনুসর্গ যোগ করা।

করণ কারক

দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গ যোগ করে করণ কারক হয়। আর সেই অনুসর্গ যোগ করার সময় বিশেষ্য পদটিতে '-র' বা '-কে' বিভক্তি যোগ করতে হয়। যথা,

তার দ্বারা কাজটি হবে না। তোকে দিয়ে এসব হবে কি? '-কে' বিভক্তি যোগ করলে তা প্রযোজক হয়ে যায়।

'বিভক্তি + অনুসর্গ' আরও কিছু ক্ষেত্রে যোগ হয়। যেমন—

তার চেয়ে সে ভালো। আমার থেকে কিসে ভালো?

এ ধরনের সম্পর্ককে অপাদান কারক বলাই ভালো। ফলে, অপাদানকারক দুভাবে গঠিত হতে পারে। আবার আমার জন্যে আসতে চাইছে। রামবাবুর জন্যেই এইসব গণ্ডগোল বাঁধল।

একে নিমিত্ত কারক বলা প্রয়োজন।

নদীর মধ্যে সে সাঁতরে গিয়েছিল। জালের মধ্যে মাছ নেই।

অবস্থান বোঝাতে অধিকরণ কারক হওয়াই সংগত।

ক্রিয়াবিশেষ্যর সঙ্গে কারক আবার যুক্ত হতে পারে। যথা,

যাওয়ার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। ওখানে যাওয়াটাকে সে মেনে নেয়নি। গান গাওয়াতে বাধা পড়ল। সে চলে যাওয়াতে তার খুব ক্ষতি হল।

এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারকের বিভক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সেই বিভক্তি অনুসারে সবসময়ে সেই কারকের অর্থ প্রকাশ করছে না।

পবিত্র সরকার এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, বাংলা ব্যাকরণে একই বিভক্তি বা প্রত্যয়কে নানা বিচিত্র কাজে লাগানো হয়। বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানীরা একে বাংলা ব্যাকরণের economy বা সাশ্রয় কোটা বলে মনে করেছেন [পবিত্র সরকার, ১৯৯৮]।

কারক চিহ্ন হিসাবে বিভক্তি ও অনুসর্গ উভয়ই ব্যবহার করা যায় একথা বলাই ভালো! আমরা দেখলাম কোনও একটি কারকে একই রকম কারক-চিহ্ন যে ব্যবহৃত হবেই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৮.৭ সারাংশ

প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয়গত কয়েকটি দিক দিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। একটি বাক্যখণ্ড দিয়ে একটি ছোটো বাক্য তৈরি হয়। একটিমাত্র প্রধান ক্রিয়াযুক্ত আন্বয়িক গঠনকে বাক্যখণ্ড বলা হয়। ব্যবহার অনুসারে অধীন ও স্বাধীন এই দু প্রকারের বাক্যখণ্ড পাওয়া যায়। গঠন অনুসারে ও ভূমিকা অনুসারে আরো নানা ধরনের বাক্যখণ্ড পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় যুক্ত গঠনকে বাক্য বলা হয়। বর্তমানে উদ্দেশ্য বিধেয় সংগঠনের থেকে পদগুচ্ছ সংগঠনকে গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার জন্য যে পদগুচ্ছ ব্যবহার করা হয় তাকে সম্পূরক বলে। সম্পূরক বাক্যখণ্ড বা বাক্য যে শব্দ দিয়ে যুক্ত করা হয় তাকে বাক্যযোজক বলা হয়। বাংলা ভাষায় যে, যেমন, যখন ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্যযোজক ব্যবহৃত হয়।

কারক বিভক্তি নিয়ে ভারতীয় এবং লাটিন উভয় প্রকার ব্যাকরণের মডেল বাংলা ব্যাকরণে অনুসরণ করবার চেষ্টা হয়েছে। ফলে নানা জটিলতা কারক-বিভক্তিকে কেন্দ্র করে অবস্থিত। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে কারকতত্ত্ব নামক একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে পবিত্র সরকার বিভক্তি-অনুসর্গ ইত্যাদিকে কারক চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এবং কারক চিহ্ন অনুসারে তিন ধরনের কারকের কথা বলেছেন—বিভক্তিযোগ, অনুসর্গযোগ এবং বিভক্তি + অনুসর্গ যোগ। আমরা এর সঙ্গে কারক চিহ্নহীন কর্তৃপক্ষকেও যুক্ত করব।

৮.৮ অনুশীলনী

১. সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. বাক্যখণ্ড-র প্রকার খ. বাক্যখণ্ডর গঠনগত শ্রেণি গ. উদ্দেশ্য ঘ. বিধেয় ঙ. সম্পূরক বাক্যখণ্ড চ. বাক্য যোজক ছ. কারক চিহ্ন হিসাবে বিভক্তি যুক্ত কারক জ. কারক চিহ্ন হিসাবে অনুসর্গযুক্ত কারক।

২. বাক্যখণ্ড কাকে বলে ? বাংলা বাক্যখণ্ডর বিভিন্ন প্রকার গঠন নিয়ে আলোচনা করুন।

৩. ব্যবহার অনুসারে, গঠন অনুসারে এবং ভূমিকা অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বাক্যখণ্ড নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. উদ্দেশ্য বিধেয় সংগঠনের গুরুত্ব কোথায় আলোচনা করুন।

৫. সম্পূরক কাকে বলে ? সম্পূরক বাক্যখণ্ড ও বাক্য যোজক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. কারক কাকে বলে ? বাংলা কারকগুলির পরিচয় দিন।

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন।

চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, ১৯৪৮, ব্যাবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ১৯৭৫, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা ১৯৪২, ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।

মজুমদার পরেশচন্দ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম), সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

ঐ ২য় খণ্ড ঐ

একক ৯ ❐ প্রথানুযায়ী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকার

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ বাক্যের গঠন

৯.৩.১ মৌলিক গঠন ঃ মৌলিক বাক্য

৯.৩.২ অ-মৌলিক গঠন ঃ অ-মৌলিক বাক্য

৯.৩.৩ সংযোগধর্মী বাক্য

৯.৩.৪ আশ্রয়ধর্মী বাক্য

৯.৪ বাক্যের প্রকার

৯.৪.১ প্রশ্নবোধক বাক্য

৯.৪.২ নঞর্থক বাক্য

৯.৫ সারাংশ

৯.৬ অনুশীলনী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করলে জানতে পারবেন—

- বাংলা বাক্যের গঠনগত ও প্রকারগত নানা দিক জানা যাবে।
- গঠনের দিক দিয়ে মৌলিক ও অমৌলিক বিন্যাসটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে।
- বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে তার নির্মাণ করি সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।
- কথার সঙ্গে আমাদের উচ্চারণে যে নানাবিধ সুর ও ঝোঁক যুক্ত হয়ে বক্তব্যকে বদলে দেয় সে ধারণা তৈরি হবে।
- প্রথানুসারী ব্যাকরণের ধারণাকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত করা যায় সেদিকটিও বোঝা যাবে।

৯.২ প্রস্তাবনা

বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকাশ বিষয়ক আলোচনা এই এককে করা হবে। যখন আমরা কথা বলি তখন শুনতে পাই অনর্গল ধ্বনিস্রোত। আর আমাদের ধারণায় সেই ধ্বনিগুলির মিলিত রূপ শব্দ হয়। শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে তৈরি হয় বাক্য। সেই বাক্য জুড়ে জুড়ে এক দীর্ঘ বাক্য বা বাচন। বাক্য গঠনের পাশাপাশি বাক্যের বক্তব্যগত দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাক্যের মাধ্যমেই ভাবনা-চিন্তা বা বক্তব্য প্রকাশ পায়। সেই বক্তব্য বিষয়কে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে তার নানাধরনের প্রকাশগত দিক। বাক্যের গঠনে নেই সেই দিকগুলি নেয়। যেমন যদি কোনো নেতি বাচক বক্তব্য প্রকাশ করতে যাই তাহলে সেই ধরনের শব্দ কিংবা বলার ভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে। এই এককে সেই বিষয়েই আলোচনা করা হবে।

৯.৩ বাক্যের গঠন

হুমায়ুন আজাদ 'বাক্যতত্ত্ব' গ্রন্থে বাক্যের গঠনগত শ্রেণিকে আধার ভিত্তিক শ্রেণি হিসাবে দেখিয়েছেন। সাধারণভাবে গঠন অনুসারে বাক্য তিন ধরনের। সরল, যৌগিক ও মিশ্র।

১. সরলবাক্য (Simple Sentence)

একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় যুক্ত বাক্যকে সরল বাক্য বলা হয়। কখনো কখনো একটি বাক্যখণ্ড যদি পূর্ণভাব প্রকাশ করে তবে সেই বাক্যখণ্ড নিয়ে গঠিত বাক্যকে সরলবাক্য বলা হয়। আবার যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্যখণ্ড থাকে এবং কোনো অধীন বাক্যখণ্ড থাকে না তাকে সরলবাক্য বলে। ইত্যাদি নানা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রাম স্কুলে যায়। আমি থাকব না। সে এখানে এসেছিল ইত্যাদি বাক্য সরলবাক্য।

২. যৌগিকবাক্য (Compound Sentence)

যৌগিক বাক্যের নানা ধরনের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যথা, যে বাক্যে দুটি বা ততোধিক প্রধান বাক্যখণ্ড থাকে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। কিম্বা, যৌগিক বাক্যে দুটি বা তার বেশি স্বাধীন বক্তব্য থাকে। অথবা, যৌগিক বাক্য হচ্ছে দুটি বা তার বেশি স্বাধীন বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য। এতে কোন অধীন বাক্যখণ্ড থাকে না। যেমন, ভোলা স্কুলে যাবে এবং অঙ্কের ক্লাস করবে। তুমি আসবে আর সে চেঁচাবে।

৩. মিশ্র বা জটিল বাক্য (Complex Sentence)

মিশ্র (Complex) বাক্য সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানে নানাবিধ সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন, যে বাক্যে একটি বা একটির বেশি বিশেষণীয় বাক্যখণ্ড, ক্রিয়াবিশেষণীয় বাক্যখণ্ড বা বিশেষ্য বাক্যখণ্ড থাকে তাকে মিশ্র বাক্য বলে। কিংবা, দুই বা ততোধিক বাক্য খণ্ডের মিলিতভাব, যার মধ্যে একটি ভাব প্রধান ভাব আর অন্যগুলি অধীন বা আশ্রিতভাব প্রকাশ করে এমন শব্দগুচ্ছ হল—মিশ্রবাক্য। আবার, যে বাক্যে একটি প্রধান ও এক বা একের অধিক অপ্রধান বাক্যখণ্ড থাকে তাকে মিশ্র বাক্য বলে। যেমন, রাম বাড়ি এসে হাসানকে নিয়ে লাইব্রেরি যাবে।

৪. যৌগিক-মিশ্র বাক্য (Compound-Complex Sentence)

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী যৌগিক-মিশ্র (Compound-Complex) নামক একটি গঠনের কথা বলেছেন। দুই বা ততোযিধক স্বাধীন একক যুক্ত হলে যৌগিক-মিশ্র বাক্য হয়। যেমন, তারা এল এবং দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। অনেক ভাষাবিজ্ঞানী যৌগিক-মিশ্র বাক্যকে পৃথক একটি শ্রেণি হিসাবে স্বীকার করেননি।

৯.৩.১ মৌলিক গঠন ঃ মৌলিক বাক্য

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে আমরা চার ধরনের বাক্য পাই তা আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্য গঠনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। গঠন বিচারে বাক্যের অর্থ বা ভাব-প্রকাশ লক্ষ করা বিশেষ জরুরি নয়। সে কারণে, সরল, যৌগিক, জটিল বা মিশ্র, যৌগিক-মিশ্র এ ধরনের নামকরণ না করে গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণ করা সংগত বলে মনে করা উচিত।

সরলবাক্য যাকে বলা হয় তার মধ্যে গঠনগত বৈশিষ্ট্য যা দেখা যায় — তা হল

- ❒ একটিমাত্র বাক্যখন্ড যুক্ত বাক্য-ই সরলবাক্য।
- ❒ সমাপিকা ক্রিয়া একটি থাকতে পারে না-ও থাকতে পারে।
- ❒ এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে।

গঠন বিচারে মৌলিক একটি উপাদান অর্থাৎ একটিমাত্র বাক্যখন্ড নিয়ে গঠিত এই বাক্যকে সরলবাক্য না বলে মৌলিকবাক্য বলা উচিত [উদয় কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন]।

- ❒ মৌলিকবাক্য গঠিত হবে একটিমাত্র বাক্যখণ্ড নিয়ে।
- ❒ সেই বাক্যখণ্ডটি গঠিত হবে দুটি পদগুচ্ছ দিয়ে। বিশেষ্যধর্মী ও ক্রিয়াধর্মী এই দুটি পদগুচ্ছের মধ্যে অন্যকোনো বাক্যখণ্ড থাকবে না।

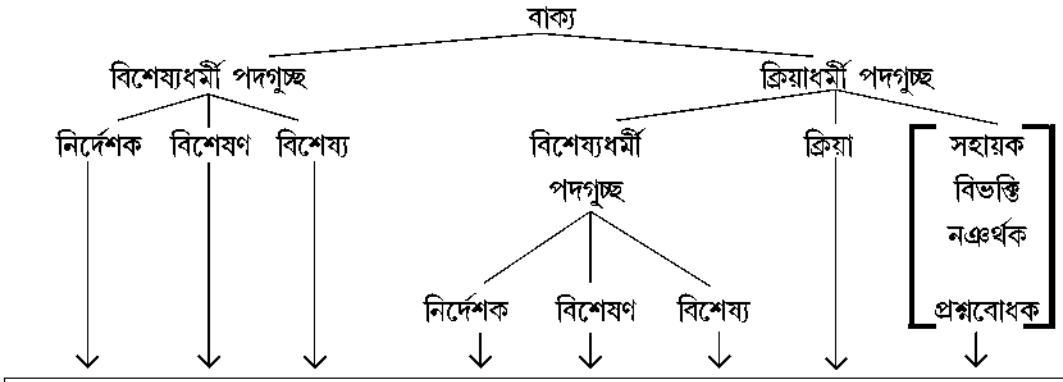

ঐ	অসুস্থ	লোকটা	এই	ভাঙা	গাড়িতে	যাবে	কি ?
ঐ		লোক	এই	ভাঙা	গাড়িতে	যাবে	কি ?
ঐ	অসুস্থ	লোক	এই		গাড়িতে	যাবে	কি ?
ঐ		লোকটা	এই		গাড়িতে	যাবে	
		লোকটা	এই		গাড়িতে	যাবে	
		লোকটা			গাড়িতে	যাবে	
		লোকটা			গাড়িতে	যাবে	কি ?
		লোকটা				যাবে	
						যাবে	কি ?

এই উদাহরণগুলির সবকটি মৌলিক বাক্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

৯.৩.২ অ-মৌলিক গঠন ঃ অ-মৌলিক বাক্য

একের বেশি বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্যকে অ-মৌলিক বাক্য বলা হবে। প্রচলিত ব্যাকরণের যৌগিক বাক্য, মিশ্র বাক্য, যৌগিক-মিশ্র বাক্য সবই অ-মৌলিক বাক্য হিসাবে বিবেচিত হবে। অ-মৌলিক বাক্য দু-ধরনের।

ক. সংযোগধর্মী বাক্য। যথা— সে এল আর চলে গেল। আমি বইটা নিলাম এবং বইটা ফেরত দিলাম।

খ. আশ্রয়ধর্মী বাক্য। যথা—সে এসে তারপর চলে গেল। আমি বইটা নিয়ে পরে বইটা ফেরত দিলাম।

সংযোগধর্মী বাক্য এবং আশ্রয়ধর্মী বাক্য নিয়ে এবার আমরা এক এক করে আলোচনা করব।

৯.৩.৩ সংযোগধর্মী বাক্য

"দুটি বা ততোধিক প্রধান বাক্যখণ্ড সংযুক্ত হলে, বাক্যটি সংজোযক অ-মৌলিক বাক্য (Co-ordination poly clause structure) হবে।" [উদয় কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯২, ২০৯]

বাক্য সংযোগমূলকতা প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়।

ক. কথা বলার সময় বিরতি বা থামা আর লেখার ক্ষেত্রে কমা [,], সেমিকোলন [;] প্রভৃতি বিরতি চিহ্ন ব্যবহার করে। যথা—রাম আজ এসেছে, কাল চলে যাবে। সে বলে গেল, চলে গেল না।

খ. যোজক হিসাবে সমুচ্চয়ী অব্যয় অর্থাৎ সংযোজক অব্যয়ও বিয়োজক অব্যয় ব্যবহার করে। যথা, রাম আজ এসেছে এবং কাল চলে যাবে। সে বলে গেল কিন্তু চলে গেল না।

এবং, আর, ও, সেজন্য, কাজেই, অতএব, সুতরাং, কিন্তু, বরং প্রভৃতি অব্যয় সংজোযক অব্যয়। আর বিয়োজক অব্যয় হল—কিংবা, অন্যথা, অথবা, নতুবা, নচেৎ, নয়তো বিনা বা প্রভৃতি অব্যয়। অর্থগত বৈচিত্র্য অনুসারে সমুচ্চয়ী অব্যয় সংযোজক বাক্যের অর্থটি বৈচিত্র্যপূর্ণ করে। যেমন—

১. যোজনামূলক। বাক্যখণ্ডগুলির বক্তব্য জুড়ে আছে। যথা—ও, এবং, তাই। সে যাবে এবং সে খাবে।

২. নিষেধমূলক। বাক্যখণ্ডগুলি জুড়েছে কিন্তু বক্তব্যকে নিষেধ করছে। যথা—বরং, কিন্তু, সুতরাং, অতএব...। সে যাবে সুতরাং তোমার যাবার দরকার নেই।

৩. অগ্রাধিকারমূলক। একটি বাক্যখণ্ডর বক্তব্যের তুলনায় অন্য বাক্যখণ্ডর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যথা—নতুবা, অন্যথা, নয়তো, নচেৎ...। তুমি এখানে যাবে নয়তো সে দুঃখ পাবে।

৪. সমনির্বাচনমূলক। দুটি বা ততোধিক বক্তব্য-র যে-কোনো একটি বেছে নেওয়া। যথা—বা কিংবা...। সে থাকবে কিংবা যাবে। আমরা কথা বলব বা তারা কথা বলবে।

পদগুচ্ছ গঠন অনুসারে সংযোগমূলক বাক্যগঠনটি এই ধরনের হবে—

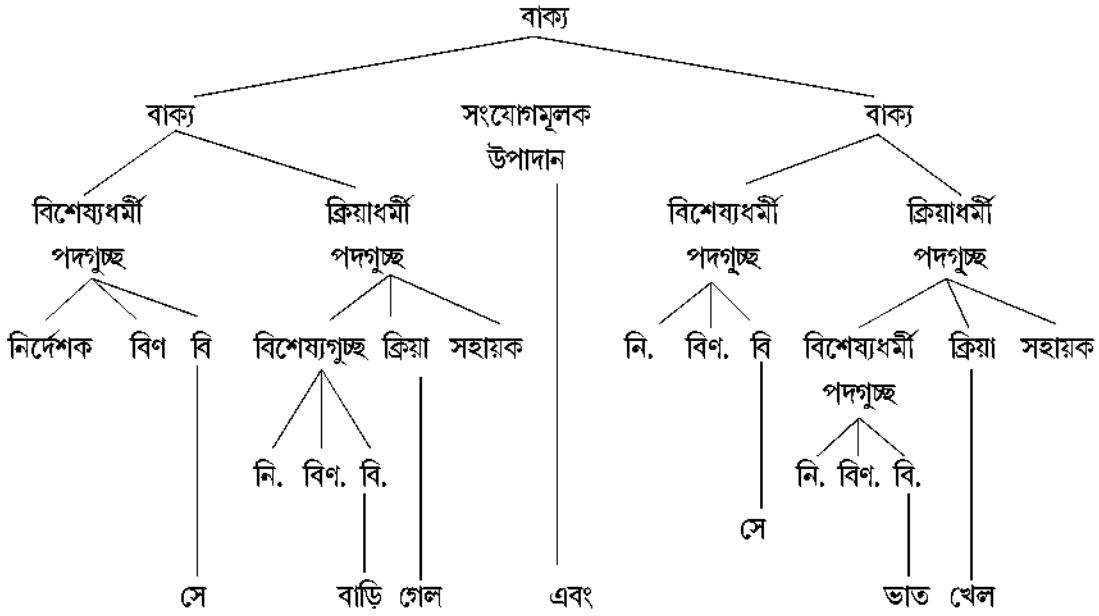

৯.৩.৪ আশ্রয়ধর্মী বাক্য

যে বাক্যে এক বা একাধিক প্রধান বাক্যখণ্ড থাকে এবং অন্যান্য বাক্যখণ্ড তার অধীনে থেকে আশ্রয়মূলকতা স্বীকার করে তাকে আশ্রয়মূলক অ-মৌলিক বাক্য বলে। যেমন, সে থাকবে বলে আমি যাইনি। নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে বাক্যে আশ্রয়মূলকতা আনা হয়। যেমন,

১. একটি বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকায় পরিণত করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য তৈরি করা হয়। যথা—বাক্য-১ রহিম বাড়ি যাবে। বাক্য-২ রহিম পড়তে বসবে। এই দুটি বাক্য জুড়ে আশ্রয়মূলক বাক্য হবে— যাবে > গিয়ে। রহিম বাড়ি গিয়ে পড়তে বসবে।

২. বলে জাতীয় অসমাপিকা, সমাপিকা ক্রিয়া র পর যুক্ত করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য গঠন করা যায়। যেমন, সে যাবে বলে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছে। সে করবে বলে একমাস ধরে তাকে খুঁজছি।

৩. সমাপিকা ক্রিয়ার পর 'যে', 'যখন', 'যেমন' জাতীয় শব্দ যোগ করে আশ্রয়মূলক বাক্য গঠন করা হয়। যথা, সে ভাবল যে এত আলো কোথায় গেল। সে বলল যখন সবাই চুপ করে গেছে।

৪. প্রতিনির্দেশক [যেমন...তেমন, যখন...তখন, যে...সে ইত্যাদি] যোগ করে আশ্রয়মূলক বাক্য তৈরি করা হয়। যথা, নাসিয়া যদি গান গায় তবে আমি গান গাইব। আমি যেখানে যাব, তুমিও সেখানে সেখানে যাবে।

আশ্রয়ধর্মী বাক্যের অধীন বাক্যখণ্ডগুলি প্রধান বাক্যখণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হতে চায়। ফলে, এই ধরনের বাক্যের গঠন নিম্নরূপ।

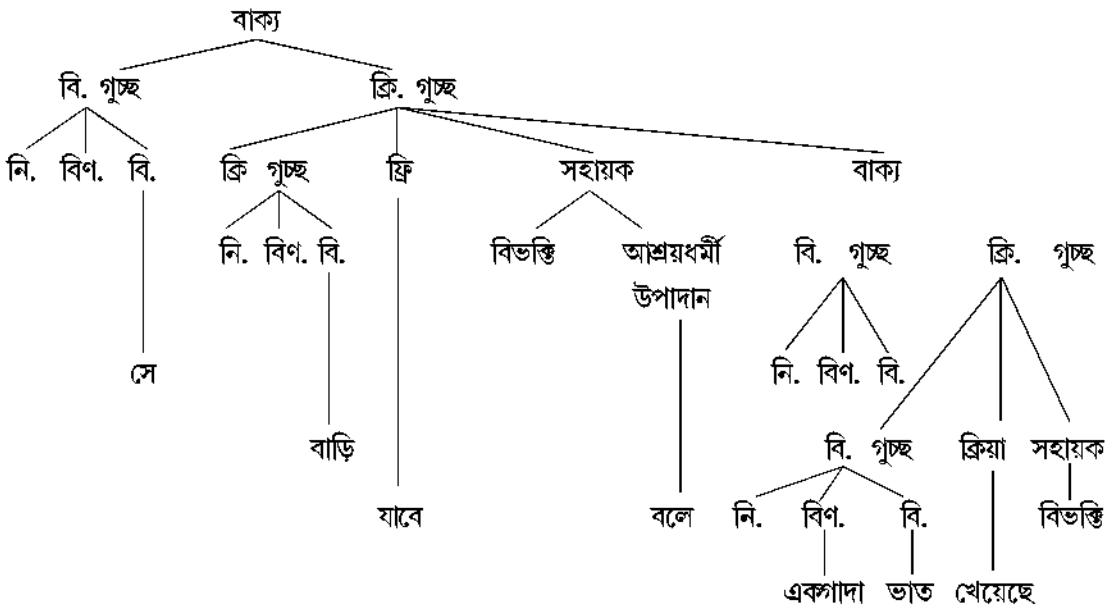

৯.৪ বাক্যের প্রকার

বাক্যের ভূমিকা বা ক্রিয়া (function) অনুসারে বাক্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়। প্রকৃতি অনুসারে বাক্য চার ধরনের।

ক. উক্তি বা বিবৃতি (statement) মূলক বাক্য। যথা— সে এখানে এসেছিল।

খ. আবেগসূচক (exclamatory) বাক্য। যথা—ইস্! কি বিশ্রি দিনটা!

গ. আদেশ অনুজ্ঞাবাচক (command-wish) বাক্য। যথা — ওখানে যাও।

ঘ. প্রশ্নসূচক (Interrogative) বাক্য। ওখানে কী যাবে?

আবার অস্তিবাচক নেতিবাচক অনুসারে সদর্থক বাক্য ও নঞর্থক বাক্য এই দু ধরনের বাক্য হয়। একটি রেখাচিত্রে এগুলি দেখা যেতে পারে।

বাক্যের প্রকার		
সদর্থক	উক্তি বা বিবৃতিমূলক (Statement) আবেগসূচক (Exclamatory) আদেশ অনুজ্ঞাবাচক (Command-Wish) প্রশ্নসূচক (Interrogative)	নঞর্থক

এই চার প্রকারের বাক্য সদর্থক, নঞর্থক উভয়ই হতে পারে। ফলে, বাংলা ভাষায় মোট আট প্রকারের বাক্য পাওয়া যায়।

অনেকে আবেগসূচক বাক্যকে পৃথক শ্রেণিতে রাখতে চান না। আবার অনেকে বিবৃতি সূচক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ হিসাবে দাঁড়ি বা ফুলস্টপ বসে গেলে এ দুটিকে একই শ্রেণিতে রাখতে চান না। হুমায়ুন আজাদ বাক্যতত্ত্ব গ্রন্থে বিবৃতি-প্রশ্ন-অনুজ্ঞা-আবেগকে শ্রেণিকরণের মানদণ্ড ধরতে চান নি। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে এই শ্রেণিকরণ আমাদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। কারণ, বাক্যের অর্থ নয়, বাক্যগুলির পদগত বিন্যাস বা গঠন থেকেই বাক্যের প্রকৃতি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আদেশ-অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের অধিধ্বনি (Suprasegment) আর বিবৃতিমূলক বাক্যের অধিধ্বনি এক নয়। মনে রাখতে হবে, ভাষাবিশ্লেষণ মুখের ভাষাকে নিয়েই করা হয় তাই দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি লেখার চিহ্নকে গুরুত্ব দেব না। বরং আমাদের উচ্চারণে প্রকাশিত সুর-ঝোঁক-স্বরের ওঠানামা প্রভৃতি বিষয় বাক্যের প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্ব পাবে।

ক. উক্তি বা বিবৃতিমূলক বাক্য।

বিভিন্ন সময় ভাষাবিজ্ঞানীগণ যে-সব মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তার ভিত্তিতে বলা যায় কোন ঘটনা বা মত প্রকাশ কিংবা দৃঢ় বিবৃতি দেওয়া অথবা সত্য ঘটনাকে বিবৃত করা বা পেশ করা হয় যে বাক্যের মাধ্যমে তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। লেখার ক্ষেত্রে এই বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা ফুলস্টপ বসে। এর সঙ্গে আর একটি বিষয় যুক্ত করা যায়, যে বাক্য বলার সময় সুর বাক্যের শেষে উপরে উঠবে না কিম্বা আদিতে খুব বেশি ঝোঁক পড়ে না অর্থাৎ আগাগোড়া বাক্যটি প্রায় সমান্তরাল বা সামান্য কম বেশি সুর ও ঝোঁক অর্থাৎ অধিধ্বনি ব্যবহার করে উচ্চারিত হয় থাকে তাকে উক্তি বা বিবৃতি মূলক বাক্য বলা হবে। [উদয় কুমার চক্রবর্তী]। যেমন,

খ. আবেগ সূচক বাক্য

বিস্ময় বা আবেগ সূচক বাক্য তীব্র অনুভূতি প্রকাশ করে।

তীব্র অনুভূতি চিৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

আবেগসূচক বাক্য চিৎকার প্রকাশ করে। আদেশ, ইচ্ছা, বাসনা জাগায়। আর সাধারণত বাক্যের শেষে বিস্ময় চিহ্ন বসে।

আবেগসূচক শব্দ যুক্ত হতে পারে। যথা হায়, দশা, ছি ছি ইত্যাদি।

বিস্ময়সূচক বাক্যে কোনো ঘটনা, বিষয় বা বাস্তব কিংবা মনোভাব সম্পর্কে নানা অনুভূতি ও আবেগ বাক্য বিন্যাস ও অধিধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এখানে সুরের টেম্পো (Tempo) বা দ্রুতি অন্য প্রকারের বাক্যের থেকে আলাদা। আবেগ অনুসারে কখনো দ্রুত বা শ্লথ। সুরন্যাসের (Intonation) ক্ষেত্রে স্বর আবেগ বা বিস্ময়ের বিষয় অনুসারে উপরে উঠে যায়। স্বাভাবিকের থেকে বেশি ঝোঁক ব্যবহৃত হয়। [উদয় কুমার চক্রবর্তী]। যথা,

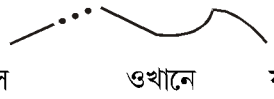

'সে'-র ওপর ঝোঁক কম। 'ওখানে'-তে সুর অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। 'যাবে'-তে ওপর থেকে নেমে আসছে।

গ. আদেশ-অনুজ্ঞাবাচক বাক্য।

আদেশ, অনুরোধ, অভিশাপ জ্ঞাপন করে।

আদেশ, অনুরোধ, অভিশাপ সাধারণত মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা, কখনো কখনো প্রথম পুরুষের অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া দিয়ে বোঝানো হয়। যথা,

ওখানে যাও [মধ্যম পুরুষ]

ভগবান তোমার ভালো করুন [প্রথম পুরুষ]

অধিধ্বনি ব্যবহার অন্যান্য প্রকার বাক্যের থেকে আলাদা। আদেশ-এর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়বে। অভিশাপ বাচক শব্দের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়বে। অনুরোধবাচক শব্দটির সুর প্রলম্বিত হবে [উদয় কুমার চক্রবর্তী]।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উপাদান ব্যবহার এবং অধিধ্বনি ব্যবহারগত দিক দিয়ে এই তিন প্রকারের বাক্য আলাদা রূপ নিচ্ছে। প্রশ্নবোধক বাক্যও আলাদা। এবং নঞর্থক বাক্যও অনেক সময় নেতিবাচক শব্দ ছাড়াই অধিধ্বনিগত বৈচিত্র্য অনুসারে আলাদা হয়ে যায়।

৯.৪.১ প্রশ্নবোধক বাক্য

কোনও প্রশ্ন করতে গেলে তা নানাভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

ক. কেবলমাত্র ইঙ্গিতের দ্বারা। একে প্রায়-ভাষা বলে। যেমন, ভ্রু তুলে মাথাটা একবার নীচু থেকে উঁচুর দিকে তোলা।

খ. ইঙ্গিতের সঙ্গে ধ্বনি উচ্চারণ করে। উ, এ্যাঁ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে ইঙ্গিত যুক্ত করে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

গ. প্রশ্নসূচক ধ্বনি বা বাক্য ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয়। এই তৃতীয় প্রকার প্রশ্ন অর্থাৎ প্রশ্নবাক্য নিয়ে আলোচনা করব।

১. প্রশ্নবোধক উপাদানহীন।

প্রশ্নবোধক উপাদান ব্যবহার না করে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানতে চাওয়া হয় অনেক সময়। যেমন, ঘটনাটা জানতে চাই। যা জানো বলো। কিন্তু এগুলি যথাযথ প্রশ্নবাক্য নয়।

২. অধিধ্বনি ব্যবহার করে।

স্বরভঙ্গি দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্য তৈরি হয়। শ্বাসগত, সুর, প্রভৃতি ব্যবহার করে বিবৃতিধর্মী বাক্যকেই প্রশ্নবাক্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন,

সে ওখানে যাবে।

'ও'-র ওপর শ্বাসাঘাত পড়ছে। 'যাবে' একটু টেনে বলা হচ্ছে। আর 'বে'-তে সুর ওপর উঠে যাচ্ছে। শ্বাসাঘাত, সুরন্যাস, দ্রুতি প্রভৃতি অধিধ্বনির মাধ্যমে বিবৃতিধর্মী বাক্য থেকে প্রশ্নবাক্যকে আলাদা করে নেওয়া যায়।

৩. হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন।

উত্তরে হ্যাঁ কিংবা না বলা হয় এমন প্রশ্নবাক্যকে বলা হবে 'হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন'। পবিত্র সরকার আমাদের জানান যে, এর তৃতীয় একটি বিকল্প আছে। সেটি হল পাল্টা প্রশ্ন করা। যেমন,

প্রশ্ন — তুমি যাবে ?

উত্তর — প্রথম বিকল্প - হ্যাঁ

দ্বিতীয় বিকল্প - না

তৃতীয় বিকল্প - তুমি কি যাবে ?

ইয়েসপার্সেন (Jespersen) একে retorted question বলেছেন। আর হ্যাঁ-না সূচক প্রশ্নকে Philosophy of Languages (1924) গ্রন্থে Nexus Question বলেছেন। ইংরেজিতে এই হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নবাক্যকে Simple Interrogative Question বলা হয়।

বাংলায় হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নের দুটি উপাদান। শব্দগত (lenical) ও অধিধ্বনিগত (Suprasegmental)।

শব্দগত — তুমি কি যাবে ? এখানে কি প্রশ্নবাচক শব্দ।

অধিধ্বনিগত — তুমি যাবে ? এখানে অধিধ্বনিই প্রশ্ন তৈরি করছে।

হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নে সাধারণভাবে 'কি' অব্যয় ব্যবহৃত হয়। তার নির্দিষ্ট স্থান বাক্যের শেষে। পবিত্র সরকার সজীব কর্তার পরই 'কি' বসে বলে জানান। [প্রশ্ন ও বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্যের গঠন, ১৯৮৬]। কিন্তু সঞ্জননী তত্ত্ব অনুসারে অব্যয় 'কি'-র অবস্থান সহায়ক অংশে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর কর্তার পর যে 'কি' পাওয়া যায় সাধারণভাবে সেটি সর্বনাম। যেমন,

তুমি খাবে কি ? খাওয়া নিয়ে হ্যাঁ-না প্রশ্ন।

তুমি কি খাবে ? খাওয়া বস্তু নিয়ে বস্তুগত প্রশ্ন।

কর্তা অজীব হলে 'কি' স্থান, সময় ইত্যাদি জ্ঞাপক শব্দের পরে বসবে। যথা,

বাড়িতে কি খুব লোকজন ? সকালে কি বৃষ্টি হচ্ছিল ?

শব্দ যুগলের মাঝখানে 'কি' বসতে পারে না। যথা,

তোর পক্ষে কি কাজটা সহজ। [তোর পক্ষে কি কাজটা সহজ ?]

৪. লগ্ন প্রশ্ন (Tag Question)।

লগ্ন প্রশ্ন বা লেজুড় প্রশ্ন (পবিত্র সরকার) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। অনেকটা সমর্থন আদায়ের জন্য এই ধরনের লগ্ন প্রশ্ন তৈরি করা হয়। যেমন,

সে খুব ভালো, তাই না ? তুমি যেতে চাও, তাই তো ? এবার বৃষ্টি হয়নি, তাহলে ? সে এখনও এলো

না, তবে ? তো, তবে, তাহলে ইত্যাদি অনেক সময় ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে বলে প্রশ্ন তৈরি করে। যথা, লেকাটা গেল শেষপর্যন্ত ? তুমি থাকছ তাহলে ?

৫. বস্তুগত প্রশ্ন।

কোনো বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কিংবা কোনো তথ্য বা খবর জানতে চাইলে এই জাতীয় বস্তুগত প্রশ্ন করা হয়। বস্তুগত ও হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন 'ক' প্রশ্ন। অর্থাৎ 'ক' আদ্যধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দ দিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। বাংলা ভাষায় অজস্র রকমের 'ক' প্রশ্ন আছে। বচন ভেদে তার নানা রূপ আছে। এখানে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া হল—

একবচন — কে, কী, কাকে, কখন, কবে, কোন্, কোথায় ইত্যাদি।

বহুবচন — সমষ্টিবাচক — কারা, কোনগুলো, কাদের ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক — কে কে, কী কী, কাকে কাকে, কখন কখন, কবে কবে, কোন্ কোন্, কোথায় কোথায় ইত্যাদি।

এখানে প্রশ্নবাচক 'ক' প্রশ্ন শব্দ এবং পদের ভূমিকা উদাহরণ সহ দেখানো হল। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য পবিত্র সরকার রচিত 'প্রশ্ন ও বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্যের গঠন' (১৯৮৪, প্রমা) প্রবন্ধটি।

'ক' প্রশ্ন শব্দ	পদভূমিকা	উদাহরণ
কে, কোন্	কর্তা বিষয়ে প্রশ্ন	কোন লোকটা এসেছে
কী কর্	ক্রিয়া বিষয়ে প্রশ্ন	কী করছো ?
কাকে	মুখ্য কর্ম বিষয়ে প্রশ্ন	কাকে চাই ?
কখন, কবে, কতক্ষণ...	কাল বিষয়ে প্রশ্ন	কখন যাবে ?
কোথায়, যাই, কোথা থেকে..	স্থান বিষয়ে প্রশ্ন	কোথেকে আসছো ?
কাকে, কোন-কে	গৌণ কর্ম বিষয়ে প্রশ্ন	কোন লোককে চাও ?
কেমন, কী-রকম, কোন ধরনের	গুণ বাচক বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	কেমন ধারা লোক সে ?
ক-টা, ক-খানা, কতজন	সংখ্যা বাচক বিশেষ্য বিষয়ে প্রশ্ন	কতগুলো বই দরকার ?
কত(টা), কতখানি, ক...	পরিণাম বাচক বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	ক গেলাস জল খাবে ?
কার, কোন - (বিশেষ্য)-এর...	সম্বন্ধবাচক বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	কোন হিসাবে একথা বললে ?
কেন, কী কারণে, কী হেতু...	ক্রিয়া বিশেষণ বিষয়ে প্রশ্ন	কোন হিসাবে একথা
কীভাবে, কী দিয়ে, কেমন করে..	ক্রিয়ার ধরন বিষয়ে প্রশ্ন	কীরকমে যাবে।
কাকে দিয়ে, কার দ্বারা, কার সাহায্যে	ক্রিয়ার নিজস্ত কর্তা বিষয়ে প্রশ্ন	কার সাহায্যে সে গেল ?
কার	বিশেষ্যর সম্বন্ধ বিষয়ে প্রশ্ন	এটা কার জামা ?

৯.৪.২ নঞর্থক বাক্য

নানাভাবে নেতিবাচক প্রকাশ হতে পারে। যেমন,

ক. আকার-ইঙ্গিত অর্থাৎ প্রায় ভাষা ব্যবহার করে। যেমন, দুপাশে ঘাড় নেড়ে বা হাত নেড়ে না বোঝান হয়।

খ. প্রায় ভাষা ও কথা মিলিত ভাবে। হাত নাড়াবে সঙ্গে মুখেও 'না' বলা।

গ. কথা বলে।

১. নেতিবাচক শব্দহীন নঞর্থক বাক্য।

ক. কথা বলার সময় নেতিবাচক নয় এমন শব্দ ব্যবহার করে বা একধরনের কোনো শব্দ ব্যবহার না করে ও নঞর্থক বাক্য তৈরি হতে পারে। যেমন, অনিচ্ছা বোঝাতে 'উঁহু' জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা বা 'কচু' ঘণ্টা জাতীয় শব্দ যোগ করা। যেমন, এতে আমার ঘণ্টা হবে।

খ. 'মরতে' জাতীয় ক্রিয়াপদ, 'খামোখা', 'মিছিমিছি' জাতীয় ক্রিয়াবিশেষণ, ভালো, মন্ত, ভারী জাতীয় বিশেষণ, 'বয়ে গেছে', 'দায় পড়েছে', জাতীয় ইডিয়ম ব্যবহার করে নেতিবাচক বাক্য তৈরি করা হয়। যথা,

মরতে এলে কেন ?

মিছিমিছি খাটছো।

এসবে আমার বয়ে গেছে।

গ. প্রশ্নবাক্য, বিস্ময়সূচক বাক্য, প্রতিস্পর্ধী বাক্য ব্যবহার করেও নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করা হয়। যথা,

কিসের দরকার ? [= দরকার নেই] প্রশ্নবাক্য

আপনি তো মশাই খুব গেলেন ! [= গেলেন না] বিস্ময়সূচক বাক্য

দেখাবো এসো কি করেছো - [= করো নি] প্রতিস্পর্ধী বাক্য

ঘ. নেতিবাচক শব্দযুক্ত নঞর্থক বাক্য

উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি প্রভৃতি যোগ করে শব্দকে নেতিবাচক করা হয়। যেমন, হা-ভাতে, বিয়োগ, নাজেহাল ইত্যাদি। এগুলি বাক্যকে নেতিবাচক করে না। নেতিবাচক উপাদান হিসাবে নঞর্থক অব্যয় ও নঞর্থক ক্রিয়া পাওয়া যায়।

ক. না - নি।

ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে বাক্যে 'না' ব্যবহৃত হয়। যথা — আমি না। বইটা না। ইত্যাদি। আগের ক্রিয়াপদটি লোপ পায়। যে-কোনো কালে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া বিশেষণ 'নি'-র আগের ক্রিয়াপদটি লোপ পাবে না। যেমন, দেখি নি। বলি নি। কেবলমাত্র অতীতকালে নি ব্যবহৃত হয়। 'নি' টি পূর্ববর্তী ক্রিয়ার অতীত কালকে বোঝায়।

সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে 'না' বসে। যথা,

সমাপিকা ক্রিয়া	+	না	+	অসমাপিকা ক্রিয়া	+	সমাপিকা ক্রিয়া
		না	বসে			এসেছেন
দেখল		না				

'না' ও 'নি' ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে লক্ষ করা যেতে পারে।

'না' ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য	'নি' ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য
১. যে-কোনো কাল বা প্রকারের পর না বসে। যাই না ও যাচ্ছি না।	১. অতীতবাচক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নি বসে। দেখি নি। বলি নি।
২. ক্রিয়ার রূপমত পরিবর্তন হয় না।	২. 'নি'-আগে ক্রিয়ায় নিত্য বর্তমান রূপ গ্রহণ করে।
৩. ক্রিয়ার কালগত কোনো বোধ তৈরি করে না।	৩. ক্রিয়ার কালগত বোধ তৈরি হয়।
৪. হ্যাঁ-না প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।	৪. হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তর হয় না।
৫. একাই একটি বাক্য হতে পারে।	৫. একাই একটি বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।
৬. অসমাপিকার আগে বসে। কখনো সমাপিকার আগে বসতে পারে।	৬. অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসতে পারে না।
৭. কোথাও কোনও [ক্রি+অতীত+না] দেখা যায়। এটা আর বললাম না।	৭. বাক্যের প্রথমে বসে না।

বিভিন্ন পক্ষে (= পুরুষ বা Person) হবে বা 'না', 'নি' ব্যবহৃত হয়। যেমন,

যাই না যাই নি

যাও না, যাও নি

'না' বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে ব্যবহৃত হয়। 'নি' কেবলমাত্র অতীতকালে ব্যবহৃত হয়। বাক্যে নানাস্থানে 'না' বসে। নানারকম তার ভূমিকা। যেমন,

১. কর্ম-র ভূমিকা। তুমি না বলবে না।

২. ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে বসছে। বলবে না।

৩. অসমাপিকার আগে বসছে। না বলে এসেছি।

৪. হ্যাঁ-না প্রশ্নের উত্তর হিসাবে এক বা একাধিক না বসতে পারে। খাবে কি ?—না না না খাবো না।

৫. লগ্ন প্রশ্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়। সে খুব ভালো তাই না ?

৬. যৌগিক ক্রিয়াপদে উভয় ক্রিয়ার মাঝখানে বসতে পারে। কেঁদে ফেলা। সে কেঁদে না ফেলে।

৭. 'বরং' জাতীয় অর্থ বা নির্বাচনের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে 'না' বসে। না হয় একটু কথাই শুনলে।

৮. আলঙ্কারিক 'না' ব্যবহৃত হয়। হোক না ক্ষতি।

৯. বেশি মাত্রায় আলঙ্কারিক 'না' মুদ্রাদোষে হয়ে যায়। সে না আজ না কি কথাটা না বলল।

১০. অনেকক্ষেত্রে 'না'-র অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে। এগুলি সাধারণত নির্বাচনমূলক অর্থ প্রকাশ করে। যদি না-চাও তবে চলে যাচ্ছি। চাও-এর আগে না বসবে। পরে বসবে না।

খ. নয়।

নঞর্থক 'নয়' ক্রিয়া আসলে 'হয়' ক্রিয়ার নেতিবাচক রূপ। 'নয়' ক্রিয়া কোনো কিছু হওয়া বা অস্তিত্ব, অবস্থা, পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়কে অস্বীকার করে। 'নয়' ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থান বাক্যের শেষে। পথ অনুসারে এর রূপান্তর ঘটে। যথা,

বক্তা পক্ষ — নই

শ্রোতা পক্ষ (সাধারণ) নও

শ্রোতা পক্ষ (নৈকট্যবাচক) - নোস্

ভিন্ন পক্ষ, সাধারণ - নয়

সম্মানবাচক পক্ষ - নন

কোনও স্বভাব বা প্রকৃতি বোঝাতে নয় ক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ভাতটা গরম নয়। তুমি তেমন দাতা নও। সে ঠান্ডা নয়।

গ. নেই।

'নেই' ক্রিয়া একরূপবদ্ধ। 'আছে'-র অস্বীকৃতি বা নিষেধ বোঝাতে 'নেই' ব্যবহার হয়। পক্ষ অনুসারে 'আছে'-র রূপগত বদল ঘটে। কিন্তু 'নেই' সবসময়ে একই রূপ নেয়। যেমন,

প্রাণীবাচক - আমি নেই। সে নেই। অপ্রাণীবাচক - বই নেই।

ঘ. নিষেধাত্মক অসমাপিকা।

নিষেধাত্মক অসমাপিকা হিসাবে 'নইলে', 'নাহলে' ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলি আরেকটি বাক্যকে জুড়ে দিয়ে আশ্রয়মূলক বাক্য তৈরি করে। যেমন,

সে এখানে থাকবে না হলে সে যাবে কোথায় ?

বাক্য সংযোগের ক্ষেত্রে 'নয়তো' এই একই কাজ করে। যেমন,

তুমি থাকবে নয়তো সে ভয় পাবে।

ঙ. প্রতিনির্দেশক ব্যবহার।

প্রতিনির্দেশক হিসাবে 'হয়-নয়', 'হয়-নয়তো', 'হয়-না-হয়', 'হয়-নচেৎ' প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এগুলি সাধারণত নির্বাচন মূলক। কোনো একটি বাছাই করার কথা বলা হয়। যেমন,

রাম হয় থাকবে নয়তো চলে যাবে।

সে হয় বলবে নয়তো বলবে না।

হয় থাকো না হয় থেকো না চলে যাও।

হয় পড়া মন দিয়ে করবে নচেৎ কোথাও যেতে পারবে না।

চ. মনোভাষা বিজ্ঞানে নেতিবাচক বাক্যর গুরুত্ব।

আধুনিককালে মনোভাষা বিজ্ঞানে নেতিবাচক বাক্য নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ইতিবাচক বাক্য বলার থেকে নেতিবাচক বাক্য বেশি সময় নেয় না কম সময় নেয় তা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা করা হয়েছে। সদর্থক বাক্যর তুলনায় নঞর্থক বাক্য আরও বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। কারণ নঞর্থক বাক্য মানে দুটি ধারণা একটি ইতিবাচক অন্যটি নেতিবাচক। ইতিবাচক ধারণাকে অস্বীকৃতি জানিয়ে তৈরি হয় নেতিবাচক বাক্য। তাই নেতিবাচক বাক্য বেশি যুক্তিপূর্ণ।

৯.৫ সারাংশ

প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকার নিয়ে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। একটি বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্যকে মৌলিক বাক্য বলব। একাধিক বাক্যখণ্ডযুক্ত বাক্যকে বলা হয় অ-মৌলিক বাক্য। অ-মৌলিক বাক্যের সব বা অধিকাংশ বাক্য প্রধান বাক্যখণ্ড হলে তাকে সংযোগধর্মী বাক্য এবং অধিকাংশ বাক্য অপ্রধান বাক্যখণ্ড হলে তাকে আশ্রয়ধর্মী বাক্য বলা হবে।

চার প্রকারের বাক্য-উক্তি বা বিবৃতিমূলক, আবেগমূলক, আদেশ অনুজ্ঞাবাচক এবং প্রশ্নবাচক বাক্য সদর্থক নঞর্থক ভেদে মোট আট ধরনের হতে পারে। প্রশ্নসূচক বা প্রশ্নবোধক বাক্য নানা ধরনের হতে পারে। প্রশ্নবোধক উপাদানহীন বা প্রশ্নবোধক উপাদান যুক্ত ইত্যাদি। এছাড়া হাঁ-না বাচক প্রশ্ন, বস্তুগত প্রশ্ন, লগ্ন প্রশ্ন, অধিধ্বনি ব্যবহার করে প্রশ্ন প্রভৃতি নানা ধরনের জানা বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক শব্দহীন নঞর্থক বাক্য এবং নেতিবাচক শব্দযুক্ত নঞর্থক বাক্য পাওয়া যায়। মনোভাষা বিজ্ঞানে নেতিবাচক বাক্য নিয়ে নানা গবেষণা করা হয়েছে।

৯.৬ অনুশীলনী

১. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. মৌলিক বাক্য, খ. সংযোগধর্মী বাক্য, গ. আশ্রয়ধর্মী বাক্য, ঘ. উক্তি বা বিবৃতিমূলক বাক্য, ঙ. আবেগমূলক বাক্য, চ. আদেশ-অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, ছ. প্রশ্নবোধক বাক্য, জ. হ্যাঁ-না প্রশ্ন, ঝ. নঞর্থক বাক্য, ঞ. লগ্ন প্রশ্ন, ট. 'না' - 'নি', ঠ. 'নয়'-নেই।

২. প্রথানুসারী ব্যাকরণে বাক্যের গঠন অনুসারে যে শ্রেণি পাওয়া যায় সেগুলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩. মৌলিক ও অ-মৌলিক বাক্য গঠন বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

৪. সংযোগধর্মী ও আশ্রয় বাক্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

৫. বাক্য কত প্রকারের এবং কী কী উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৬. প্রশ্নবোধক বাক্য কত প্রকারের হতে পারে তা নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৭. নঞর্থক বাক্যের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন।

সরকার, পবিত্র, ১৯৮৩ বাংলা ব্যাকরণে বচন ও নির্দেশক, চেনামুখ, অক্টোবর, পৃ. ৬১-৬৯।

১৯৮৬, প্রশ্ন ও বাংলা ভাষায় প্রশ্নবাক্যের গঠন, প্রথা, জুলাই-সেপ্টেম্বর।

১৯৯৮, বাংলা, রূপতত্ত্বের ভূমিকা, বহুবচন, ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১ম সংখ্যা।

একক ১০ ❐ সঞ্জীননী তত্ত্ব

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ সংবর্তনী (Transormational) সঞ্জননী (Generative) ব্যাকরণ

১০.৪ সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার (Syntactic Structure)-এর তত্ত্ব

১০.৫ চমস্কি প্রবর্তিত দ্বি-বিভাজিত তত্ত্ব

১০.৬.১ ব্যাকরণ তত্ত্ব ঃ বৈশ্বিক ব্যাকরণ, বিশেষ ব্যাকরণ

১০.৬.২ ভাষাবোধ ও ব্যবহারতত্ত্ব ঃ পারঙ্গতাবোধ, ভাষা ব্যবহার

১০.৬.৩ বাক্যগঠনগত তত্ত্ব ঃ অধোগঠন, অধিগঠন

১০.৬.৪ বাক্য ব্যবহারগত তত্ত্ব ঃ ব্যাকরণসম্মত বাক্য, গ্রহণযোগ্য বাক্য

১০.৭ চমস্কি ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্বয় তত্ত্বের অগ্রগতি

১০.৮ সারাংশ

১০.৯ অনুশীলনী

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- প্রথানুসারী ব্যাকরণ ভাবনা থেকে আধুনিক ভাবনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন বোঝা যাবে।
- প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই সঞ্জননী তত্ত্ব সারা বিশ্বের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অপরিহার্য তত্ত্ব হয়ে উঠেছে তা বোঝা যাবে।
- অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে চমস্কির গবেষণার একটি পরিচয় উপলব্ধি হবে।
- সঞ্জননী তত্ত্বের বির্বতনের দিকটিও লক্ষ্য করা যাবে।
- চমস্কির পাশাপাশি অন্যান্য নানাবিধ আন্বয়িক তত্ত্বের একটি মোটামুটি ধারণা করা যাবে।
- আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্বয়তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা উবলব্ধি করা যাবে।

১০.২ প্রস্তাবনা

প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্বের আর সঞ্জননী অন্বয়তত্ত্বের মধ্যবর্তী অংশে আছে সংগঠনতত্ত্ব (Structuralism) ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Descriptive Linguistics) তত্ত্ব। বিশ শতকের প্রথম দিকেই এই ধরনের ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা দেন ফেয়ারদিন্যা দ্য সাউসুরে (Ferdinand de Saussere)। পরবর্তীকালে বিশ শতকের তিন-এর দশক থেকে বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent) সংগঠন তত্ত্ব। ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) এই ধারণার কথা প্রথম বলেন। পরবর্তীকালে হকেট (Hockett), গ্লিসন (Glesson), হ্যারিস (Harris), কুইনে (Quine) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এই বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষণা করেন।

অব্যবহিত উপাদান সংগঠন তত্ত্বে পাশাপাশি অবস্থিত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসারে একটি করে বড়ো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করা হয়। এই টুকরোগুলি আবার পরবর্তী স্তরে আরো বড়ো টুকরো হচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত দুটি বড়ো টুকরো জুড়ে তৈরি হচ্ছে বাক্য। কথা বলার সময় সবচেয়ে ছোটো টুকরোগুলি জুড়ে জুড়েই বাক্য তৈরি হয়। পাশাপাশি অব্যবহিত সম্পর্কে অবস্থিত টুকরোগুলি যেমন জুড়ে যায় তেমনি এটি ক্রমোচ্চ স্তরভিত্তিক। তাই পরপর স্তরগুলি অব্যবহিত সম্পর্কে আবদ্ধ।

একটি উদাহরণ নিয়ে অব্যবহিত উপাদানে বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে।

<table>
<tr><td>এই</td><td>ভালো</td><td>ছেলে</td><td>টা</td><td>আজ</td><td>খুব</td><td>মন</td><td>দিয়ে</td><td>পড়ে</td><td>নি</td><td>প্রথম স্তর</td></tr>
<tr><td>এই</td><td>ভালো</td><td colspan="2">ছেলেটা</td><td>আজ</td><td>খুব</td><td colspan="2">মনদিয়ে</td><td colspan="2">পড়েনি</td><td>দ্বিতীয় স্তর</td></tr>
<tr><td>এই</td><td colspan="3">ভালো ছেলেটা</td><td>আজ</td><td colspan="3">খুব মন দিয়ে</td><td colspan="2">পড়েনি</td><td>তৃতীয় স্তর</td></tr>
<tr><td colspan="4">এই ভালো ছেলেটা</td><td>আজ</td><td colspan="3">খুব মন দিয়ে পড়েনি</td><td colspan="2"></td><td>চতুর্থ স্তর</td></tr>
<tr><td colspan="4">এই ভালো ছেলেটা</td><td colspan="6">আজ খুব মন দিয়ে পড়েনি</td><td>পঞ্চম স্তর</td></tr>
<tr><td colspan="10">এই ভালো ছেলেটা আজ খুব মন দিয়ে পড়েনি</td><td>ষষ্ঠ স্তর</td></tr>
</table>

অব্যবহিত সম্পর্কযুক্ত টুকরোগুলি ক্রমাগত স্তরে স্তরে জুড়ে বাক্যের চেহারা নিচ্ছে। টুকরোগুলির পাশাপাশি সম্পর্ক অব্যবহিত সম্পর্ক। আবার টুকরোগুলির স্তরগুলির সম্পর্কও অব্যবহিত। অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পাওয়া গিয়েছিল। আর সেখান থেকেই ব্লুমফিল্ডের ছাত্র চমস্কি (Noam Abraham Chomsky) সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন। অব্যবহিত উপাদানের সংগঠন তত্ত্বটি তাঁর ভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। আমরা এখানে চমস্কি প্রবর্তিত অন্বয়তত্ত্ব নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব।

১০.৩ সংবর্তনী (Transformational) সঞ্জননী (Generative) ব্যাকরণ

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এক নতুন চিন্তার জগৎ খুলে গেল। নোয়াম অব্রাহাম চমস্কি (১৯২৮)-ব্লুমফিল্ডের ছাত্র। তিনি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতেই প্রথমে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু গবেষণা করার সময় থেকেই তিনি ভাষাবিজ্ঞানে এক নতুন তত্ত্বের জন্ম দিলেন। সেই তত্ত্ব সঞ্জননী তত্ত্ব নামে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে এই তত্ত্ব (Generative Theory) তৈরি করলেন।

হিব্রু ভাষার রূপ-ধ্বনি (Morphophonemic) তত্ত্ব নিয়ে ১৯৫১ থেকে কাজ শুরু করেছিলেন চমস্কি। এটি তাঁর এম.এ.-র গবেষণা নিবন্ধ। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি আন্বয়িক বিশ্লেষণ আর সেই বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এই বছরই প্রকাশিত হয় 'Systems of Syntactic Analysis' প্রবন্ধটি 'Journal Symbolic Logic' পত্রিকার ১৮ সংখ্যাতে। ১৯৫৫তে 'Logical Syntax and Semantics' Language পত্রিকার ৩১ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। আন্বয়িক গঠনের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে তিনি ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। এই বছরই তাঁর পি.এইচ.ডি গবেষণা গ্রন্থ 'Transformational Analysis' রচিত হয়। এখানেই তিনি প্রথম সংবর্তন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৫৭-তে তাঁর যুগান্তকারী 'Syntactic Structure' প্রকাশিত হয়। সারা পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে এ বইটি সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কেউ বা তত্ত্বটিকে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। কেউ বা সমালোচনা করে চমস্কির তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। আবার কেউ বা উপেক্ষা করেছিলেন। পরে দেখা গেল যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই আগ্রহের সঙ্গে এই তত্ত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবুও যাঁরা সরে রইলেন তাঁরা নতুন তত্ত্বকে গ্রহণ করবার মতো ঔদার্য দেখাতে পারেননি। চমস্কি তত্ত্বের এই বিবর্তনটি এবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১০.৪ সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার-এর তত্ত্ব

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Systactic Structures' [S.S.] গ্রন্থে চমস্কি ভাষা বিশ্লেষণের প্রধান তিনটি মডেলের কথা বললেন।

ক. Finite State Grammar

খ. Phrase Structure Grammar

গ. Transfer matidual Grammar

ক. সীমাবদ্ধ অবস্থার ব্যাকরণ Finite State Grammaer-এ তিনি বললেন যে নির্দিষ্ট শব্দ ভাণ্ডার থেকে আমরা অসংখ্য বাক্য তৈরি করি। বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ যেন বিভিন্ন কক্ষে সাজানো আছে। আর আমরা আমাদের পছন্দমতো শব্দ নিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বসিয়ে বাক্য তৈরি করছি। একই ধরনের নিয়ম ব্যবহার করে অজস্র বাক্য তৈরি করছি এভাবেই।

খ. পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণ (Phrase Structure Grammaer)-এ বললেন, বাক্য আসলে পদগুচ্ছের (Phrase) গঠন। আবার বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ আর একটি ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছের মিলিত গঠন। আবার বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ তৈরি হয় নির্দেশক এর সঙ্গে বিশেষ্য যোগ করে। ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ মানে একটি ক্রিয়াপদ ও

বিশেষ্যধর্মী পদের মিলিত গঠন। আর এই প্রতিটি স্তর আবার লেখার পদ্ধতি ধরে পুনর্গঠিত হয়। অর্থাৎ বাক্যকে আবার লেখার পদ্ধতি অনুসারে লিখব — বিশেষ্যগুচ্ছ + ক্রিয়াগুচ্ছ — এইভাবে। শব্দশ্রেণি পর্যন্ত এই পুনর্লিখন ঘটতে থাকবে। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য এই পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণকে ব্যাকরণ হিসাবে রাখলেন না। একটি সূত্র বা নিয়ম হিসাবে পদগুচ্ছ সংগঠনকে গ্রহণ করলেন।

গ. সংবর্তনী ব্যাকরণ (Transformational Grammaer) — এখানে তিনি সংবর্তনের কথা বলেছেন। পদগুচ্ছ সংগঠনের নিয়ম বা সূত্র অনুসারে অজস্র মগ্ন বাক্য (Underlying String) তৈরি করার কথা বললেন। এই মগ্ন বাক্যগুলির ওপর সংবর্ধন সূত্র প্রয়োগ করে আসল বাক্যটি পাওয়া যাবে। যে বাক্য আমরা কথা বলার সময় ব্যবহার করি তা কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া মাধ্যমে জন্ম নেয়।

পদগুচ্ছ তৈরি করবার সূত্র দিয়ে বেশ কিছু বাক্যের প্রাথমিক রূপ তৈরি করা হয়। এদের তিনি নাম দেন মগ্ন বাক্য (Underlying Sentnce)। পদগুচ্ছ তৈরি করবার কক্ষটি তাই এই মগ্নবাক্য তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এরপর আছে সংবর্তন কক্ষ। বাক্যগুলির নানা অদল বদল ঘটে এখানে। এই পরিবর্তনকে সংবর্তন (Transformation) বলে। পরিবর্তন করার নিয়মগুলিকে সংবর্তন সূত্র বলে। সংবর্তন সূত্রের মাধ্যমে বীজবাক (Kernal Sentcne) পাবো। এরপর সেই বীজবাক্যটি কতকগুলি স্বনিম (Phonene) এবং রূপিমের (Morphene) মিলিত রূপ হয়ে ওঠে। তারপর তার প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশ আসলে কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণ। তাই একে বাক্যের ধ্বনিগত প্রকাশ বলা হয়। এই স্তরগুলি একটি লেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

১৯৫৭-র তত্ত্বে এই সংবর্তনী ব্যাকরণকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অবশ্য এই ব্যাকরণে শব্দার্থতত্ত্বের কথা তিনি বলেননি বা তার কোনো গুরুত্ব দেননি।

১০.৫ অ্যাসপেক্টস-এর তত্ত্ব

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে চমস্কি প্রকাশ করলেন 'Aspects of the Theory of Syntax'। আর এই গ্রন্থে ১৯৫৭ সংবর্তনী ব্যাকরণের মডেলটি একটি পরিপূর্ণ রূপ দিলেন। তিনি জানালেন যে, আমরা বাক্যগঠনের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে অসংখ্য বাক্য তৈরি করতে পারি। আর এই অসংখ্য বাক্য তৈরি করাকেই তিনি বললেন বাক্য সঞ্জনন (Generation)। যে ব্যাকরণ এই বাক্য তৈরির কথা বলে বা তার নিয়মগুলি সূত্রবদ্ধ করে সে ব্যাকরণকে বলা হয় সঞ্জননী ব্যাকরণ (Generative Grammaer)। চমস্কি জানালেন পানিনি যে ব্যাকরণ লিখছিলেন তা সঞ্জননী ব্যাকরণ। এই সঞ্জননী ব্যাকরণের পদ্ধতিগুলি তিনটি প্রধান কক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলি হল—

ক. আন্বয়িক কক্ষ

খ. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ এবং

গ. শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ

ক. আন্বয়িক কক্ষে বাক্যের কতকগুলি বিমূর্ত গঠন থাকে। বাক্য বলতে এই গঠনগত শব্দশৃঙ্খলকে বোঝায়। এই গঠনগত শব্দশৃঙ্খল আসলে কতকগুলি ধ্বনির পর পর উচ্চারিত রূপ। যেমন, সে খুব পড়বে। এখানে শব্দগুলি জুড়ে জুড়ে যে গঠনগত শৃঙ্খল তৈরি করেছে তা-ই বাক্য। আর, স্-এ-খ্-উ-ব্-প্-ও-ড়্-ব্-এ—এগুলি হল ধ্বনিশৃঙ্খল। বাক্যটির প্রকাশ এই ধ্বনিশৃঙ্খলের মাধ্যমে ঘটে।

খ. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষে আন্বয়িক সূত্রের দ্বারা গঠিত বাক্যকে আমরা পাই ধ্বনিশৃঙ্খল হিসাবে। ফলে ধ্বনিতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য এই কক্ষে থাকবে। বাক্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকটি আমরা এখানেই লক্ষ্য করব।

গ. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ বাক্যের অর্থগত দিকটি ব্যাখ্যা করবে। মনে রাখতে হবে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্বে চমস্কি শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দিলেন।

ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ ও শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যামূলক।

আন্বয়িক কক্ষ প্রত্যেক বাক্যের জন্য একটি অধোগঠন (Deep Structure) এবং একটি অধিগঠন (Surface Structure) তৈরি করে। এই অধোগঠনে থাকে শব্দার্থতত্ত্বগত ব্যাখ্যা। আর অধিগঠনে থাকে ধ্বনিতত্ত্বগত ব্যাখ্যা। ১৯৫৭ আর ১৯৬৫তে, চমস্কি বাক্যের আন্বয়িক গঠন নিয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ করলেন তা সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এই দুটি গ্রন্থে প্রকাশিত তত্ত্বের মিল আর অমিলটি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

১৯৫৭-র তত্ত্ব	১৯৬৫-র তত্ত্ব
১. শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেননি।	১. শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ আছে।
২. পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র সংবর্তন সূত্র }	২. আন্বেয়িক কশ { ভিত্তি সূত্র সংবর্তন সূত্র
৩. রূপ-স্বনিমগত সূত্র	৩. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ

১০.৬ চমস্কি প্রবর্তিত দ্বি-বিভাজিত তত্ত্ব

চমস্কি যে ধারণাগুলি সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বে দেন সেগুলিকে চারটি দ্বি-বিভাজিত তত্ত্বে দেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি তত্ত্বের দুটি অংশ। দুটি ধারণা নিয়েই তত্ত্বটি পূর্ণ রূপ পায়। এগুলি হল—

ক. ব্যাকরণতত্ত্ব।	১.	বৈশ্বিক ব্যাকরণ	(Universal Grammar) [U.G.]
	২.	বিশেষ ব্যাকরণ	(Particular Grammar) [P.G.]
খ. ভাষা বোধ ও ব্যবহারগত তত্ত্ব।	১.	পারঙ্গমতাবোধ	(Competence)
	২.	ভাষা ব্যবহার	(Performance)
গ. বাক্যগঠনগত তত্ত্ব।	১.	অধোগঠন	(Deep Structure)
	২.	অধিগঠন	(Surface Structre)
ঘ. বাক্য ব্যবহারগত তত্ত্ব।	১.	ব্যাকরণ সম্মত বাক্য	(Grammatical Sentence)
	২.	গ্রহণযোগ্য বাক্য	(Acceptance Sentence)

এই বিষয়গুলি এবার সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১০.৬.১ ব্যাকরণ তত্ত্ব

বৈশ্বিক ব্যাকরণ

সারা বিশ্বের সবরকমের ভাষার নিয়মকানুন এবং সূত্র তৈরি করার পদ্ধতি যে ব্যাকরণের মধ্যে পাবো তাকে বৈশ্বিক ব্যাকরণ (U./G.) বলব। চমস্কি মনে করেন, একটি শিশু চারপাশে কথা বলতে শুনে যে ভাষা শেখে তা সম্পূর্ণ নয়। ভাষা শেখার জন্য বংশধারাগত একটি সাহায্য সে পায়। তারই সাহায্যে স্বাভাবিক ভাষায় সম্ভব অসম্ভব সমস্ত রকম নিয়ম নিয়ে তার মস্তিষ্কে একটি বিমূর্ত ভাষা-এলাকা তৈরি হয়। এই ভাষা এলাকাতেই ভাষা শেখার কৌশল বা Language Acquisition Device বা LAD থাকে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে Language and Mind গ্রন্থে এই বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন। বৈশ্বিক ব্যাকরণের মধ্যে খোঁজা হয় ভাষার কোন্ কোন্ নিয়ম সব ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বৈশ্বিক ব্যাকরণকে চমস্কি বলেন 'initial state' অর্থাৎ ভাষা শেখার ও ব্যবহার করবার যে সন্ধি তার সূচনা পর্যায়। ভাষা শেখার ও ব্যবহার করবার প্রাথমিক নিয়মগুলি নিয়েই এই সার্বিক বা বৈশ্বিক ব্যাকরণ তৈরি হয়। সহজাত জ্ঞানের মাধ্যমে ভাষা শেখার কৌশল আয়ত্ব না করলে ভাষা শেখা সম্ভব হয় না। বৈশ্বিক ব্যাকরণের এরকম একটি সূত্র হল সাদৃশ্য বা Analogy, যা পৃথিবীর সব ভাষার শিশু ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

বিশেষ ব্যাকরণ

বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammaer) বলতে চমস্কি বুঝিয়েছেন বিশেষ ভাষার ব্যাকরণকে। যেমন, ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি ব্যাকরণ বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ। বৈশ্বিক ব্যাকরণের নিয়ম প্রাথমিকভাবে থাকলেও বিশেষ ভাষার নীতি অনুসারে প্রত্যেকটি ভাষার ব্যাকরণ আলাদা আলাদা। তাই একে বিশেষ ব্যাকরণ বলে। ধরা যাক, বাংলা ভাষারয় কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়াপদ আছে। প্রায় সব ভাষাতেই এই তিনটি পদ পাওয়া যাবে একটি সরল বাক্যে। কিন্তু বাংলা ভাষার নিয়ম অনুসারে প্রথমে কর্তা বসবে, শেষে বসবে ক্রিয়া আর মাঝখানে বসবে কর্ম। ফলে এই ভাষার, প্যাটার্ন হল—SOV প্যাটার্ন [Subject-Object-Verb]। আর ইংরেজি ভাষার প্যাটার্ন হল কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম [SVO]। বৈশ্বিক ব্যাকরণ অনুসারে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ভূমিকা মোটামুটি সবভাষাতেই এক। এগুলি দিয়েই বিমূর্ত্ত অন্বয় তৈরি হবে। সেই অন্বয় বৈশ্বিক ব্যাকরণ। আর বিষেষ ভাষা অনুসারে এদের গঠন আলাদা। বিশেষভাষার অন্বয় মূর্ত। কারণ তা প্রকৃত শব্দ দিয়েই তৈরি হয়। আবার ইংরেজি ভাষায় ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে পক্ষ অনুসারে রূপগত পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় হয়। যেমন, I/We go, You go, They go। কেবলমাত্র ভিন্ন পক্ষ একবচন হবে He goes। আর বাংলা ভাষায় — আমি/আমরা যাই, তুমি/তোমরা যাও, সে/তারা যায় ইত্যাদিকে। ভাষা অনুসারে যে ব্যাকরণ তৈরি হয় তাকেই বিশেষ ব্যাকরণ বলা হয়।

১০.৬.২ ভাষাবোধ ও ব্যবহার তত্ত্ব

পারঙ্গামতাবোধ।

চমস্কি জানান যে, ব্যাকরণ হল — মাতৃভাষা বলা, শোনা বা বোঝার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ বা মডেল। প্রত্যেক লোকের মনে মধ্যে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে মাতৃভাষা সম্পর্কে যে ধারণা থাকে সেই ধারণাকেই পারঙ্গামতাবোধ বা Competence বলে।

চমস্কি দু প্রকারের পারঙ্গামতাবোধের কথা বলেছেন।

ক. ব্যাকরণগত (Grammatical)

খ. প্রয়োগগত (Pragmatic)

ব্যাকরণগত বা ভাষাবিজ্ঞানগত পারঙ্গাতাবোধ ভাষার গঠনগত জ্ঞান প্রকাশ করে। বাক্যের গঠন ঠিকঠাক কিনা তা বোঝায় এবং বাক্যের গঠন সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করে। বাক্যের ধ্বনিগত, রূপগত, অন্বয়গত, শব্দার্থগত ধারণা এই পারঙ্গামতাবোধের মধ্যে থাকে।

প্রয়োগমূলক পারঙ্গামতাবোধের কথা প্রথম বলেন ডেল হাইমস্ (Dell Hymes) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। হাইমস্ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিককে এ ক্ষেত্রে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা যায়—ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, আদানপ্রদান ক্ষমতা এবং সংস্কৃতি জ্ঞান মিলে এই প্রয়োগমূলক পারঙ্গামতাবোধ তৈরি হয়।

এছাড়াও সাহিত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাহিত্যিক পারঙ্গামতাবোধ প্রয়োজন। কোনো কিছু বর্ণনা করার ক্ষমতা থেকে বর্ণনাগত পারঙ্গামতাবোধ তৈরি হয়। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে সমাজের নানা ধ্যানধারণা—নিয়মনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়ে তৈরি হয় সামাজিক পারঙ্গামতাবোধ। অর্থাৎ এককথায় কেবল ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাই নয়, কোন পরিস্থিতিতে কোন পরিবেশে কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। অর্থাৎ বেশগুছিয়ে ভালোভাবে ভাষার যাবতীয় প্রকাশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকার বিষয়টি পারঙ্গামতাবোধ।

ভাষা ব্যবহার।

বিশেষমূর্ত পরিস্থিতিতে বা বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে ভাষার প্রকৃত ব্যবহারই হল ভাষা ব্যবহার বা Performance। চমস্কি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাসপেক্টাস্ গ্রন্থে জানান গতানুগতিক ধারণা হল - যতটা পারঙ্গামতাবোধ ততটাই ভাষা ব্যবহার দেখা যাবে। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুসারে এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। চমস্কি জানালেন, ভাষা ব্যবহার পারঙ্গামতাবোধের সম্পূর্ণ ধারণা দিতে পারে না। ভাষাব্যবহারের সীমাবদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রে থেকেই যায়। নানা ধরনের ভ্রান্তি এবং ত্রুটি ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। যেমন কথা বলা আরম্ভ করার সময়ে ভুল হতে পারে। নানারকম বিচ্যুতি ঘটতে পারে। মাঝামাঝি গিয়ে যেভাবে বলা আরম্ভ হয়েছিল তা বদলে যেতে পারে।

আদর্শ বক্তা-শ্রোতা একই ভাষা সম্প্রদায়ের হবে। কথা বলার সময় বক্তা যদি বিস্তৃতভাবে বলে বা বলার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ভুলে যায়, ভুল উচ্চারণ করে, ইতস্তত করে, তোতলামো করে। একই কথা যদি বার বার বলে তাহলেও শ্রোতা যদি বিভ্রান্তি না হল তবেই তাকে বলা হবে ভাষা ব্যবহার।

১০.৬.৩ বাক্য গঠনগত তত্ত্ব

অধোগঠন

কতকগুলি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি প্রাথমিক শব্দশৃঙ্খল পাওয়া যায়। এই শব্দ শৃঙ্খল বা উপাদান শৃঙ্খল এলোমেলো কতকগুলি শব্দ নয়। এই উপাদান শৃঙ্খলকে পদগুচ্ছ গঠনের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এই পদগুচ্ছ গঠনের চিহ্ন দিয়ে অধোগঠন (Deep Structure) তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটি বাক্যের এই রকম প্রাথমিক পদগুচ্ছ চিহ্ন আছে। বাক্যের মধ্যে অবস্থিত এই পদগুচ্ছ চিহ্ন পরম্পরা আন্বয়িক উপাদানের মাধ্যমে সঞ্জনিত হয়।

অধোগঠন ধারণাটি নিয়ে বিশেষভাবে সমালোচনা আরম্ভ হয়। ১৯৫৭-তে চমস্কি শব্দার্থতত্ত্বকে অধোগঠনে গ্রহণ না করলেও ১৯৬৫-তে তিনি একে গুরুত্ব দিলেন। অনেকে অধোগঠনকে গভীর বলে মনে করতে চাইলেন। কেউ বা মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। প্রকৃতপক্ষে চমস্কি বিষয়টিকে গভীর বলে দেখতে চান নি। প্রথমিক গঠন বা ভিত্তি হিসাবে এই গঠনটিকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন। ১৯৮০-৮১-র Government and Binding তত্ত্বে তাই Deep Structure না বলে D. Structure বলবেন।

অধোগঠন থাকবে আন্বয়িক উপাদান কক্ষ, সংবর্তনসূত্রসমূহ ভিত্তি কক্ষে থাকবে পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র এবং শব্দকোষ। এই অধোগঠনেই থাকবে শব্দার্থতত্ত্বগত উপাদান। বাক্যের অর্থগত নিমিতি অধোগঠনেই ঘটে।

অধিগঠন

বাক্যের অধোগঠন যখন সংবর্তনের (Transformation) মধ্য দিয়ে সঞ্জনিত (Generated) হয় তখন তাকে বলা হয় অধিগঠন (Surface Structure)। সংবর্তন সূত্র থেকে ধ্বনিতত্ত্বগত উপাদান নিয়ে বাক্যের ধ্বনিতত্ত্বগত প্রকাশ ঘটেছে। এই ধ্বনিতত্ত্বগত প্রকাশ এই বাক্যের অধিগঠন।

আমরা কানে যা শুনি সেগুলি ধ্বনিসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ধ্বনিসমষ্টির মিলিত রূপটিই বাক্যের অধিগঠন। এই ধ্বনিসমষ্টি অধিগঠনে উচ্চারিত হয় ধ্বনিতত্ত্বগত নানা উপাদান নিয়ে। আর সেগুলির বিন্যাস নির্ভর করে অধোগঠনের ওপর। অর্থবোধের ব্যাপারটিও থাকে অধোগঠনে। অধোগঠন তাই একটি বাক্যের আদর্শ বিমূর্ত গঠন। আর সংবর্তনসূত্রের মাধ্যমে সেই বাক্যের মূর্ত উচ্চারিত রূপ বা গঠন অধিগঠন।

একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে অধোগঠনের কক্ষগুলি এবং সংবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিগঠনের বিন্যাসটি লক্ষ্য করব।

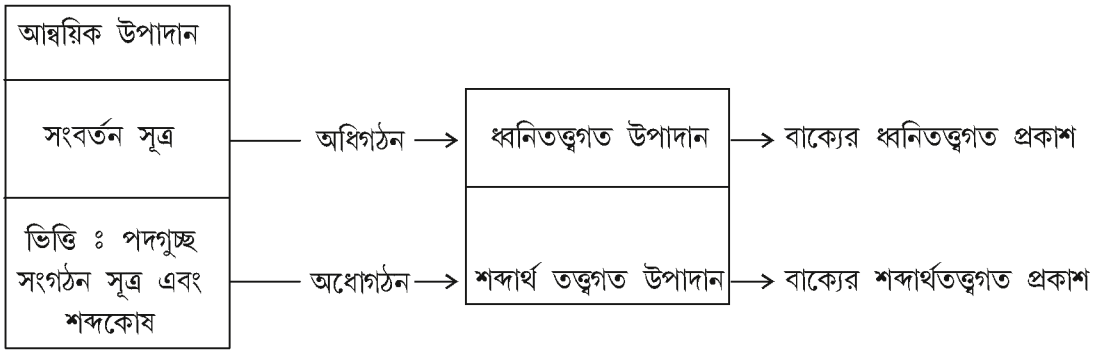

১০.৬.৪ বাক্য ব্যবহার তত্ত্ব

ব্যাকরণসম্মত বাক্য

বাক্যের আদর্শ আন্বয়িক গঠন-রূপ হল—ব্যাকরণসম্মত বাক্য (Grammatical Sentence)। বাক্য ব্যাকরণসম্মত কিনা কিংবা কতটা ব্যাকরণসম্মত তা দিয়ে পারঙ্গমতাবোধের মাত্রা কিছুটা মাপা যায়। সুতরাং ব্যাকরণযোগ্যতা হল পারঙ্গমতাবোধ অধ্যয়নের মাপকাঠি। গ্রহণযোগ্য নয় এমন ব্যাকরণসম্মত বাক্য সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এরকম বাক্য হতে পারে। তাই ব্যাকরণযোগ্যতা আর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি এক নয়।

গ্রহণযোগ্যতার নানা দিকের মধ্যে একটি দিক হল—ব্যাকরণসম্মত বাক্য কিনা সেই বিষয়টি দেখা। অনেক সময় বাক্য অনেক বেশি বিমূর্ত রূপ নেয়। ফলে, তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায় কিন্তু ব্যাকরণ যোগ্যতা হয়তো অনেক বেশি থাকে। গ্রহণযোগ্য নয় এমন ব্যাকরণসম্মত বাক্য সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। তার কারণ, স্মৃতিশক্তির সীমাবদ্ধতা বা শৈলীগত বিষয় ইত্যাদি হতে পারে।

চমস্কি জানান, গ্রহণযোগ্য নয় এমন ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে ব্যাকরণের নিয় দিয়ে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বাক্য সঞ্জননের সময় ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা সংখ্যায় কমিয়ে দিতে পারি। অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত অথচ গ্রহণযোগ্য বাক্য নয় এমন বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে পারি। আন্বয়িক গঠনের ক্ষেত্রে অবর শ্রেণি (Subcatagory) গঠনের দিকটি ব্যাকরণযোগ্যতার মাত্রা বিষয়টি দেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর অবর শ্রেণি তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাচন বা Sectional rules গুলি যদি না মানা হয় তাহলে বাক্যর গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ব্যকরণ যোগ্যতার ধারণা যা আমাদের বোধের মধ্যে থেকে তা অনেক জটিল। ব্যাকরণের কাজ সেটিকে ব্যাখ্যা করা।

গ্রহণযোগ্য বাক্য বা প্রকৃত বাক্য।

মানুষের মুখের উচ্চারণ বা ভাষা ব্যবহার-এর ক্ষেত্রে চমস্কি গ্রহণযোগ্য বা acceptable পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। কাগজে কলমে বিশ্লেষণ না করেই যে বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এবং যে বাক্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—সেই প্রকৃত ব্যবহৃত বাক্যকে তিনি গ্রহণযোগ্য বাক্য বলতে চেয়েছেন। গ্রহণযোগ্যতারও নানা মাত্রা আছে। যেমন, খুব তাড়াতাড়ি বলা বাক্য, অনেক ভুল বাক্য উচ্চারণ করা, ঠিক ঠিক গঠন মনে রেখে পুরো বাক্যটির অন্বয় বজায় না রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। চমস্কি প্রদত্ত উদাহরণ এখানে দেখা যাক—

(1) (i) I called up the man who worte the book that you told me about.

(2) (ii) I called the man who wrote the book that you told me about up.

চমস্কি জানিয়েছেন প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয়টির তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য বাক্য। বলেছেন,

"The more acceptable sentences are those that are more likely to be produced, more easily understood, less culmsy, and in some snese more natural". [Chomsky : 1865 : 11]

অর্থাৎ চেষ্টা করে যে বাক্য হয় না ভেতর থেকেই উঠে আসে সেই বাক্য গ্রহণযোগ্য বাক্য। যে বাক্য খুব সহজে বোঝা যায় যে বাক্য বেশি ভারাক্রান্ত নয় বা আন্বয়িক জটিলতা কম এবং স্বাভাবিক তাকে গ্রহণযোগ্য বাক্য বলা হবে।

১০.৭ চমস্কি ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্বয় তত্ত্বের অগ্রগতি

চমস্কি প্রবর্তিত আন্বয়িক তত্ত্বটিই এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি। ১৯৫৭-তে প্রকাশিত Syntatic Theory-র থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৬৫-র তত্ত্বটিকে 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থটিকে। ১৯৬৫-র তত্ত্বটিকে 'Standard Tehory' বা 'Classical T. G' বলা হয়। ৭০-এর দশকে আরও কিছু তত্ত্বের উদ্ভব ঘটতে থাকে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময় 'Relational Grammer' (RG)-এর উদ্ভব হয়। চমস্কির তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্ব প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। ৭০ দশকের শেষ দিকে এই তত্ত্ব 'Lexical

Functional Grammaer' LPG বা পরিণত হয়। কর্তা আর কর্ম কাকে বলে তার সমাধান TG-তে পাওয়া যায় নি। ১৯৭০-এর প্রথম দিকে RG-তে বলা হল কর্তা আর কর্ম হল ব্যাকরণগত সম্পর্ক (relations)। বাক্যের আন্বয়িক গঠনকে তারা সম্পর্ক হিসাবে দেখলেন।

LPG-তে বাক্যের উপাদানগুলি তথা বাক্যের কর্তা, কর্ম ইত্যাদিকে ব্যাকরণ ক্রিয়া (Function) বা ভূমিকা হিসাবে দেখা হল। একটি বাক্যের দুটি প্রধান উপাদান আছে। একটি হল—

c-structure বা উপাদান গঠন। আর অন্যটি হল—

f-structure বা পদভূমিকার (function) গঠন

১৯৮০ থেকে চমস্কির Government and Binding বা Principles and Parameters (P & P) তত্ত্ব গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৮১-তে প্রকাশিত Lectures on Government and Binding গ্রন্থের পুনমার্জনা একাধিকবার পরবর্তীকালে করেছেন। সে সব জটিলতায় আমরা এখানে যেতে চাই না। তবে P & P তত্ত্বে মূল গঠন হল—S Structure আর তার থেকে বাড়তি আরও দুটি স্তর তৈরি হয়েছে। এগুলি হল Over Surface Structure বা Phonological Form (P.F.) অর্থাৎ যুক্ত অধিগঠন বা ধ্বনিতত্ত্বগত রূপ। শৈলীগঠন সূত্র দিয়ে এই স্তরটি তৈরি হয়। আর দ্বিতীয়টি হল—Logical Form (LF) বা যুক্তিনিষ্ঠ গঠন। শব্দার্থতত্ত্বগত প্রকাশের মধ্যে এর অবস্থান।

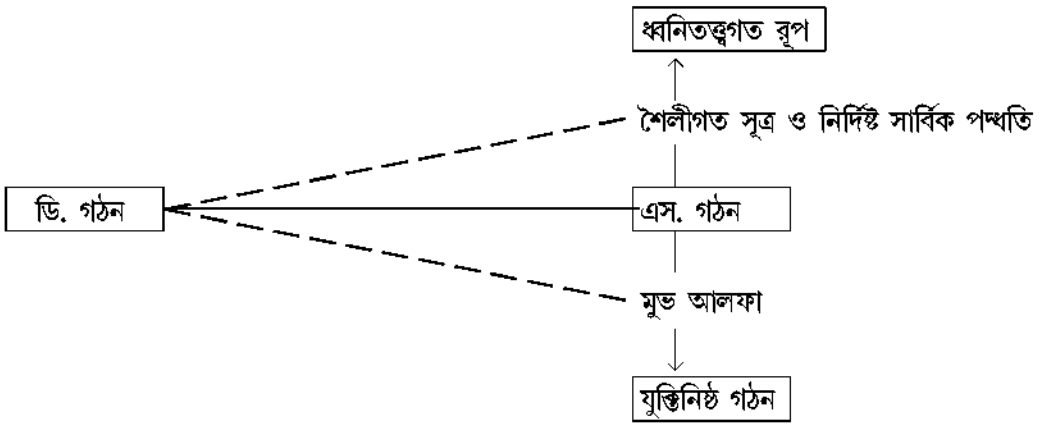

এটি বা তালিকা স্থানান্তকরণ-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এই রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চমস্কির Extended Standard Theory থেকে এই P & P তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। এর ডি-গঠনের প্রধান হল বিষয় বা Theme সরাসরি যুক্ত হয়ে আছে এমন বাক্যগুলির গঠনগত দিকগুলি নির্দেশ করা। ডি গঠনে আছে শব্দকোষ আর ব্যাকরণের নানাবিধ শ্রেণি (Category)। এই ডি গঠন একটি সংবর্তনের মাধ্যমে এস গঠনে পরিণত হয়। এই সংবর্তনটিকে আলফা স্থানান্তকরণ (Alpha Movement) বলা হয়।

এস গঠন-এর মধ্যে শূন্য উপাদান বা রয়েছে। আর. এস. গঠনকে ডি. গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা দেখার জন্য অনুসন্ধান বা trace-এর ভূমিকা যুক্ত হয়।

এসব গঠনে থাকে যুক্তিনিষ্ঠ গঠন (logical Term)। এই গঠনে নানা তত্ত্ব কাজ করে।

যেমন,

X-bar theory, Theta theory, Case theory, Binding Theory, Bounding Theory এবং Contorl Government Theory প্রভৃতি তত্ত্ব।

১৯৮৫-তে প্রকাশিত Gazdar, G; Klein, E; l pullum, G.; Sag, I, রচিত 'Generalized Phrase Structure Grammer গ্রন্থে এর তত্ত্ব প্রকাশিত হল।

Pollard এবং sag-এর 'Information Based Syntax and Semantics, Vol-1 : Fundamentals' গ্রন্থে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'Head Driven Phrase Structure Grammaer' বা HPSG ব্যাকরণের মডেল দেওয়া হল। ১৯৯৪-তে এবং গ্রন্থে এই তত্ত্বের পরিমার্জিত রূপটি পাওয়া গেল।

১০.৮ সারাংশ

প্রথানুসারী ব্যাকরণে অন্বয়কে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এই অন্বয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অব্যবহিত উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ করে তৈরি হয়েছে অব্যবহিত উপাদান গঠন। কিন্তু সে গঠন বিশ্লেষণের মধ্যেও নানা ধরনের সমস্যা এসে পড়ে। তাই চমস্কি প্রবর্তিত সংবর্তনী সঞ্জননী তত্ত্বকে বর্তমান সময়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। চমস্কির সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার গ্রন্থের তত্ত্ব পরবর্তীকালে পরিমার্জিত রূপ নিয়ে ১৯৬৫-তে প্রকাশ পায়। আর অ্যাসপেক্ট্স-এর তত্ত্ব নিয়ে বর্তমান সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের মডেলটি তৈরি হয়েছে। ১৯৫৭-র তত্ত্বে Finite State Grammar, Phrase Structure Grammaer এবং Transformation Grammar-এর কথা তিনি বলেছিলেন। আর ১৯৬৫-তে Transformational Grammaer বা সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের কথা বললেন।

১৯৬৫-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি তিনটি কক্ষের কথা বলেছেন। একটি হল শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ। দ্বিতীয়টি—আন্বয়িক কক্ষ। এবং তৃতীয়টি হল—ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ। চমস্কি দুটি ধারণা নিয়ে একটি তত্ত্ব তৈরি করেছেন। এগুলি হল—বৈশ্বিক ব্যাকরণ বিশেষ ব্যাকরণ, পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহার, অধোগঠন ও অধিগঠন এবং ব্যাকরণসম্মত বাক্য ও গ্রহণযোগ্য বাক্য।

১৯৭০ থেকে চমস্কির প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে থাকে কিছু ব্যাকরণ। যেমন, অ্যান্ডারসন ফিলমোর প্রমুখের Case Theory অন্যভাবে বাক্যের গঠনকে দেখতে চান। পালমুটার প্রমুখ Relational Grammaer-এর কথা বলেন। ব্রেসনান Lexical Functional Grammaer প্রমুখ এর কথা বলেন। গাজদার প্রমুখ Generalized Phrase Structure Grammaer-এর তত্ত্ব দেন। পোলার্ড প্রমুখ বলেন Head-Driven Phrase Structure Grammaer-এর কথা।

পাশাপাশি চমস্কিও বদলাতে থাকেন তত্ত্ব। Government and Binding বা P & P তত্ত্ব তৈরি করেন এবং তার নানারকম সমস্যার সমাধান করেন পরবর্তীকালে। এভাবেই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্বয়তত্ত্ব নানা সমস্যা সমাধান সূত্র আবিষ্কার করে চলেছে।

১০.৯ অনুশীলনী

১. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার, খ. পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণ, গ. সংবর্তনী ব্যাকরণ, ঘ. বৈশ্বিক ব্যাকরণ, ঙ. বিশেষ ব্যাকরণ, চ. পারঙ্গমতাবোধ, ছ. ভাষা ব্যবহার, জ. অধোগঠন, ঝ. অধিগঠন, ঞ. ব্যাকরণসম্মত বাক্য, ট. গ্রহণযোগ্য বাক্য, ঠ. P & P তত্ত্ব।

২. চমস্কি প্রবর্তিত ১৯৫৭ ও ১৯৬৫-র তত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। এই প্রসঙ্গে এই দুই তত্ত্বের কোনো তফাত আছে কিনা দেখান।

৩. যে-কোনো দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।

ক. বৈশ্বিক ব্যাকরণ ও বিশেষ ব্যাকরণ

খ. পারঙ্গমতাবোধ ভাষা ব্যবহার

গ. অধোগঠন-অধিগঠন

ঘ. ব্যাকরণসম্মত বাক্য-গ্রহণযোগ্য বাক্য

৪. ১৯৬৫-র পর চমস্কি ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫. অন্বয় তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয় কুমার, ১৯৮৮, বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, শ্রী অরবিন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা।

Bach, E, 1974, Syntactic Theory, Halt, Fince Chart and Winston, New York

Baker, C. L., 1978, Introduction to Generatic-Transformational Syntax. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Nersey.

Burt, M. K. 1971, From Deep to Surface Structure : An Introduction to Transformational Syntax, Harpers & Row.

Chomsky. N. 1965, Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge, Mass.1981, Lectures on Government and Binding, Faris, Dordreeht.

Matthews, P. H. 1981, Syntax, Cambridge University Press

Redford, A, 1981 Transformational Syntax, Cambridge University Press.
1988 Transformational Grammar, Cambridge University Press.

একক ১১ ❐ সঞ্জননী অন্বয়-তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয়

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন

১১.৪ পদগুচ্ছের প্রকার

১১.৫ বিশেষ্যগুচ্ছের প্রকার

১১.৬ ক্রিয়াগুচ্ছের প্রকার

১১.৭ বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন

১১.৭.১ বিলোপন জাতীয় সংবর্তন

১১.৭.২ সংযোজন জাতীয় সংবর্তন

১১.৭.৩ রূপান্তর জাতীয় সংবর্তন

১১.৭.৪ বির্পযাস জাতীয় সংবর্তন

১১.৮ আলফা স্থানান্তকরণ

১১.৯ সারাংশ

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- ❐ প্রথানুসারী বাংলা ব্যাকরণের পাশাপাশি আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করার প্রবণতাটি বোঝা যাবে।
- ❐ সঞ্জননী তত্ত্ব প্রথম দিকে বাংলা ভাষা বিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্ব না পেলেও বর্তমানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বোঝা যাবে।
- ❐ চমস্কিকে অবলম্বন করেও বাংলা সঞ্জননী ব্যাকরণ তৈরি করতে গিয়ে স্বাধীনভাবে ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে তা বোঝা যাবে।
- ❐ এই এককটি পড়ার পর ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নতুন গবেষণার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ হবে ও প্রেরণা পাওয়া যাবে।

১১.২ প্রস্তাবনা

চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এ বিষয়ে কাজকর্ম বেশি পরিমাণে হয়েছে। প্রবাল দাশগুপ্ত, পবিত্র সরকার, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখ এ নিয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেছে। আশির দশকের মাঝামাঝি হুমায়ুন আজাদ বাক্য তত্ত্ব নামক গ্রন্থ রচনা করেন তাতে তিনি ১৯৬৫-র তত্ত্ব পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। ওই সময়েই (১৯৭৯-৭৪) ১৯৬৫-র তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন উদয় কুমার চক্রবর্তী। পরে এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'বাংলা সংবর্তনী' গ্রন্থে ১৯৮১-র তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে ১৯৬৫-র তত্ত্ব নিয়েই মূল আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৩ বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন

চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে একটি বাক্য আসলে পদগুচ্ছের সংগঠন। ফলে, পদগুচ্ছের সংগঠন সূত্র লক্ষ করলে বাক্যের আন্বয়িক গঠনটি বোঝা যাবে। এই গঠনটি ক্রমোচ্চ স্তর ভিত্তিক। অর্থাৎ একদম তলায় পদ বা শব্দ। তার ওপর পদ-শ্রেণি যেমন, বিশেষ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি। তার ওপর পদগুচ্ছ শ্রেণি। যেমন, বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ, ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ ইত্যাদি। আর একদম ওপরে বাক্য। চমস্কি এভাবেই এই পদগুচ্ছের সংগঠনটি দেখিয়েছেন— পদ—পদশ্রেণি—পদগুচ্ছ শ্রেণি—বাক্য

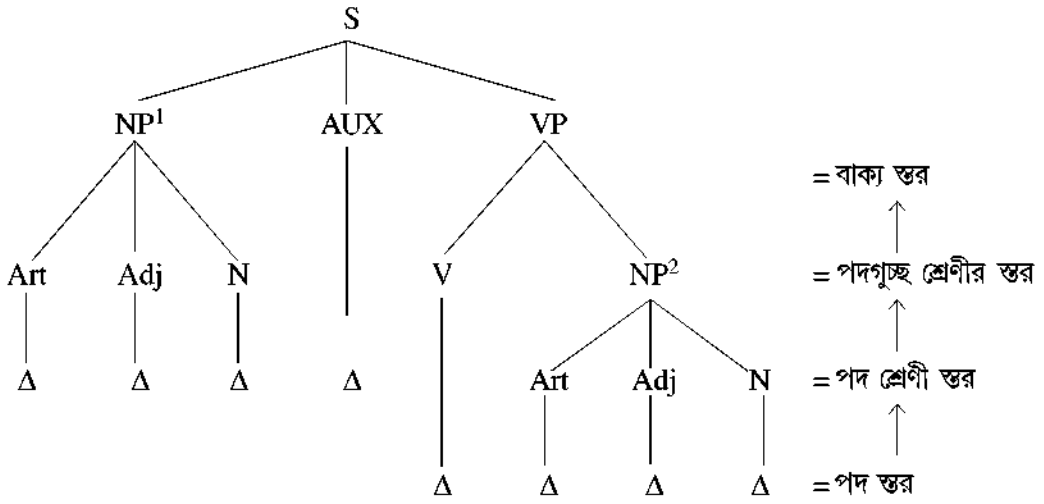

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই গঠনটি হুবহু গ্রহণ করা উচিত নয়। [চক্রবর্তী ঃ ১৯৯২]। বাংলা বাক্যে সহায়ক (Aux) কোনও গুরুত্বপূর্ণ গঠন নয়। তাই একে ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছের মধ্যে রাখাই সংগত। দ্বিতীয়ত, বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠনে বিশেষ্যগুচ্ছ' ($=NP^2$) বাক্যের শেষে বসবে না। বসবে ক্রিয়ার আগে। সুতরাং চমস্কি প্রবর্তিত পদগুচ্ছের গঠন বিন্যাস বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে একই রকম না রেখে আমরা বাংলা ভাষার বিশেষ ব্যাকরণ অনুসারে নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের ন্যায় পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র তৈরি করব।

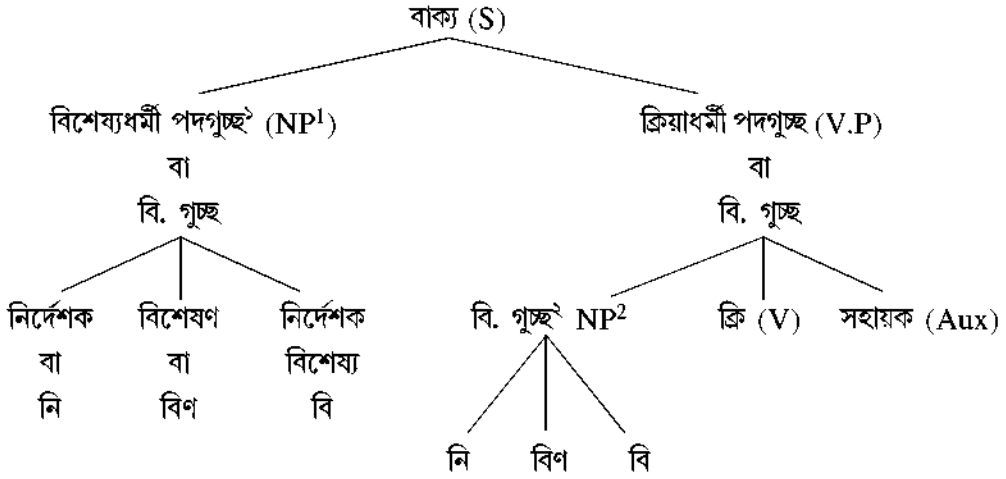

বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠনটি পুনর্লিখন সূত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ একটি শ্রেণিকে তার গঠনগত বিন্যাসে লিখে ফেলার মাধ্যমে নিম্নরূপ দেখা যাবে।

বাক্য — বি.গুচ্ছ[১] + ক্রিয়াগুচ্ছ

ক্রি. গুচ্ছ — বি.গুচ্ছ[২] + ক্রিয়াগুচ্ছ + সহায়ক

বি. গুচ্ছ — { (প্রতিনির্দেশক (বিণ) (বি) (সংযোজক) (সম্বন্ধক) বি.
(বাক্য) বি. (বাক্য) }

প্রতিনিদেশক — যে-সে, যিনি-তিনি, যার-তার...

বিণ. — (বিণ. — খারাপ, চালাক...),
{ (ক্রি. বিণ. — খুব, জোরে...),
(নিষ্ঠান্ত — ঘুমন্ত, চলন্ত...)
(বিশেষিত বি. — সঞ্চয়, আরাম...)
(নির্দেশক — এইওই...)
(প্রতিবিশেষক — যাকে...তাকে...) }

বি. — মানুষ, বই ...

সংযোজক — ও, এবং ...

ক্রি. — যা, চল, দেখ ...

সহায়ক — { (কাল বিভক্তি — বো, ইল ...)
(প্রকার বিভক্তি — এছ্, ছ ...)
(পক্ষ বিভক্তি — ই, ও, এস ...)
(নঞ্ — না, নয় ...)
(প্রশ্নবোধক — কি, কে ...) }

দু একটি উদাহরণ দিয়ে পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রের মাধ্যমে কীভাবে বাক্য তৈরি হচ্ছে বা সঞ্জনন করা হচ্ছে তা দেখা যাক—

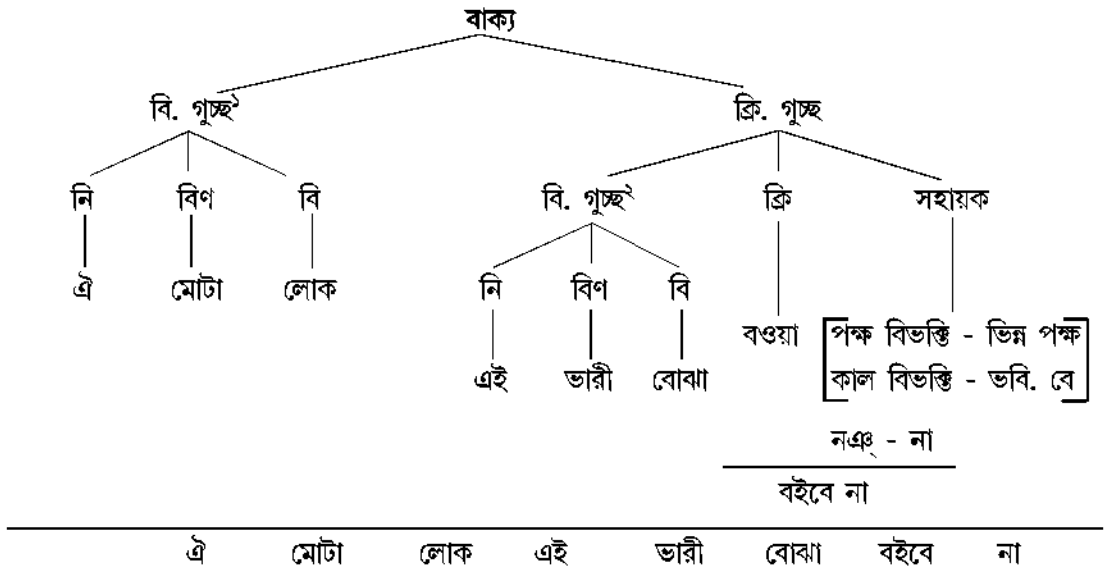

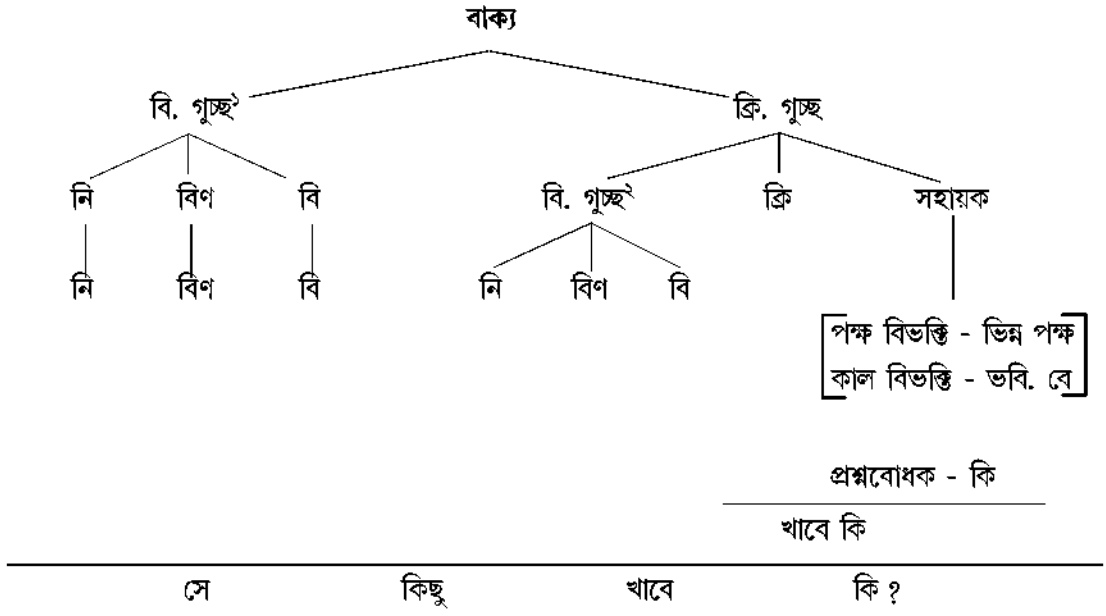

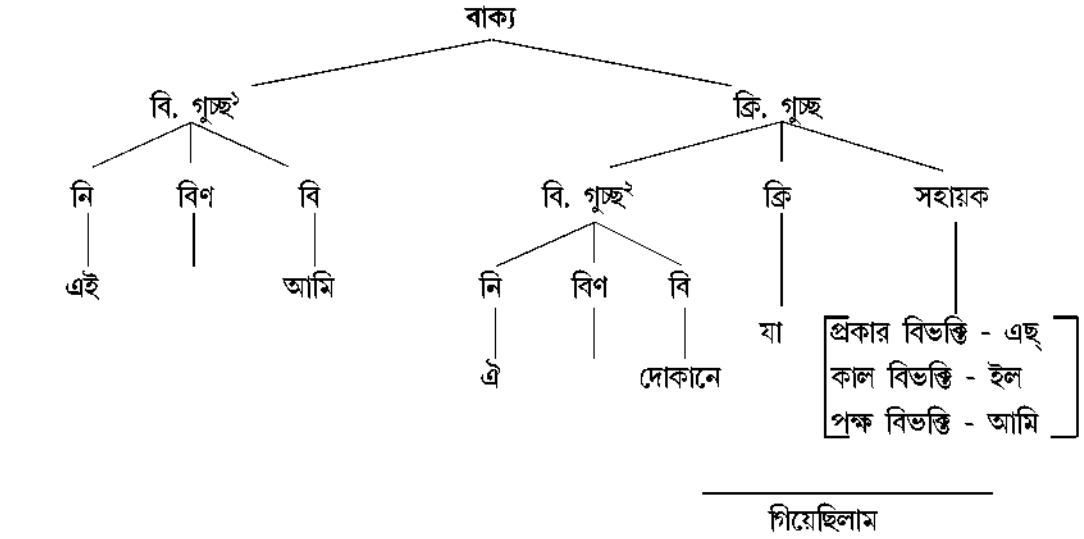

১১.৪ বাংলা পদগুচ্ছের প্রকার

মোট ছ-রকমের পদগুচ্ছ বাংলা ভাষায় হতে পারে। আমরা এক এক করে এই ছ রকমের পদগুচ্ছ বৃক্ষরেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাব।

১. সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ (Prepositional Phrase)।

সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ বাক্যে বিশেষণের কাজ করে বলে একে বিশেষণগুচ্ছ-র মধ্যে রাখা যায়। আবার সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছের মধ্যে বসে। যেমন,

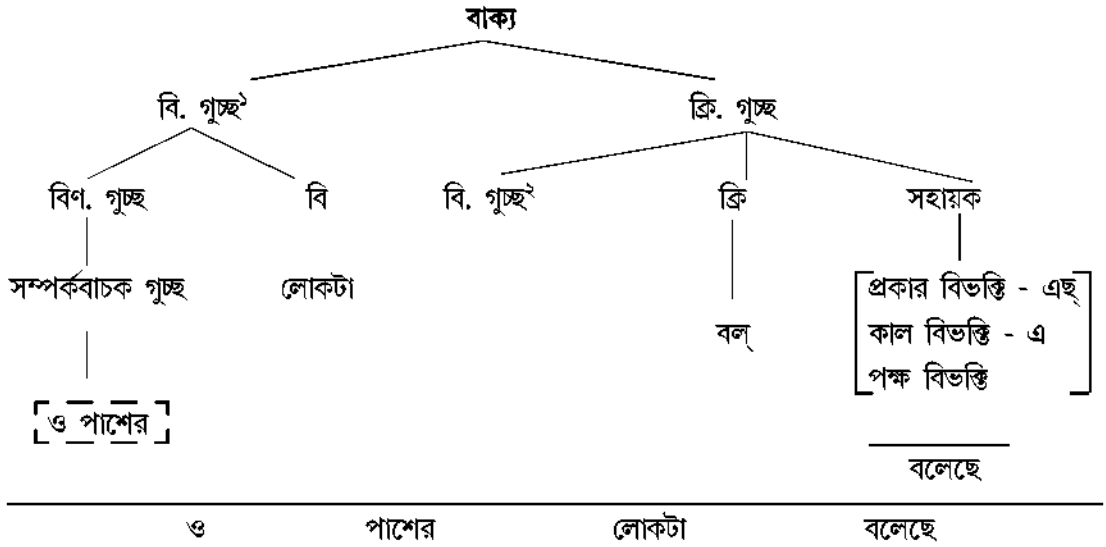

২. বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ (Noun Phrase)।

বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ কর্তা এবং কর্ম উভয় স্থানেই বসে। বিশেষ্যগুচ্ছের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত এমন বিশেষণগুচ্ছও হয়ে থাকতে পারে। উপরের উদাহরণে আমরা বিশেষ্যগুচ্ছ-র ব্যবহার দেখতে পাবো। 'লোকটা' বিশেষ্যগুচ্ছ। আবার এই উদাহরণের 'ও পাশের লোকটা' পুরোটাই বিশেষ্যগুচ্ছ। বিশেষ্যগুচ্ছের প্রকার নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

৩. বিশেষণধর্মী পদগুচ্ছ বা বিশেষণগুচ্ছ (Adjectival Phrase)।

সম্পর্কবাচক গুচ্ছ, নিষ্ঠান্তগুচ্ছ এবং ক্রি. বিণ. গুচ্ছ বিশেষণের মতো কাজ করে বলে এদের বিশেষণগুচ্ছর অন্তর্গত করা হয়। সাধারণভাবে এই পদগুচ্ছগুলি বিশেষ্য পদকে বিশেষিত করে। যথা,

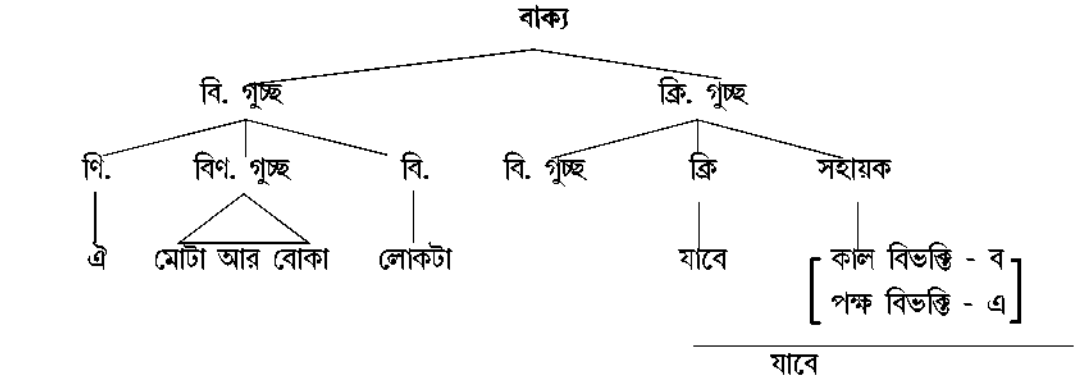

বিশেষণগুচ্ছ আবার বিশেষ্যগুচ্ছের অন্তর্গত।

৪. নিষ্ঠান্ত বাচক পদগুচ্ছ বা নিষ্ঠান্তগুচ্ছ (Participal Phrase)।

নিষ্ঠান্তগুচ্ছের একটি উদাহরণ প্রথমে লক্ষ করা যাক।

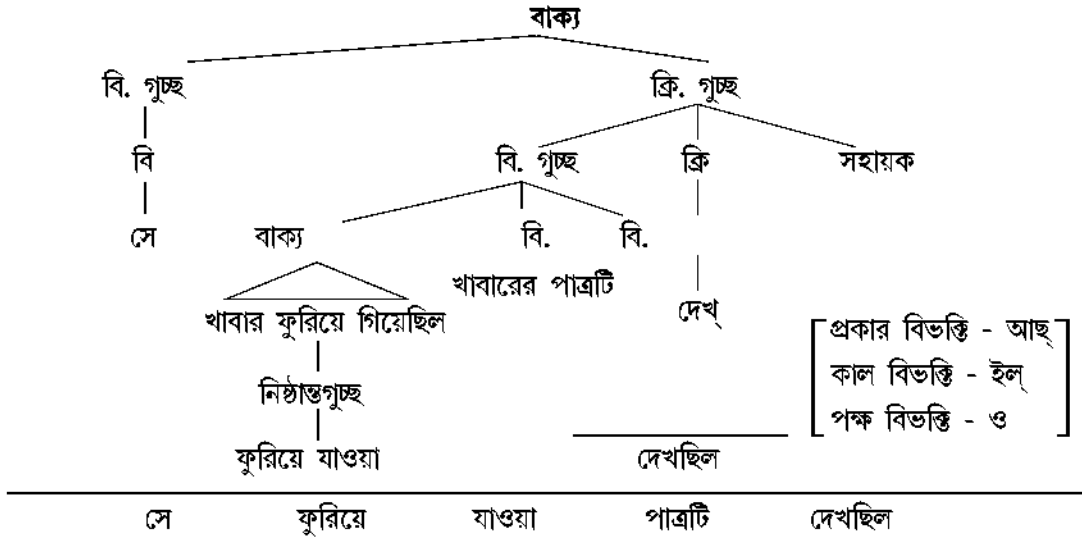

নিষ্ঠান্তগুচ্ছ ক্রিয়াগুচ্ছর মধ্যে অবস্থান করে।

৫. ক্রিয়া ক্রিয়াবিশেষণ গুচ্ছ (Adverbial Prase)।

ক্রিয়া বা বিশেষণকে যে পদ বা পদসমূহ বিশেষিত করে তাকে ক্রি. বিণ. গুচ্ছ বলে। যেমন,

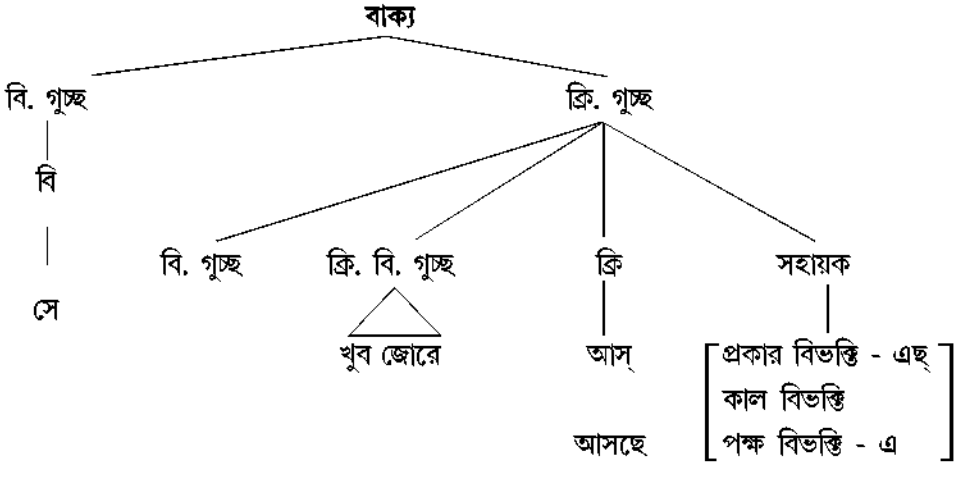

৬. ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ (Vern Phrase)।

নিষ্ঠান্তগুচ্ছ এবং ক্রিয়াবিশেষণগুচ্ছ ক্রিয়াগুচ্ছের মধ্যেই থাকে। বিশেষ্যগুচ্ছ, ক্রিয়া এবং সহায়ক মিলে ক্রিয়াগুচ্ছ গঠিত হয়। এখানে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে ক্রিয়াগুচ্ছর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ক্রিয়াগুচ্ছের প্রকার নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

ছ'প্রকারের পদগুচ্ছ আসলে প্রধান দুটি পদগুচ্ছের অধীন এবং সংসক্ত। এগুলি হল বিশেষ্যগুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছ।

বিশেষ্যগুচ্ছ — সম্পর্কবাচক গুচ্ছ, বিশেষণগুচ্ছ।

ক্রিয়াগুচ্ছ — নিষ্ঠান্তগুচ্ছ, ক্রিয়া বিশেষণগুচ্ছ।

১১.৫ বিশেষ্যগুচ্ছর প্রকার

বাংলা ভাষায় নানা প্রকারের বিশেষ্যগুচ্ছ পাওয়া যায়। আমরা পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রের মধ্যে বিশেষ্যগুচ্ছর প্রকার হিসাবে নিম্নলিখিত সূত্রটি দেখেছি।

বিশেষ্যগুচ্ছ — {(প্রতিনির্দেশক) (বিশেষণ) (বিশেষ্য) (সংযোজক) (সম্বন্ধক) বিশেষ্য (বাক্য) বিশেষ (বাক্য)}

এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করলে বিশেষ্যগুচ্ছের নানা প্রকারের গঠন পাওয়া যাবে। একটি বিশেষ্য নিয়ে যেমন বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে তেমনি একাধিক বাক্য নিয়েও বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে। এই সূত্রটিতে বন্ধনীর মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলি থাকতেও পারে নাও পারে কিন্তু বন্ধনীর বাইরের উপাদানটি অবশ্যই

থাকবে। এই সূত্র বিশেষ্যগুচ্ছের ৭ ধরনের গঠনের কথা জানাচ্ছে। এগুলি হল—

ক. বিশেষ্যগুচ্ছ — বিশেষ্য

খ. বি. গুচ্ছ — বিশেষ্য + সম্বন্ধক + বিশেষ্য

গ. বি. গুচ্ছ — বি. + সংযোজক + বি.

ঘ. বি. গুচ্ছ — বিণ + বি.

ঙ. বি. গুচ্ছ — প্রতিনির্দেশক + বি.

চ. বি. গুচ্ছ — বাক্য + বি.

ছ. বি. গুচ্ছ — বাক্য + বি. + বাক্য

এখানে উদাহরণ দিয়ে সংক্ষেপে এই গঠনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক. বি. গুচ্ছ - বি

একটি মাত্র বিশেষ্য নিয়ে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে। যেমন, সে বাড়ি যাবে। তুমি বই পড়বে। আমি কাজ করবো না। তুই কথা বলবি না। ইত্যাদি। এই বাক্যগুলিতে বি. গুচ্ছ ১ হল - সে তুমি, আমি, তুই ইত্যাদি। বি. গুচ্ছ হল — বাড়ি, বই, কাজ, কথা ইত্যাদি।

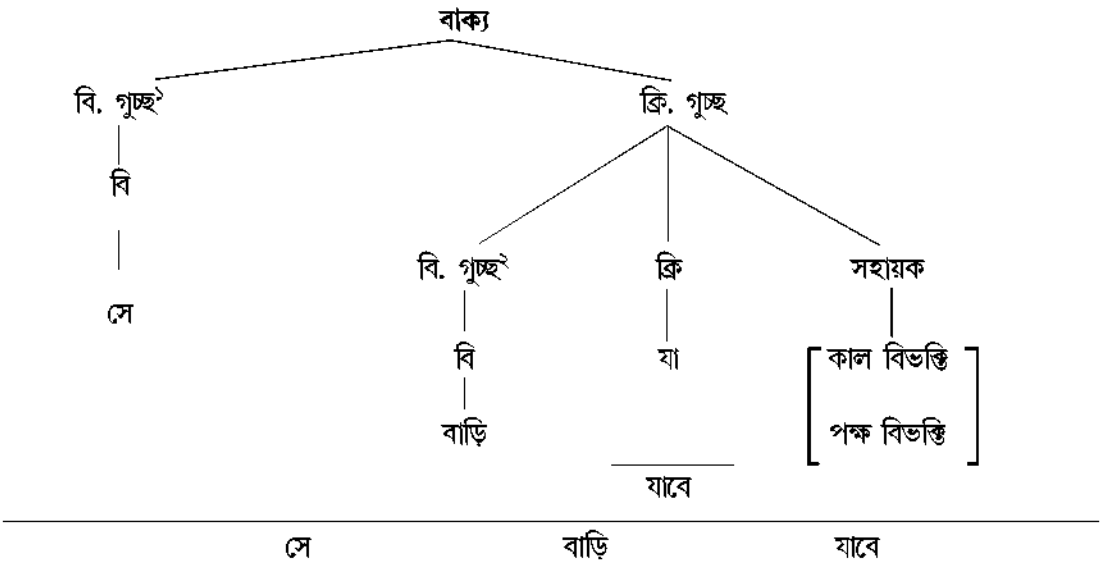

খ. বি. গুচ্ছ - বি + সম্বধক + বিশেষ্য

দুটি বা তার বেশি বিশেষ্যপদ সম্বন্ধক দিয়ে যুক্ত করে বি. গুচ্ছ তৈরি করা হয়। এগুলি বারবার ব্যবহৃত হয়ে দীর্ঘ গঠনও তৈরি করতে পারে। যেমন, হোসেনের দাদা আমাদের বাড়িতে ছিল। আমার দাদার বন্ধুর ছোটো ভাইয়ের শালার মারার বাড়ির পাশের বাড়ির লোকজনদের কথা বলব।

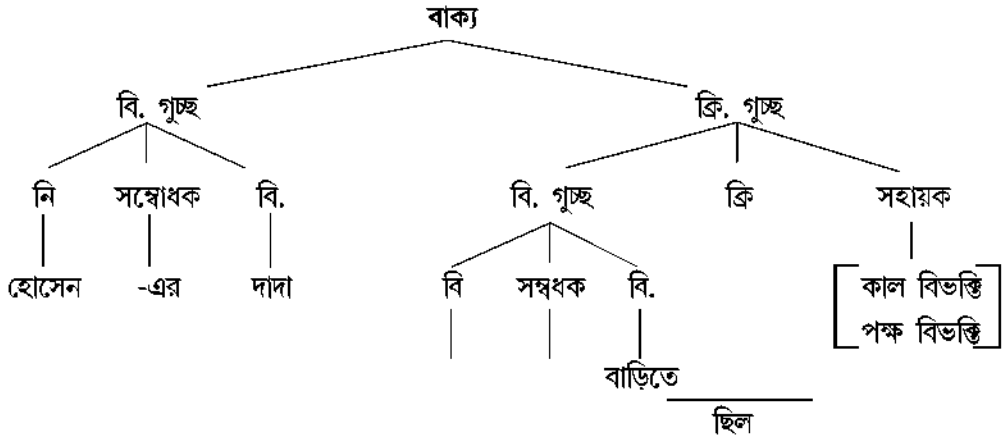

গ. বি.গুচ্ছ — বি. + সংযোজক + বি.

একাধিক বিশেষ্যপদ সংযোজক দিয়ে যুক্ত হতে পারে। এই গঠনটি পুনরায় নিয়মের মতো ব্যবহৃত হতে পারে। লেখায় থাকে বিরতি চিহ্ন কিন্তু মুখের ভাষায় বিরতি থাকে। শেষ বিশেষ্যটি সংযোজক দিয়ে যুক্ত হয়। যেমন, রাম ও শ্যাম যাবে। সে বই খাতা আর পেন আনেনি।

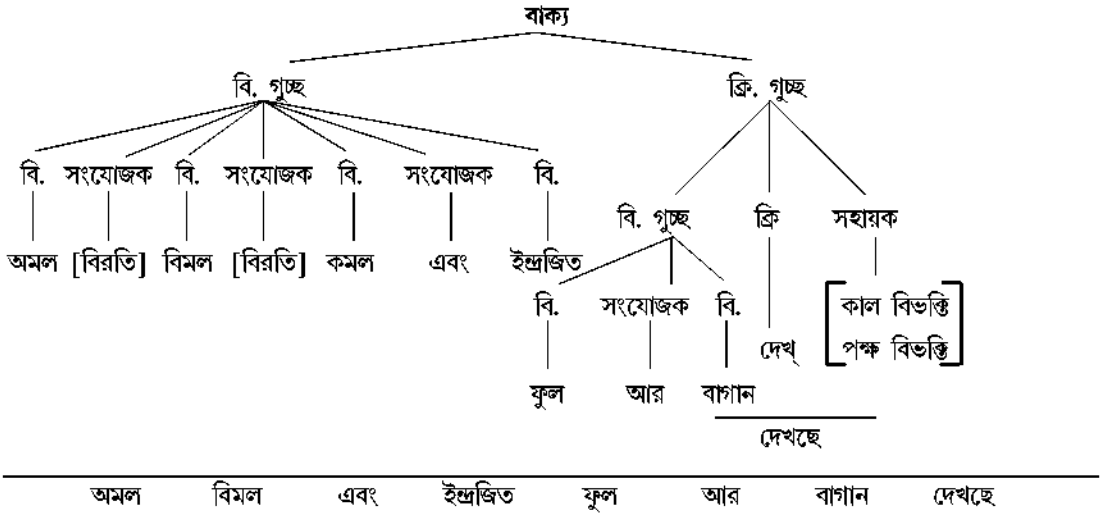

অমল বিমল এবং ইন্দ্রজিত ফুল আর বাগান দেখছে

ঘ. বিণ. + বি.

বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষণ যুক্ত হয়ে 'বিণ. + বি' গঠন তৈরি হয়। যেমন, রোগা মেয়েটা চলে গেছে। বিশেষণ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বিশেষক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন,

১. বিশেষণ + বিশেষ্য — এটা সোজা কাজ ভাবছে।

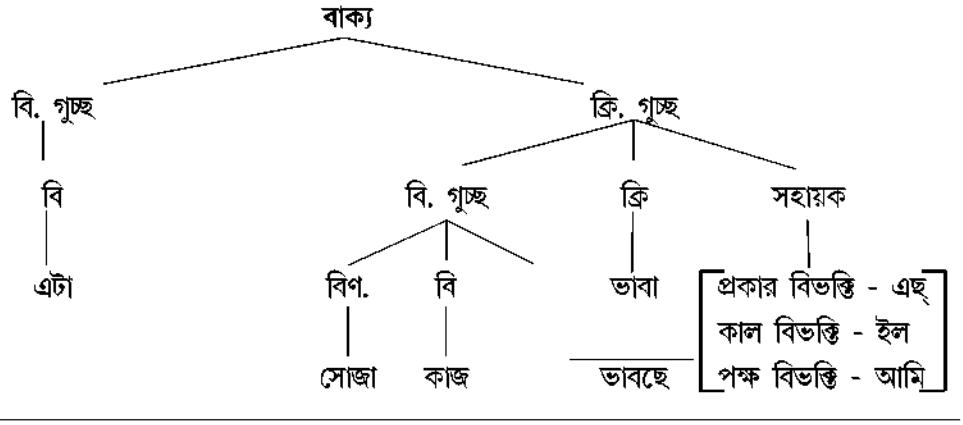

২. বিশেষণগুচ্ছ + বিশেষ্য — যেমন,

বাক্য [বি., গুচ্ছ [বিণ.গুচ্ছ (বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞমেধাবী)] [বি (লোকটি)] [ক্রি.গুচ্ছ [ক্রি. (w)] [সহায়ক (কাল বিভক্তি পক্ষ, বিভক্তি)]]] = বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ মেধাবী লোকটি যাবে।

৩.	ক্রিয়াবিশেষণ গুচ্ছ	+	বিশেষণ যেমন	খুব জোরে চলা গাড়িতে উঠবে না।
৪.	নিষ্ঠান্ত	+	বিশেষ্য। যথা	ডুবন্ত লোকটাকে বাঁচান।
৫.	নিষ্ঠান্ত গুচ্ছ	+	বিশেষ্য। যথা	ভুলে যাওয়া গান মনে পড়ল।
৬.	বিশেষিত বিশেষ্য	+	বিশেষ্য। যথা	আরাম কেদারায় বসে আছে।
৭.	নির্দেশক	+	বিশেষ্য। যথা	তুমি এই বাড়িতে আসবে না।
৮.	প্রতি বিশেষক	+	বিশেষ্য। যথা	যে বলেছিল সেই লোকটা এখানে আসবে।

৬. প্রতিনির্দেশক + বি

বিশেষ্যর সঙ্গে প্রতিনির্দেশক যুক্ত হয়ে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হতে পারে। যেমন, যিনি রামচন্দ্র তিনিই সাগরবন্ধন করেছিলেন।

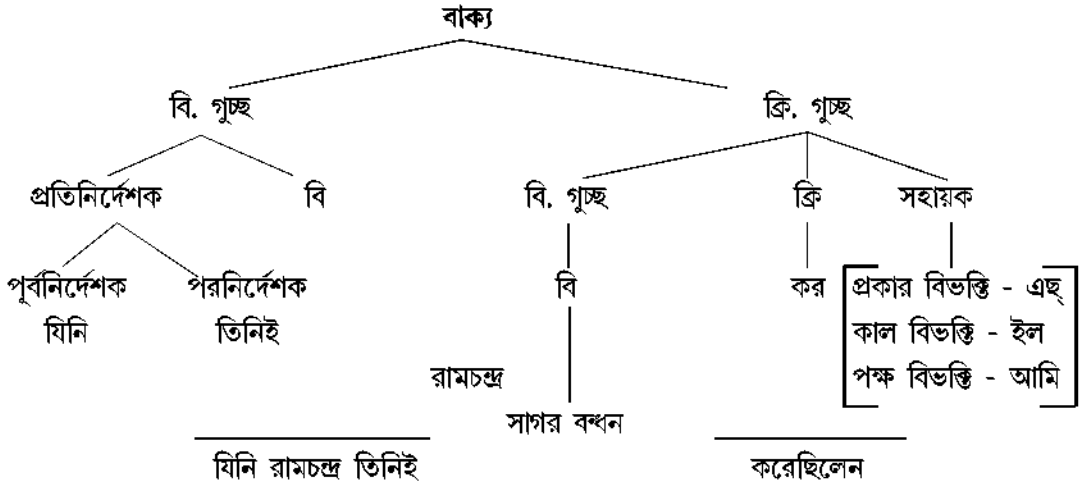

চ. একাধিক গঠন যুক্ত হয়ে মিশ্র বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হয়। সেখানে বাক্য বিশেষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। বিশেষ্যর আগে বাক্য ব্যবহৃত হয়ে বিশেষক বা modifier এর কাজ করে। পরে ব্যবহৃত হয়ে তা সম্পূরক বাক্য বা সম্পূরক হিসাবে কাজ করে। এখানে দু-ধরনের বাক্য দেখানো হল। প্রথমে বিশেষিত বাক্য-র উদাহরণ।

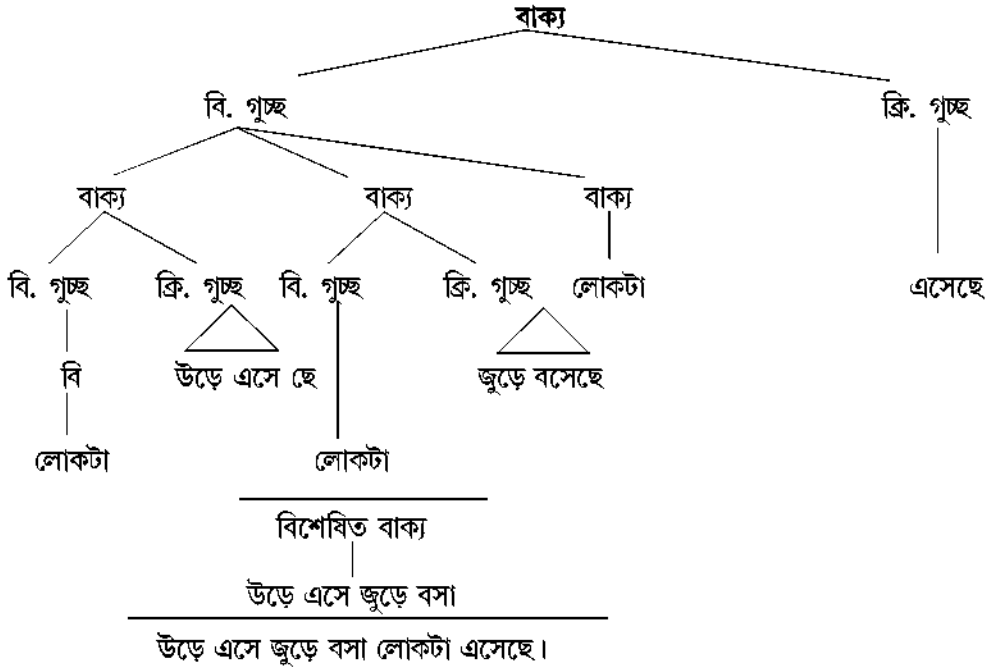

সম্পূরক বাক্য বিশেষ্যর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি করতে পারে। যেমন।

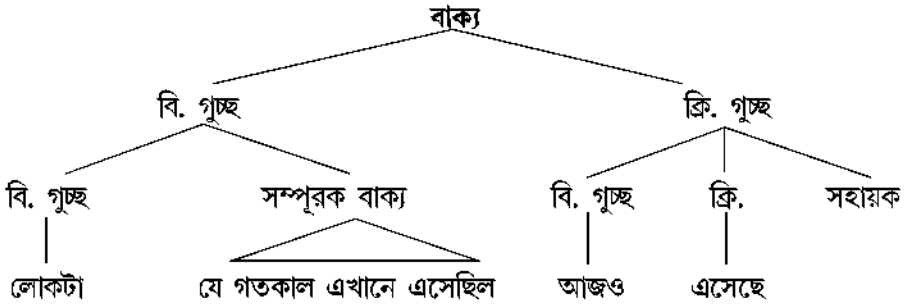

একই সঙ্গে বিশেষের সঙ্গে বিশেষক বাক্য ও সম্পূরক বাক্য উভয়ই হতে পারে। যেমন,

বি.গুচ্ছ	[বিশেষক বাক্য	+	বি	+	সম্পূরক বাক্য	]
	উড়ে এসে জুড়ে বসা		লোকটা		যে গতকাল এখানে এসে বসেছিল	
ক্রি. গুচ্ছ	সে আজও এসেছে	=	বাক্য - উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকটা যে গতকাল এখানে এসে বসেছিল সে আজও এখানে এসেছে।			

এভাবে একাধিক বিশেষ্যগুচ্ছের গঠন মিলিতভাবে দীর্ঘ বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি করে থাকে।

১১.৬ ক্রিয়াগুচ্ছের প্রকার

একটি বাক্য বিশেষ্যগুচ্ছ এবং ক্রিয়াগুচ্ছ যুক্ত হয়ে গঠিত। বিশেষ্যগুচ্ছ বাক্যের কর্তা হতে পারে আবার তা ক্রিয়াগুচ্ছের মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং ক্রিয়াগুচ্ছ ক্রিয়া আর বিশেষ্যগুচ্ছ মিলে তৈরি হয়। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার আগে বিশেষগুচ্ছ বসে। ক্রিয়াগুচ্ছতে সহায়কযুক্ত হয়। ফলে, বাংলা ক্রিয়াগুচ্ছের গঠন নিম্নরূপ—

ক্রিয়াগুচ্ছ { (বি. গুচ্ছ^{২}) + ক্রিয়া + সহায়ক
(বি. গুচ্ছ^{২}) + ক্রিয়া + সহায়ক + বাক্য }

এই গঠনটি বিশ্লেষণ করলে ক্রিয়াগুচ্ছর বিভিন্ন প্রকার গঠন পাওয়া যাবে। যথা,

ক. সাধারণভাবে বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ এবং ক্রিয়া ও সহায়ক যুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছ গঠিত হয়। যেমন, আমি ঘরে যাব। সে এখানে এসেছিল। আপনি কষ্ট করবেন কেন ? উনি এখানে থাকবেন না ইত্যাদি বাক্য।

এই বাক্যগুলিতে [ঘরে যাবো,] [এখানে এসেছিল], [কষ্ট করবেন কেন], [এখানে থাকবেন না], প্রভৃতি অংশ ক্রিয়াগুচ্ছ। বিশেষগুচ্ছ^{২} হল — [ঘরে], [এখানে], [কষ্ট], [এখানে], [কাজ] প্রভৃতি। ক্রিয়া — [যা], [আস], [কর], [আছ] প্রভৃতি। সহায়ক হল — প্রকার বিভক্তি যথা — আছে, কাল বিভক্ত, পক্ষ বিভক্তি প্রভৃতি বিভক্তি।

খ. বিশেষ্যগুচ্ছ হীন ক্রিয়াগুচ্ছ হতে পারে অনেক সময়। যথা—ক্রিয়া + সহায়ক। সে কাঁদছে।

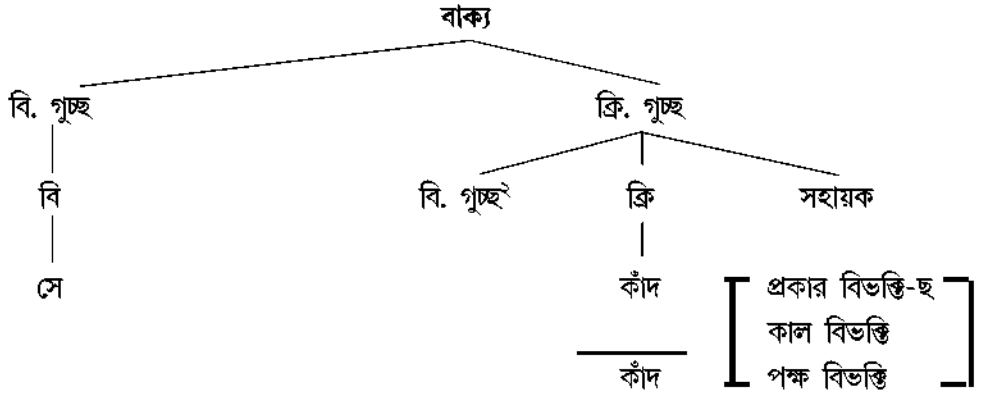

গ. বাক্যযুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছ মিশ্র ক্রিয়াগুচ্ছে পরিণত হতে পারে। যেমন, সে স্কুলে গিয়ে বই পড়বে। এখানে আসলে দুটি বাক্য — সে স্কুলে যাবে এবং সে বই পড়বে। প্রথম বাক্যটির সমাপিকাক্রিয়া 'যাবে' কে অসমাপিকাক্রিয়াতে রূপান্তরিত করে। [= গিয়ে] পরবর্তী বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। এভাবে দুটি বাক্য মিলে তৈরি করেছে আশ্রয়ধর্মী বাক্য। এখানে ক্রিয়াগুচ্ছ আছে—

বিশেষ্যপদ (স্কুলে) + ক্রিয়াপদ (গিয়ে) + (কাল বিভক্তি, পক্ষ বিভক্তি) + বাক্য (বই পড়বে)।

এভাবে একাধিক গঠনযুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছের বিভিন্ন প্রকার মিশ্রগঠন তৈরি হয়।

১১.৭ বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন

বাক্যের অধোগঠনে নানা প্রকার গঠন দেখা যায়। এই গঠনগুলি সংবর্তনের মাধ্যমে অধিগঠনের রূপ নেয়। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে বাক্য তৈরি হওয়ার সময় যে পরিবর্তন বা অদলবদল ঘটে তাকে বলা হয় সংবর্তন (Transformation)। পরিণাম অনুসারে বাংলা বাক্যগুলির সংবর্তন চার ধরনের হয়। এই চার ধরনের সংবর্তন হল — বিলোপন, সংযোজন, রূপান্তরণ ও বিপর্যাস।

বাক্যের কোন উপাদান বাদ গেলে হয় বিলোপন (Deletion)।

উপাদান যোগ করলে হয় সংযোজন (Addition)।

উপাদানগুলির একটি বদলে অন্যটি এলে হবে রূপান্তরণ (Substitution)।

উপাদানগুলির পারস্পরিক অবস্থান বদলে গেলে হবে বিপর্যাস (Extraposition)।

আবার এই চার প্রকারের সংবর্তন মিলে মিশে নানা জটিল রূপ তৈরি করে। এখানে সেই সব বিচিত্র রকমের সংবর্তনের মধ্যে থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য সংবর্তনের পরিচয় দেওয়া হবে।

১১.৭.১ বিলোপন জাতীয় সংবর্তন

বাক্যের অধোগঠনে যে যে উপাদান থাকে সেগুলির মধ্যে কিছু উপাদান বা কোন একটি উপাদান যদি বাক্যের অধিগঠনে ব্যবহৃত না হয় তবে সেই ধরনের সংবর্তনকে বিলোপন বলে। যেমন,

১. সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন

একাধিক বাক্য যুক্ত হলে, একই ধরনের বিশেষগুচ্ছ একই বাক্যে এসে পড়তে পারে। তখন অধোগঠনে উপস্থিত সেই একই বিশেষ্যগুচ্ছ অধিগঠনে ব্যবহার করা হয় না। একটি ব্যবহার করা হয় আর অন্যগুলি তখন বাদ যায়। একেই সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন বলা হয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

অধোগঠনের বাক্যগুলি	সংবর্তন	অধিগঠনের বাক্য
রাম বাড়ি যাবে। রাম পড়তে যাবে। রাম ভাত খাবে। রাম শুতে যাবে।	সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন →	রাম বাড়ি গিয়ে [রাম Ø] পড়তে বসবে আর [রাম Ø] ভাত খেয়ে [রাম Ø] শুতে যাবে

একটি বাক্যে একের বেশি একই বিশেষ্যগুচ্ছ হল — সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ। একই বিশেষ্যগুচ্ছ বারবার ব্যবহৃত হলে শ্রুতিমধুর হয় না। তাই প্রথমটি ছাড়া বাকিগুলির বিলোপন ঘটান হয়। এছাড়া দ্রুত বলা, সহজ করে বলা প্রভৃতি কারণও বিলোপনের ক্ষেত্রে কাজ করে।

২. স্থিতিশীল বিলোপন

কিছু আছে বা অবস্থান করছে বোঝাতে যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয় তাকে স্থিতি ক্রিয়া বলে। যেমন, আছে, রয়েছে ইত্যাদি। স্বাভাবিক কথাবার্তা বলার সময় কিংবা খুব তাড়াতাড়ি কিছু বলার সময় এই স্থিতিক্রিয়া বাদ যায়। একে স্থিতিক্রিয়া বিলোপন বলে। যেমন,

সামনে বাস আসছে ⇒ সামনে বাস

তোমার পায়ের কাছে সাপ রয়েছে ⇛ পায়ের কাছে সাপ

আমার গাড়ির সামনে বিশাল গাড্ডা রয়েছে ⇛ সামনে বিশাল গাড্ডা

তোমার পিছনে বাঘ আছে ⇛ পিছনে বাঘ

স্থিতি ক্রিয়া বিলোপনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততার জন্য নানাবিধ বিলোপন পাশাপাশি ঘটছে। এই সব উদাহরণে মূল বিষয়টিকেই কেবল গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বাকি উপাদানগুলির বিলোপন ঘটছে। এই বিলোপন প্রক্রিয়াটি অধোগঠন থেকে অধিগঠনে কেমনভাবে ঘটছে তা একটি রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

অধোগঠন।

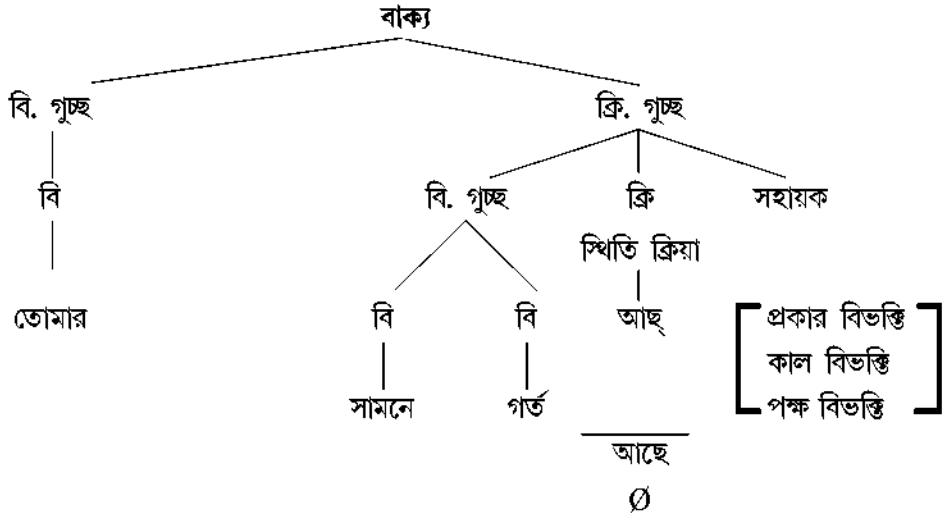

সংবর্তন।

বাধ্যতামূলক সংবর্তন। Ø

স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন —

সহায়ক বিলোপন — তোমার সামনে গর্ত

অধিগঠন। Ø

বি. গুচ্ছ' বিলোপন সামনে গর্ত

অধিগঠন

এভাবে নানা ধরনের বিলোপন বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে। যেমন, সমধর্মী ক্রিয়াগুচ্ছ বিলোপন, সংযোজক ক্রিয়া বিলোপন, গুরুত্বহীন উপাদান বিলোপন, প্রশ্ন বাক্যে বিলোপন ইত্যাদি নানা ধরনের বিলোপন বাংলা বাক্যের আন্বয়িক গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাবে।

১১.৭.২ সংযোজন জাতীয় সংবর্তন

একটি ক্ষুদ্র বাক্যে অন্য উপাদান যুক্ত করলে বা একটি বাক্যের সঙ্গে আরেকটি বাক্য যোগ করলে সংযোজন (Addition) ঘটে। বাংলা বাক্যে নানা ধরনের সংযোজন দেখা যায়। এখানে দুয়েকটি সংযোজন জাতীয় সংবর্তন দেখানো হল।

৩. 'যে' সংযোজন

বাংলা বাক্যে নানাভাবে। 'যে' সংযোজন ঘটতে পারে। যে সংযোজনের ফলে বাক্যের অর্থ কিছুটা বদলেও যেতে পারে। যেমন,

'সে বলল' এই বাক্যে সাধারণ বিবৃতি প্রকাশ পাচ্ছে। 'যে' যোগ করার ফলে 'বলার' বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে — 'সে যে বললো'। আবার 'সে গাইল' ⇒ 'সে গাইল যে'। বোঝা যাচ্ছে গাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু গেয়েছে এই বক্তব্যটি প্রধান। 'তুমি কাঁদলে' ⇒ 'তুমি কাঁদালে যে' এই বাক্যেও কাঁদার কথা নয় কেঁদেছে। আর তাই নিয়ে প্রশ্নবাক্য তৈরি হয়েছে।

আশ্রয়ধর্মী বাক্য গঠনের সময় দুটি বাক্যকে জুড়ে দেবার জন্য আশ্রয়ধর্মী উপাদান হিসাবে যে সংযোজিত হয়। যেমন,

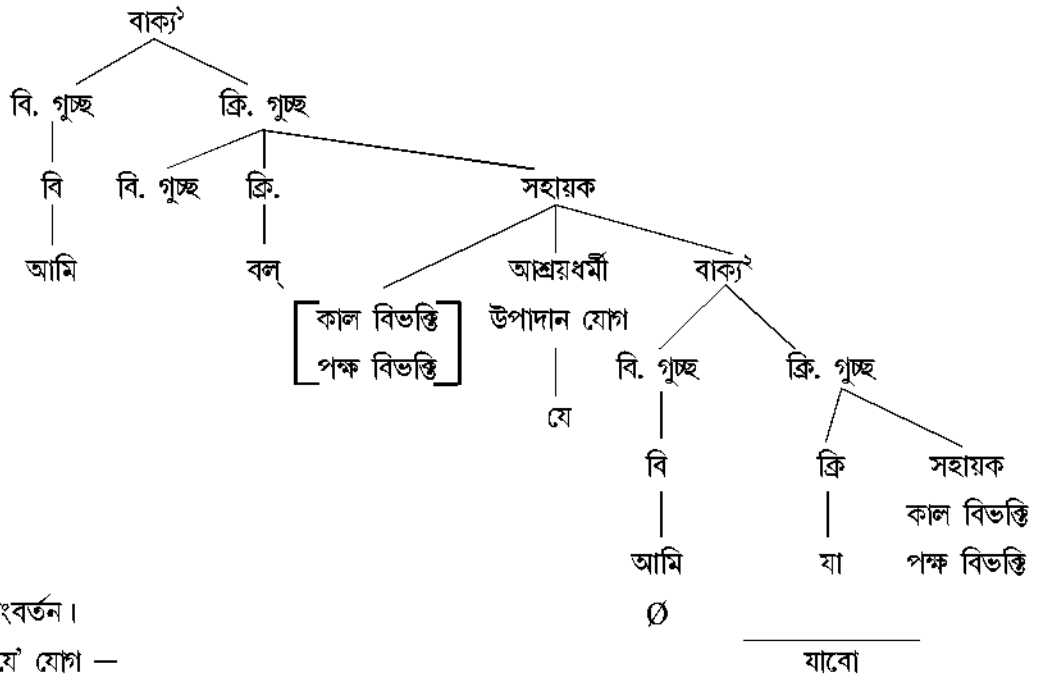

সংবর্তন।

'যে' যোগ —

সমধর্মী বি. গুচ্ছ বিলোপন

অধিগঠন। আমি বললাম যে যাব

অধোগঠন। আমি বললাম। আমি যাব।

৪. বাক্য বিগর্ভণ (Embedding)

একটি বাক্যের মধ্যে আরেকটি বাক্য যদি প্রবেশ করানো হয় তবে সেই সংবর্তনকে বাক্য বিগর্ভণ বলে। যে বাক্যটি প্রবেশ করানো হয় তাকে বিগর্ভিত বাক্য বলে। যেমন,

১. আমটা পচে গিয়েছিল ⇒ নিষ্ঠান্ত বাক্য পচে যাওয়া আমটা

২. আমি ফেলে দিয়েছি।

একটি বাক্যের মধ্যে আরেকটি বাক্য প্রবিষ্ট হয়। যথা— আমি [পচে যাওয়া আমটা] ফেলে দিয়েছি।

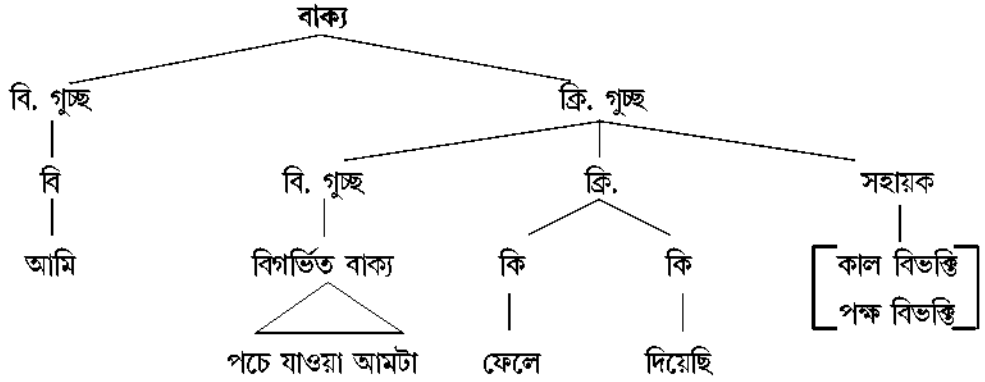

বিশেষীভূত বাক্য, নিষ্ঠান্ত বাক্য, আশ্রয়ধর্মী বাক্য নানা বাক্য এভাবে বিগর্ভিত হতে পারে। যেমন,

{ সে চলে গেছে। / আমি পছন্দ করিনি। }

আমি তার চলে যাওয়া পছন্দ করিনি

বিগর্ভিত বাক্য

{ সে শুনেছিল / লোকটা শাসিয়ে গিয়েছিল }

সে লোকটার শাসিয়ে যাওয়া শুনেছিল

বিগর্ভিত বাক্য

৫. বাক্যের বিশেষ্যীভবন (Nominalization)

যে পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বাক্যকে বিশেষ্যগুচ্ছে পরিণত করা হয় তাকে বাক্যের বিশেষ্যীভবন বলে। বিশেষীভবন করার ক্ষেত্রে নানাবিধ সংবর্তন ঘটে। কোনো বাক্য বিশেষ্যীভূত হলে সেটি তখন আর স্বাধীন বাক্য থাকে না। কোনও একটি বাক্যের বিগর্ভিত বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'সীতা বনে গিয়েছিল' — এই বাক্যটিকে বিশেষ্যীভূত বাক্যে পরিণত করতে গেলে প্রথমে ক্রিয়াপদটিকে ক্রিয়া বিশেষ্য পরিণত করতে হবে। ব্যঞ্জনান্ত ক্রিয়ামূলের ক্ষেত্রে কোনও রকম পরিবর্তন ঘটেনা। যেমন, দেখ্ + আ = দেখা। বল্ + আনো = বলানো। কিন্তু স্বরান্ত হলে শ্রুতিধ্বনির আগাম ঘটে। যা + আ = যাওয়া, পা + আনো = পাওয়ানো।

দ্বিতীয়, বাক্যের কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ বাচক '-র' কিংবা 'এ' বিভক্তি যোগ করতে হবে। সীতা হবে সীতার। এভাবে বিশেষ্যীভবনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ্যীভূত বাক্যটি হবে— 'সীতার বনে যাওয়া'।

বাক্য বিগর্ভন পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ্যীভূত বাক্যটি আরেকটি বাক্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। যথা, বাক্য^{১} [দশরথ [বাক্য^{২} [বিশেষ্যীভূত বাক্য (সীতার বনে যাওয়া)] মেনে নিতে পারে নি

বিশেষ্যীভবনের আরও কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল—

বাক্য		বিশেষ্যীভূত বাক্য
সে এখানে এসেছিল	→	তার এখানে আসা
রাম সিনেমা দেখেছিল		রামের সিনেমা দেখা
বনে বনে ফুল ফুটেছিল		বনে বনে ফুল ফোটা
আপনি চলে যাবেন	→	আপনার চলে যাওয়া
সে যাবে না		তার না যাওয়া
আপনি যাবেন কি		আপনার যাওয়া কি

৬. বাচ্যসংবর্তন

কর্তৃবাচ্যই বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। কর্মবাচ্য বাংলায় নেই। কর্মবাচ্য হিসাবে যে বাক্যগুলি পাওয়া যায় তা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা। যেমন, সে রামকে বই দিল — এই বাক্যটি কর্তৃবাচ্য। কর্মবাচ্য এভাবে করা হল — তার দ্বারা রাম বই প্রাপ্ত হল। বলা বাহুল্য এই ধরনের ব্যবহার স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিকভাবে ভাববাচ্য-ই ব্যবহৃত হয়। যেমন, তার রামকে বই দেওয়া হল। কর্তৃবাচ্যকে ব্যক্তিক (Impersonal) বাচ্য বলা হবে। ব্যক্তিক বাচ্যকে নৈর্ব্যক্তিক বাচ্যে করার একটি সূত্র তৈরি করা যায়।

বাক্য সংবর্তন।

ব্যক্তিক বাচ্য [বি. (+ কর্তা ক্রি)] + ক + খ + n + [ক্রি]

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

নৈর্ব্যক্তিক বাচ্য [বি. + সম্বন্ধবাচক] + ক + খ + n + [ক্রিয়া বিশেষ্য + হ/যা/চল ধাতু]

সূত্রটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, বিশেষ্যীভবনের মতো প্রায় একই নিয়ম ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ ক্রিয়াপদটি ক্রিয়াবিশেষ্যে পরিণত হচ্ছে। আর বাক্যের কর্তা হচ্ছে সম্বন্ধবাচক। ক্রিয়াবিশেষ্যর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে হ/যা/ছল এগুলির মধ্যে যে কোনো একটি ধাতু। বাকি শব্দগুলির কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। যেমন,

প্রত্যক্ষ বাচ্য - আমি বাড়ি যাব ⇛ পরোক্ষ বাচ্য — আমার বাড়ি যাওয়া হবে।

এখানে কর্তা আমি হবে কর্তা + সম্বন্ধসূচক — আমার।

ক্রিয়া 'যাবো' হবে — যাআ = যাওয়া

তারপর হ / যা / বল যোগ হবে। হবে / যাবে / চলবে যে — কোনো একটি।

বাকি উপাদানগুলির বদল হবে না। ফলে বাক্যটি পাবো —

পরোক্ষবাচ্য ⇛ আমার বাড়ি যাওয়া হবে।

এই সূত্র অনুসারে বিশাল আয়তনের বাক্য বাক্যান্তরিত রাখা সম্ভব। যেমন,

সে খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে তারপর কিছুটা ঘুরে বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে এসে স্নান করে ভাত খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম করে জামাকাপড় পরে একটা গাড়িতে চেপে অফিসে যাবে।

এখানে মাত্র দুটি বাক্যের পরিবর্তন হবে। সে > তার। যাবে > যাওয়া। এবং যোগ হবে 'হ' ধাতু—'হবে'। বাকি উপাদান অর্থাৎ শব্দগুলির কোনো বদল ঘটবে না। এভাবে পরোক্ষ বাচ্যে বাক্যটি হবে—তার খুব

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে তারপর কিছুটা ঘুরে বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে এসে স্নান করে ভাত খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম করে জামাকাপড় পরে একটা গাড়িতে চেপে অফিসে যাওয়া হবে।

১১.৭.৩ রূপান্তরণ

একটি রূপ বা বাক্যের বদলে অন্য রূপ বা শব্দ স্থাপন করাতে বি-স্থাপন বা রূপান্তরণ বলে। নানাবিধ সংযোজনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে রূপান্তরণ জাতীয় সংবর্তন দেখা যায়। যেমন—বাক্যের বিশেষ্যীভবন ও বাচ্য সংবর্তনের ক্ষেত্রে 'কর্তা' বদলে হয় 'কর্তা' + 'সম্বন্ধসূচক'। ফলে এটি একটি রূপান্তরণ। আবার ক্রিয়াপদ যখন ক্রিয়াবিশেষ্যে পরিণত হয় তখন সেটিও একটি রূপান্তরণ। যেমন, যায়, যাওয়া, যাবে, যাওয়া ইত্যাদি।

৭. সর্বনামীয়পদে সংবর্তন বা সর্বনামীভবন

কোনো বিশেষ্যপদকে যদি সর্বনামপদে সংবর্তীত করা হয় তবে তাকে সর্বনামীভবন বলা হয়। যেমন,

বাক্য-১ আমি রফিককে ডেকেছি।

বাক্য-২ আমি রফিককে পড়াশোনা করতে বলেছি। ⇛

আমি	রফিককে	ডেকেছি	এবং	আমি	রফিককে	পড়াশোনা	করতে	বলেছি।
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
আমি	রফিককে	ডেকেছি	এবং	Ø	তাকে	পড়াশোনা	করতে	বলেছি।

এখানে একই বিশেষ্যগুচ্ছ হওয়ায় একটি বিলোপিত হচ্ছে [আমি ⇛ Ø]। তেমনি একটি বিশেষ্য পদ সর্বনাম পদে সংবর্তীত হচ্ছে। যথা— [রফিককে ⇛ তাকে Ø]। সর্বনামী ভবনের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ্যপদটিকে অবশ্যই একাধিকবার ব্যবহৃত হতে হবে। কোনও স্থানের বা বস্তুর পরিবর্তেও সর্বনামপদ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা, আমি রাজপুরে ছিলাম এবং রাজপুরে বড়ো হয়েছি ⇛আমি রাজপুরে ছিলাম এবং সেখানে বড়ো হয়েছি।

তুমি বইটা কেন এবং বইটা কাগজে মুড়ে ফেলো ⇛ তুমি বইটা কেন এবং ওটা কাগুজে মুড়ে ফেলো।

১১.৭.৪ বিপর্যাস

যখন একটি বাক্যের দুটি উপাদান অর্থাৎ দুটি রূপ বা পদ পরস্পর স্থান বদল করে তখন তাকে বিপর্যাস জাতীয় সংবর্তন বলা হয়। নানা ধরনের বিপর্যাস বাংলা ভাষায় দেখা যায়। এখানে উদাহরণ হিসাবে দুটি বিপর্যাস দেখানো হল।

৮. বিশেষণ সংবর্তন

বাংলা ভাষায় বিশেষণের কাজ আসলে ক্রিয়াপক্ষের মতো। অধোগঠনে তার অবস্থান ক্রিয়াপদের স্থানে। অধিগঠনে বিশেষণপদ বিশেষ্যের আগে বসে। ফলে তৈরি হয় বিপর্যাস সংবর্তন। যেমন, 'ফুলটি হয় লাল' অধোগঠনের এই গঠনটিতে 'লাল' আর 'ফুল'-এর অবস্থানগত বিপর্যাস হয়। তৈরি হয় বিশেষণ পদ — 'লাল ফুল'। এভাবেই বিপর্যাস জাতীয় সংবর্তনের অজস্র বিশেষণপদ তৈরি হয়। যেমন,

তুমি হও ভালো মানুষ	বিপর্যাস	ভালো মানুষ তুমি
শ্যাম হয় চালাক	→	চালাক শ্যাম
মোহন হয় ভদ্রলোক	বিশেষণ সংবর্তন	ভদ্রলোক মোহন

৯. বিশেষণ পরস্থাপন সংবর্তন

বিশেষণ বিশেষ্যর আগে বসে অধিগঠনে। কিন্তু অনেকসময় এই আগে বসা বিশেষণ বিশেষ্যর পরে বসতে পারে। এ ধরনের বিপর্যাস-কে বিশেষণ পরস্থাপন সংবর্তন বলে। যেমন,

দেবী হন দশভুজা ⇛ দশভুজা দেবী

এভাবেই দেবী হন বিশালাক্ষী হয়েছে 'বিশালাক্ষী' দেবী।

১১.৮ আলফা স্থানান্তকরণ

Government & Binding বা Principles and Parameter (P&P) তত্ত্ব অনুসারে সংবর্তন বা স্থানান্তকরণ (movement) দু-ধরনের।

১. রূপান্তরণ সূত্র (Substitution Rule) — একটি উপাদানকে সরিয়ে শূন্য শ্রেণিতে রাখা হয়। সেখানে সাধারণত একই ধরনের অন্য উপাদান থাকে। যেমন, যে কোনো উপাদান স্থানান্তকরণ।

২. সংবর্তন সূত্র (Adjunction Rule) — একটি উপাদান আছে। তার সঙ্গে আর একটি উপাদান জুড়ে দেওয়া হল। ফলে নতুন একটি পর্ব তৈরি হল। যেমন, বিপর্যাস জাতীয় স্থানান্তকরণ।

এ সব স্থানান্তরণ-ই আলফা মুভমেন্ট (Alpha Movement) হিসাবে পাব। এখানে দুয়েকটি আলফা স্থানান্তকরণ এর উদাহরণ দেওয়া হল।

১. বিশেষ্যগুচ্ছ স্থানান্তরণ।

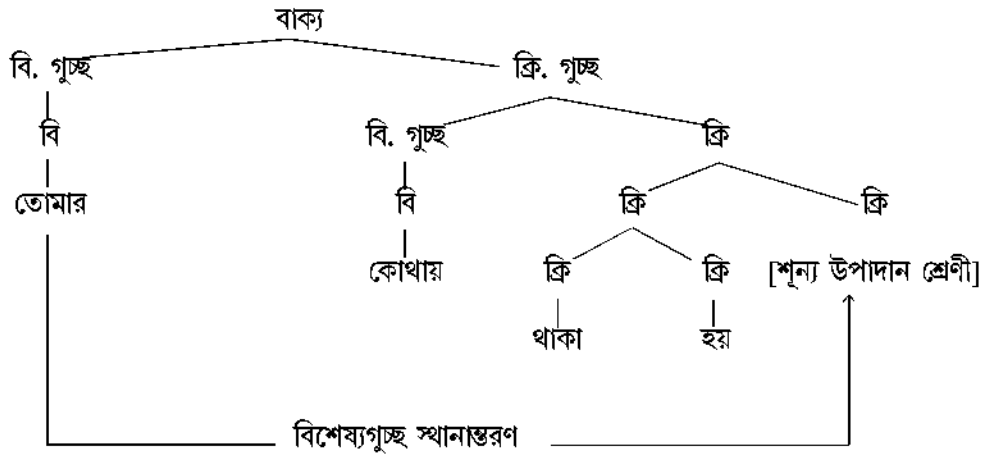

এস গঠন — কোথায় থাকা হয় তোমার।

২. বিপর্যাস জাতীয় স্থানান্তকরণ।

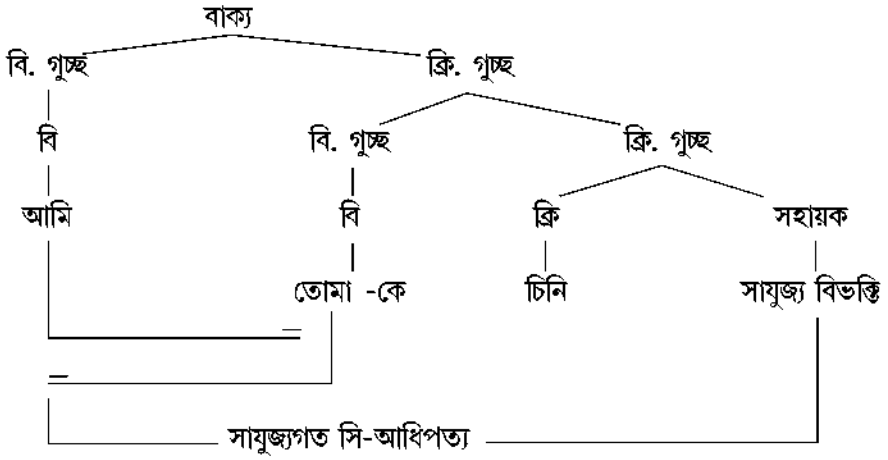

এস. গঠন — তুমি আমাকে চেনো।

৩. প্রশ্নবোধক উপাদান স্থানান্তকরণ।

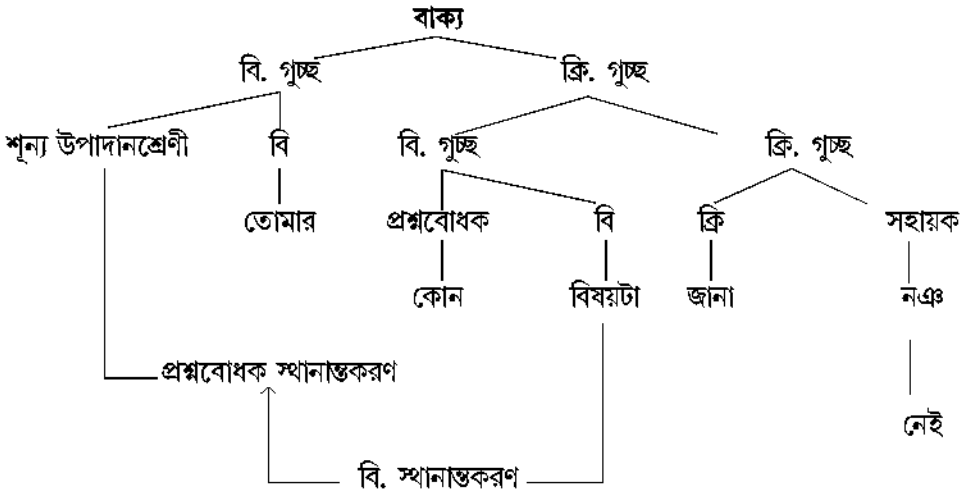

এস গঠন — কোন বিষয়টা তোমার জানা নেই ?

১১.৯ সারাংশ

বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন চমস্কি প্রদত্ত গঠনের থেকে একটু আলাদা। বিশেষ্যগুচ্ছ[২] এবং সহায়কের অবস্থান বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠন অনুসারে তৈরি করা হবে। বাংলা পদগুচ্ছ ছ প্রকারের সম্পর্কবাচক, বিশেষ্যধর্মী, বিশেষণধর্মী, নিষ্টান্তবাচক, ক্রিয়াবিশেষণ বাচক এবং ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ। বিশেষ্যগুচ্ছও

নানা প্রকারের। বিশেষ্য, সম্বন্ধক, সংযোজক, বিশেষণ, প্রতিনির্দেশক, বাক্য প্রভৃতি যোগ করে বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরি হয়। ক্রিয়াগুচ্ছে থাকে বিশেষ্যগুচ্ছ, ক্রিয়া, সহায়ক প্রভৃতি। বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন মূলত সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে আলোচনা করা হয়েছে। চার ধরনের সংবর্তন—সংযোজন, বিলোপন, রূপান্তরণ ও বিপর্যাস এবং অন্তর্গত নানাবিধ সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ বিলোপন, স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন, যে সংযোজন, বাক্য বিগর্ভণ, বাক্যের বিশেষ্যীভবন, বাক্য সংবর্তন, সর্বনামীভবন, বিশেষসংবর্তন, বিশেষণ পরস্থাপন প্রভৃতি। পরিচালন ও আবন্ধীকরণ (G. B.) তত্ত্ব অনুসারে আলফা স্থানান্তকরণ যাকে বলে এবং আলফা স্থানান্তকরণের কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১০ অনুশীলনী

১. বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রটি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. বাংলা পদগুচ্ছ কত প্রকারের হতে পারে এবং কী কী ?

৩. বাংলা বিশেষ্যগুচ্ছ কত প্রকারের হতে পারে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪. বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তন কত ধরনের হতে পারে উদাহরণ দিয়ে কয়েকটি সংবর্তন প্রক্রিয়া দেখান।

৫. বিলোপন কাকে বলে ? বিলোপন জাতীয় সংবর্তনগুলি দেখান।

৬. সংযোজন কাকে বলে ? সংযোজন জাতীয় সংবর্তনগুলি দেখান।

৭. বাংলা বাক্যের রূপান্তকরণ ও বিপর্যাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮. আলফা স্থানান্তকরণ কাকে বলে ? উদাহরণসহ আলফা স্থানান্তকরণ প্রক্রিয়াটি দেখান।

৯. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র, খ. সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ, গ. বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ, ঘ. বিশেষণধর্মী পদগুচ্ছ, ঙ. ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ, চ. সিদ্ধান্তবাচক পদগুচ্ছ, ছ. ক্রিয়াবিশেষণ গুচ্ছ, জ. সমধর্মী বিশেষণগুচ্ছ বিলোপন, ঝ. স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন, ঞ. যে সংযোজন, ট. বাক্য বিবর্ধন, ঠ. বাক্যের বিশেষ্যীভবন, ড. বাচ্য সংবর্তন, থ. রূপান্তরণ সূত্র-সংযোজন সূত্র, দ. আলফা স্থানান্তকরণ।

১০. রেখাচিত্র দ্বারা বাক্যগুলির সংবর্তন প্রক্রিয়া নির্দেশ করুন।

ক. বাক্য সংবর্তন ⇒ যে আমাকে ডাকল। রামবাবু গাছে বলি দিচ্ছিলেন। আপনি তখন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। তিনি ঘুমোতে গিয়ে জেগে উঠলেন।

খ. বিশেষ্যভবন ⇒ তুমি হাজির থাকবে। সে গাইবে বলেছিল। রহিম দোকানে যাচ্ছিল।

গ. স্থিতিক্রিয়া বিলোপন ⇒ আমার সামনে বাঘ রয়েছে। যদুর সামনে বাস আসছে।

ঘ. বাক্য বিবর্তন ⇛ যে আমাকে দেখল। রাম বিস্কুট খাচ্ছিল।

আমি দোকানে যাচ্ছি। রহিম স্পষ্ট দেখল।

১১. কোন ধরনের সংবর্তন হয়েছে তা নির্দেশ করুন এবং এই সঙ্গে সংবর্তন প্রক্রিয়াটি দেখান।

ক. মইনুল বাড়ি গিয়ে পয়সা নিয়ে বাজার যাবে।

খ. সে বলল যে সে বাড়ি যাবে না।

গ. সে আমার চলে যাওয়া দেখল।

ঘ. আপনার কোথায় থাকা হয় ?

ঙ. আমি ছোটনকে ডেকে তাকে গল্প শুনিয়েছি।

চ. চালাক লোকটাকে ডাকো।

ছ. বিশালাক্ষী দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাও।

জ. থাকেন কোথায় আপনি ?

ঝ. সে আপনাকে চেনে ⇛ আপনি তাকে চেনেন।

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন ; ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন।

১৯৯৮, বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

সরকার, পবিত্র ; 'সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা বিচারে তার প্রয়োগ' রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, বর্ষ ১৬ সংখ্যা - ৪।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ সমাজভাষাবিজ্ঞান
উপভাষাতত্ত্ব ঃ ভাষাপরিকল্পনা

একক ১২ ❐ সমাজভাষাবিজ্ঞান ঃ প্রাথমিক ধারণা

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ ভাষার সমাজতত্ত্ব

১২.৪ সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

১২.৫ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা

১২.৬ সরল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

১২.৭ প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

১২.৮ সারাংশ

১২.৯ অনুশীলনী

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- সমাজ আর ভাষার তাত্ত্বিক সম্পর্কের দিকটি পরিষ্কার হবে।
- ভাষার সমাজতত্ত্ব নাকি সমাজভাষার তত্ত্ব কোন দিকে থেকে আলোচনা করা হবে তার একটি পরিচয় প্রকাশিত হবে।
- সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার এলাকা সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি হবে।

১২.২ প্রস্তাবনা

ভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচনার এলাকা ভাষার ব্যাকরণ। এই মূল আলোচনার এলাকাকে কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞান বললে তার পরিমণ্ডলে আসে একাধিক ভাষাবিজ্ঞানের শাখা। অন্যান্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব মিলিতভাবে এই বহিরঙ্গ ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলি তৈরি করেছে। একটি রেখাচিত্র দেখা যাক,

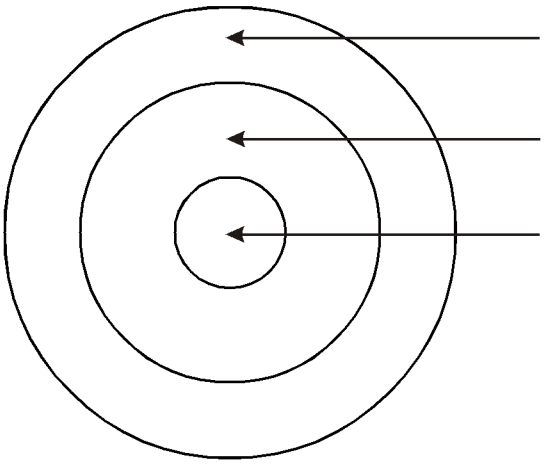

অন্যান্য বিজ্ঞান আর ভাষাবিজ্ঞানের মাঝখানে অবস্থিত এই বহিরঙ্গ ভাষাবিজ্ঞান। সমাজভাষাবিজ্ঞানে যখন ভাষাবিজ্ঞান বিষয়টি এসে পড়ে তখন তা অন্যান্য বিজ্ঞানের বহিরঙ্গ এলাকায় অবস্থান করে। আর ভাষাবিজ্ঞানে সমাজবিজ্ঞানের কথা ভাবলে তা আসবে ভাষাবিজ্ঞানের বহিরঙ্গ এলাকায়। আর তাই সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষা সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা হল—ভাষার সমাজতত্ত্ব। ভাষাবিজ্ঞানী যখন সমাজভাষা নিয়ে ভাবেন তখন তা হল—সমাজভাষাবিজ্ঞান।

১২.৩ ভাষার সমাজতত্ত্ব

সমাজের সঙ্গে ভষার সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা হল—ভাষার সমাজতত্ত্ব। এর আলোচনার এলাকা বিশাল। তবে এর বেশিরভাগ কাজই হয়েছে যেসব অঞ্চলে একের বেশি ভাষা আছে সেইসব ভাষা সম্প্রদায় নিয়ে। দেখা হয়েছে ভাষা ব্যবহারের নানা ভূমিকা। J. Fishman ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি বলেছিলেন আমাদের দেখতে হবে, কে কোন্ ভাষা বলছে ? কাকে বলছে ? কখন বলছে ? এবং কোথায় বলছে ? কেন বলছে তাও দেখা দরকার বলে অনেকে মনে করেন। যখন পাশাপাশি একাধিক ভাষা বলা হচ্ছে তখন একজন লোক কোন ভাষাটি পছন্দ করছে তা দেখা কিংবা সমাজভাষা আর উপভাষা কোনটির বেশি নিচ্ছে অথবা একই উপভাষার মধ্যে কোন উপাদান বেশি পছন্দ করছে তা দেখা আসলে 'সংকেত বাছাই' (Code choice) পদ্ধতি দেখা। ভাষার সমাজতত্ত্বে এই দিক্‌গুলি দেখা হয়। যেমন,

ক. সংকেত বাছাই-এর একটি দিক হল সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া কোন ভাষা ব্যবহার করব। কখনো তা জাতি বা রাষ্ট্র করে কখনো বা বিশেষ সম্প্রদায় বা ব্যক্তি। একে 'ভাষা পরিকল্পনা' বলা হয়। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. সংকেত বাছাই এর নানা স্তর থাকে।

Fishman বলেছিলেন সংকেত পরিবর্তনের (Code Switching) কথা। অবস্থা অনুসারে অনেকগুলি পরিবর্ত উপাদান থাকে। সাধারণত একটি সংকেতই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যখন উপাদানগুলির একটি বদলে যায় তখন বক্তা ইচ্ছে করলে ভাষা পরিবর্তন করে কথা বলতে পারেন। একেই সংকেত পরিবর্তন বলে।

Gumperz একে 'অবস্থানুসারে পরিবর্তন' (situational switching) বলেছেন। তিনি বলেন অবস্থা না বদলালেও বক্তা ইচ্ছা করে সংকেত পরিবর্তন করতে পারেন। আর এই সঙ্কেতের সঙ্গে সামাজিক বা সংস্কৃতিগত কিছু অনুষঙ্গ থাকে। একে 'রূপক-অনুযায়ী পরিবর্তন' (Metaphorical Switching) বলেছেন। Braj Kachru বলেন যখন পাশাপাশি অবস্থিত সংকেতগুলি নিয়মিতভাবে একটা অন্যটার সঙ্গে সংকেত পরিবর্তন করে তাকে 'সংকেত মিশ্রণ' (Code Mixing) বলে।

সংকেত পরিবর্তন আলঙ্কারিক কৌশল হিসেবেও বাক্য সৌন্দর্য তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ. সংকেত বাছাই করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় প্রভাব ফেলে তা নিয়ে নানা গবেষণা করা হয়েছে। এ সবই সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন, সামাজিক নানা ঘটনা। যথা, দোকান বাজার করা, নানা ধর্মানুষ্ঠান, নানা সামাজিক অনুষ্ঠান। সময় বা স্থানগত দিক সংকেত বাছাই করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয়। যেমন, গ্রাম বা শহর। যারা কথা বলে তাদের মানসিক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে কাজ করে।

লিঙ্গ অনুসারে, বয়স অনুসারে, শিক্ষা অনুসারে বা নৃ-গোষ্ঠী অনুসারে এই সংকেত বাছাই ঘটতে পারে। মুখের ভাষা লিখিতভাষা অনুসারে এবং সাধু-চলিত অনুসারেও সংকেত বাছাই ঘটে।

সমাজসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কারণও সংকেত বাছাই-এর ক্ষেত্রে কাজ করে। যেমন, যিনি বলছেন তিনি যাদের সঙ্গে কথা বলছেন তাদের ভাষা ভালোভাবে জানেন না।

ঘ. নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কিছু সংকেত ব্যবহার করা হতে পারে। যেমন, স্কুলে বা প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলায়। ধর্মের ক্ষেত্রে বা বাড়িতে। এগুলিও সংকেত বাছাই পর্যায়ে পড়ে।

ভাষাসংকেত বাছাই এর নমুনা এবং তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতি সমাজতাত্ত্বিকগণ নানাভাবে দেখেন। নানা শাস্ত্রের উদাহরণ সংগ্রহ কিংবা সাক্ষাৎকার নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের সাধারণ ক্ষেত্রগুলি নির্বাচন করেন। ভাষাজরিপের মাধ্যমে দেখা হয়। প্রশ্নোত্তর ও ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব নিকাশ করা হয়। সরাসরি নমুনা সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করলে তাতে ভুল তথ্য পাওয়ার ঝঞ্ঝাট কম।

অন্যদিকে পরোক্ষভাবে লিখিত প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ খুব দ্রুত ও প্রচুর সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করার পক্ষে ভালো। তবে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।

ভাষার সমাজতত্ত্বে ক্ষমতার সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা নেয়। শাসকের ভাষা গোষ্ঠীর ভাষা মর্যাদা লাভ করে।

ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষাসংকেত বাছাই হিসাবেও লক্ষ করা হয়।

১২.৪ সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

মুখের ভাষা Sociolinguistics নামটি জানা না থাকলেও অনেক আগে থেকেই সমাজের নানা স্তরের লোকজনদের নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' নিয়ে কাজ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২৬-এ সুকুমার সেন মেয়েদের মুখের ভাষা নিয়ে রচনা করেছিলেন 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা'। স্থান নাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করেছিলেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "Origin and Development of Bengali Language" (O. D. B. L) গ্রন্থে। তারপর স্থান নাম নিয়ে গবেষণা করেছেন কৃষ্ণপদ গোস্বামী।

আমাদের দেশের এসব কাজের আগে পাশ্চাত্যে F. de. Saussure ভাষার সামাজিক দিকগুলি দেখার কথা বলেছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে Harer C. Currier প্রথম 'Sociolinguistics' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন বলে আমরা জানতে পারি [মৃণালনাথ, ভাষা ও সমাজ] । পবিত্র সরকার 'ভাষা-দেশ-কাল' গ্রন্থে জানান মার্কিনদেশে ১৯৫২-র আগে এই নামটি বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু এর আগে চারের দশকে নানা আঞ্চলিক উপভাষার 'social analysis' আরম্ভ হয়ে যায়। রাজীব হুমায়ুন জানান,

"ম্যারিয়েল স্যাভিলট্রেইকের মতে, সব চাইতে পুরনো সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সন্ধান লাভ করা যায়, জে. বি হোয়াইটের রচনায়। ১৮৮০ সালে তিনি আপাচে অভিনন্দন রীতি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন।"

[সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, পৃ-১৪]

এডওয়ার্থ সাপির, ম্যালিনোভস্কি, ম্যাকডেভিড, ফার্থ প্রমুখ ১৯১৫ থেকে ১৯৫১র মধ্যে সমাজভাষাবিষয়ক নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে তাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া যায়নি। তবুও সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় তার একটি ধারণা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। সমাজভাষাবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র নির্মাণের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছিল।

Haver C. Curriec সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে বুঝিয়েছিলেন সমাজের নানা কাজকর্মের সঙ্গে কথা বলার তাৎপর্যগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। ভাষার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্কও যুক্ত করেছিলেন। আর এই গবেষণার ক্ষেত্রকেই তিনি 'Sociolinguistics' বলেছেন। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি ঠিকঠাক ব্যবহার করেন Bright ও A. K. Ramnajan. ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। W. Labod ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বলেছিলেন যে, সমাজভাষাবিজ্ঞান পরিভাষাটি ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বলেন ভাষা সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। এমন কোনো তত্ত্ব হতে পরে না যা সামাজিক নয়। ফলে অতিরিক্ত পরিভাষার দরকার নেই।

Hardson ১৯৮৬ তে প্রকাশিত 'Sociolinguistics' গ্রন্থে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে ভাষার অধ্যয়ন হল—সমাজভাষাবিজ্ঞান, এটি ভাষা অধ্যয়নের একটি অংশ। ভাষার সমাজতত্ত্ব ও সমাজভাষাবিজ্ঞান এ দুটিকে তিনি আলাদা করতে চান না।

R. T. Bell 'Sociolinguistics : Goals, Approaches and Problems' (1976) গ্রন্থে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে এমন একটি শাস্ত্রের কথা বলেছেন যা সামাজিক উপাও (data) থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে আরও শক্তিশালী করবে।

P. Trudgil তাঁর 'Socialinguistcs, and Introduction to language and Society' (১৯৮৬) গ্রন্থে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে ভাষাবিজ্ঞানের অংশ বললেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় হিসাবে ভাষাকে দেখানো হয়। আর সমাজবিজ্ঞান, সমাজ মনস্তত্ত্ব নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে ভাষা ও সমাজের ওপর নানা দিক লক্ষ করে এই সমাজভাষাবিজ্ঞান।

Fishman ভাষার সমাজতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ভাষার সমাজতত্ত্বকে বর্ণনামূলক, গতিশীল ও প্রয়োগমূলক এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। আর Bright সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে 'linguistic diversity' অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বগত বিভিন্নতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

১২.৫ সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকা

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রগুলি বা এলাকা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নরকম মতবাদ প্রকাশ করেছেন। Bright ভাষা বৈচিত্র্যের ওপর জোর দিয়েছেন এবং তিনি সাতটি মাত্রার কথা বলেছেন। Fishman তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন। রাজীব হুমায়ুন বাংলায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে কাজ করেছেন তাতে তিনি Trudgil-এর মত অনুসরণ করেছেন। পবিত্র সরকার Fishman ও Bright কে মিলিয়ে একটি নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। মৃণাল নাথ Newstupry-র পাঁচটি ভাগকে মনে রেখে প্রয়োজনীয় চারটি ভাগ গ্রহণ করেছেন। এগুলি হল—

- অন্যোন্য ক্রিয়াবাচক (Interactional)
- পরসম্পরসম্বন্ধী (Corelational)
- ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা সংযোগ (Language Change and Language Contract)
- ভাষা সমস্যা (Language problem)

অনেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকায় নিম্নলিখিত ভাগগুলি রাখতে চান।

- পারস্পরিক কথোপকথনমূলক (International) সমাজভাষাবিজ্ঞান
- ভাষা পরিকল্পনা (Language Planning)
- ভাষা লঘু-সম্প্রদায় (Minorities) ও সমাজবিজ্ঞান
- পরিমাণবাচক (Quantitative) সমাজভাষাবিজ্ঞান
- সমাজপ্রতিষ্ঠানমূলক (Sociohistorical) সমাজভাষাবিজ্ঞান।

[দ্রঃ W. Bright সম্পাদিত Internation Encyclopedia of Linguistics, Col-4]

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। Fishman সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে তিনটি দিকের কথা বলেছেন এবং Bright যেভাবে ভাগগুলি করতে চেয়েছেন সেভাবে আমরা সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাটি এখানে আলোচনা করবো।

ক. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

খ. সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

গ. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

এখানে পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান এবং প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে প্রথম আলোচনা করা হবে। পরবর্তী এককে বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

১২.৬ সচল বা পরিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান

Fishman-এর পরিভাষা-ডাইন্যামিক সোসিওলিঙ্গুইসটিক্স্। পবিত্র সরকার এর বাংলা করেছেন সচল বা বিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান। এখানে সমাজভাষার উদ্ভব, বিবর্তন, বিস্তার ও সংকোচন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যক্তিকে অবলম্বন করে সমাজভাষার বিবর্তনটি দেখতে চেয়েছেন Fishman। স্থিতিশীল এবং অ-স্থিতিশীল এই দু'ধরনের দ্বিভাষিকতা তিনি দেখেছেন। দ্বিভাষিকতা নিয়ে আমরা পরবর্তী এককে আলোচনা করেছি। Labour মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুয়েট্স-এ 'মার্থার ভাইনইয়াড' দ্বীপে একটি ভাষা সমীক্ষা করেন। সেখানে তিনি দেখেন বাইরে থেকে আসা লোকজনদের উচ্চারণের প্রভাবে অল্প বয়সী যুবকদের উচ্চারণ বদলে যাচ্ছে। কিন্তু বয়স্কদের উচ্চারণ বদলায়নি। লেবভ দেখান নিজের সংযুক্তির প্রতি মমত্ববোধ আর মান্য ভাষার দিকে এগিয়ে যাওয়ার টানাপোড়েন চলে। ভাষার বিবর্তন নানা কারণে তাই ঘটে। নানা প্রভাবে বদলে যায়। সমাজভাষায় ব্রাইট এই ধরনের সমাজভাষা বিজ্ঞানকে কালানুক্রমিক (Dianamic) সমাজভাষাবিজ্ঞান বলে মনে করেন।

১২.৭ প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

Fishman বলেছেন প্রয়োগমূলক ভাষার সমাজতত্ত্ব আর Bright বলেছেন Application বা প্রয়োগ। ব্রাইট ভাষার লক্ষণ দেখে জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার কথা বলেছেন। এটি হল সামাজিক গঠনের নানা দিক। ইতিহাসের দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে বলে মনে হয়। এই একটি সমাজ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভাষা আলাদা হয় কিনা তা দেখাও গুরুত্বপূর্ণ। একই ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন সমাজভাষা বিভিন্ন সময় বদলে যায় কিনা সেটা দেখাও দরকার।

ব্রাইট যখন এইসব দিক খুঁজে দেখার কথা বলেন তখন ফিশম্যান প্রয়োগের কথা বলেন। সমাজের নানা কল্যাণকর দিকের সঙ্গে সমাজে ভাষার পরিকল্পনামাফিক প্রয়োগের কথা ফিশম্যান বলেন। মাতৃভাষা শেখানো, অন্য ভাষা বোঝানো, অনুবাদ, লিপি, বানান প্রভৃতি বিষয়ের কথা তিনি বলেছেন।

আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞান এই সব প্রয়োগমূলক বিষয় ভাষা পরিকল্পনা বা Language Planning হিসাবে দেখা হয়। আমরা ভাষা পরিকল্পনা নিয়ে পৃথক দুটি এককে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

১২.৮ সারাংশ

সমাজতত্ত্ব আর ভাষাবিজ্ঞান-এর মিলিত রূপ-সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাষার সমাজতত্ত্ব আর ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমাজভাষাবিজ্ঞান। ভাষার সমাজতত্ত্বে সংকেত বাছাই-এর ক্ষেত্রে সংকেত পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানে সমাজের নানা কাজকর্মের সঙ্গে কথা বলার তাৎপর্য কিংবা সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে ভাষার অধ্যায়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের নানা এলাকার মধ্যে-বর্ণনামূলক, পরিবর্তমান এবং প্রয়োগমূলক এই তিনটি প্রধান দিক আলোচনা করা হয়। পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন বাংলায় সরাসরি তেমনি ভাষাবিজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্দেশ করা প্রয়োজন।

১২.৯ অনুশীলনী

১. ভাষার সমাজতত্ত্ব ও সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন।

২. সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র বা এলাকাটি নির্দেশ করুন।

৩. সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. সংকেত বাছাই খ. পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান গ. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ১৯৮৩, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রত্নাবলী, কলকাতা।

নাথ, মৃণাল ১৯৮৯, সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা, বাংলাদেশভাষা সমিতি, ঢাকা ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

সরকার, পবিত্র, ১৯৮৪, ভাষা-দেশ-কাল, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা।

হুমায়ুন, রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Downes, William 1988, Language and Society, Fontana, Paperbacks.

Hudson, R. A 1980, Sociolinguistics, Cambridge University Press.

Labor, W. 1978, 'Sociolinguistics' in Dingwall, 1978, 339-375.

একক ১৩ ❐ বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ বক্তা-শ্রোতা

১৩.৩.১ বক্তা

১৩.৩.২ শ্রোতা

১৩.৪ উপলক্ষ্য

১৩.৪.১ ভাষারীতির বদল

১৩.৪.২ উচ্চতম ভাষা-দ্বিবচন

১৩.৫ দ্বিভাষিকতা

১৩.৬ রেজিস্টার

১৩.৭ সমাজভাষা-সামাজিক স্তর

১৩.৮ মিশ্রভাষা

১৩.৮.১ প্রিজিন ভাষা

১৩.৮.২ ক্রেওল ভাষা

১৩.৯ সারাংশ

১৩.১০ অনুশীলনী

১৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- সমাজ আর ভাষার ব্যবহারগত দিকটির সম্পর্ক বোঝা যাবে।
- বক্তা আর শ্রোতার সঙ্গে বিষয়বস্তু-উপলক্ষ্য স্থান-সমাজ ইত্যাদির সম্পর্ক আছে তা উপলব্ধি করা যাবে।

- পাশাপাশি অবস্থিত ভাষাগুলির সম্পর্ক-মিশ্রণ কিংবা গ্রহণ বর্জন প্রভৃতি বিষয় বোঝা যাবে।
- সমাজের নানা স্তরের ও নানা শ্রেণির মানুষের ভাষা যে আলদা তা বোঝা যাবে।

১৩.২ প্রস্তাবনা

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান অনুসারে Bright ও Fishman-এর তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র সরকার জানিয়েছেন যে, Fishman আমাদের কাছে একটা ফর্মূলামতন করে দিয়েছেন। আমাদের দেখতে হবে কে বলছেন বা লিখছেন। কোন ভাষায় বলছেন, কাকে বলছেন, কখন বলছেন এবং কোন উদ্দেশ্যে বলছেন। এ দিকগুলি দেখতে হবে। পবিত্র সরকারের দেওয়া মডেলটি প্রাথমিকভাবে মনে রেখে আমরা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ দিকগুলি এক এক করে আলোচনা করব।

১৩.৩ বক্তা-শ্রোতা

কথোপকথনের প্রধান তিনটি উপাদান বক্তা-শ্রোতা এবং কোন উপলক্ষ্যে কথা বলা হচ্ছে সেই উপলক্ষ্যটি সমাজভাষাবিজ্ঞানে এই তিনটি উপাদান বিশেষ জরুরি। কথোকথনের নানা পার্থক্য এই তিনি উপাদানের ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে। তাই সকল সমাজ ভাষাবিজ্ঞানী এই দিকগুলির কথা আলোচনা করেছেন।

১৩.৩.১ বক্তা

বক্তা বা প্রেরক (Sender) এর কথা ব্রাইট ও ফিশম্যান উভয়েই বলেছেন। ডেল হাইমস ও ব্রাইট একে বলেছেন Sender বা কর্তা প্রেরক। এখানে বক্তার সামাজিক পরিচয় জানতে হবে। তার শিক্ষা এবং জীবিকা জানতে হবে। নারী না পুরুষ তা জানতে হবে। বয়স জানতে হবে, জাতিগত পর্যায় জানতে হবে। তার আর্থিক অবস্থা জানতে হবে। এর ওপর তার সমাজ উপভাষা (sociolect) নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

১৩.৩.২ শ্রোতা

ব্রাইট বলেছেন receiver আর ফিশম্যান বলেছেন—to whom অর্থাৎ গ্রাহক বা শ্রোতা। কাকে বলা হচ্ছে তার ওপর ভাষার রূপ নির্ভর করে। গুরুজন, সমবয়স্ক বা বন্ধুবান্ধব বা অপরিচিত লোকজন ভেদে আমরা নানারকমভাবে কথা বলি। ফলে, শ্রোতা অনুযায়ী ভাষারীতি বদলাই। যেমন, বাড়িতে বাবা মার সঙ্গে যখন কথা বলি সে কথায় নৈকট্য থাকে কিন্তু তার সঙ্গে থাকে শ্রদ্ধা। ছোট শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় আদরের ভাষা ব্যবহার করি। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথা বলি। আপিসে ব্যবহার করি ফরম্যাল বা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নৈকট্যবাচক ভাষা ব্যবহার করি।

১৩.৪ উপলক্ষ্য

ব্রাইট বলেছেন 'Setting' বা উপলক্ষ্য। ফিশম্যান বলেছেন 'When' বা কখন কথা বলছি। বক্তা-শ্রোতা ছাড়া তৃতীয় বিষয়টি হল কোন্ উপলক্ষ্যে কথা বলা হচ্ছে তা লক্ষ্য করতে হবে। ইংল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানীগণ এই উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষারীতি বদলকে বলেছেন রেজিস্টার। কখন একজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে আর কখন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে—তার ওপর ভাষা বদলে যাচ্ছে বলে ফিশম্যান জানান। ডিউমার দেখিয়েছেন উপভাষা অঞ্চলে জার্মান ছাত্ররা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাই জার্মান বলছে আর বাড়িতে নিজেদের ভাষায় কথা বলছেন। একজন মানুষের সামাজিক ব্যবহারে ভাষার এই বৈচিত্র্যকেই উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষা ব্যবহার বলে চিহ্নিত করা যায়। ডিউমার অনুসারে,

Social Variety বক্তার নিজের ভাষা বৈচিত্র্য।

Functional Variety বক্তা শ্রোতার interation, কথাবার্তা Formal বা informal বিশেষ রীতিনীতি, ব্যবস্থা অনুসারে ভাষার বৈচিত্র্য ও বিকল্পন এর মধ্যে পড়ে।

১৩.৪.১ ভাষারীতির বদল

উপলক্ষ্য বা পরিস্থিতি অনুসারে ভাষারীতির বদল ঘটে। একে Code matching বা সংকেত বদল বলা হয়। এক এক ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য এক এক ধরনের ভাষা। ফিশম্যান ভাষারীতির এই বদলের কথা যেমন বলেছেন তেমনি বলছেন এক এক দেশে আবার ভাষা বদলও ঘটে। বাংলাভাষী লোকেরা অনেক সময় রেগে গেলে হিন্দি বা ইংরেজি বলেন। কোন ভাষা কী উপলক্ষ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করা এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি।

১৩.৪.২ উচ্চতম ভাষা-দ্বিবাচন

● উচ্চতম ভাষা

মান্য বা সম্ভ্রান্ত ভাষা এই সব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপরে থাকে। সবচেয়ে নীচে থাকে সম্ভ্রমহীন ভাষা। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যেমন,

সবচেয়ে ওপরের স্তর—মান্য চলিত বাংলা

সবচেয়ে নিচের স্তর—মস্তান ও অপরাধীদের ভাষা, রসের ভাষা

আর সামাজিক নানা স্তরের ভাষা এর মাঝখানে। মান্য ভাষা সবসময়ই ওপরের স্তরে থাকে। আবার শিক্ষিত লোকজন অনেক সময় বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে বলেন। হিন্দু ধর্মের সংস্কৃত আর ইসলাম ধর্মের আরবি মেশানো বাংলার মর্যাদা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শিষ্ট বাংলার চেয়েও বেশি। পবিত্র সরকার জানিয়েছেন রাজভাষা, দেবভাষা, প্রভৃতি শব্দই সেই মর্যাদা প্রকাশক শব্দ। তবে সাধারণভাবে মান্য ভাষাই অন্য ভাষাগুলির থেকে ওপরে থাকে। তাই ভাষাবিজ্ঞানে একে উচ্চতম ভাষা বা Acrolect বলা হয়।

● **দ্বিবচন**

উচ্চতম ভাষা (Acrolect) হিসাবে মান্য ভাষার আবার একাধিক রূপ থাকতে পারে। এই রূপগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়। বাংলাভাষার সাধু ও চলিত এই দুই স্ট্যান্ডার্ড ১৯৫০ পর্যন্ত পাশাপাশি চলেছে। ১৯৫০ এর পর চলিত ভাষার প্রভাবে বেড়েছে। ১৯৬১ তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর দিন থেকে সংবাদপত্রে চলিত ভাষা গৃহীত হওয়ার পর থেকে চলিত ভাষার প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দুটি স্ট্যান্ডার্ড যখন পাশাপাশি চলে তখন যে অবস্থা তৈরি হয় তাকে 'diglossia' বলে চিহ্নিত করেছেন চার্লস এ ফার্জুসন।

এই পরিভাষাটি তিনি মার্কইস ব্যবহৃত 'diglossie' থেকে গ্রহণ করেন। দ্বিবচন বলতে তিনি একই ভাষার দুটি রূপের বা উপভাষার সমাজনির্দিষ্ট বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করাকে বুঝিয়েছেন। তিনি উচ্চ বাংলা অর্থাৎ সাধু ভাষা ও শিষ্ট চলিত ভাষার পার্থক্য এবং পাশাপাশি অবস্থানকে দেখিয়েছেন। এছাড়া তিনি সুইজারল্যান্ডের জার্মানভাষী লোকের উচ্চ উপভাষা বা প্রাচ্য জার্মান ও নিম্ন উপভাষা অর্থাৎ স্থানীয় সুইসজার্মান ভাষা ব্যবহার লক্ষ করেছেন। লক্ষ করেছেন হাইতি তে ব্যবহৃত হচ্ছে উচ্চ উপভাষা মান্য ফরাসি আর নিম্ন উপভাষা ফরাসিক্রেওল। ফার্গুসন দ্বিবচন নির্বাচনের ন'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এগুলি হল—

ক. **ফাংশান** ঃ

কতকগুলি বিশেষ স্থানে এবং পরিস্থিতিতে উচ্চ উপভাষা বা নিম্ন উপভাষা ব্যবহৃত হবে। যেমন, বেয়ারা, কেরানি প্রভৃতিকে আদেশ পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তায়, বেতারের জনপ্রিয় নাটকে লোকসাহিত্যে নিম্ন উপভাষা ব্যবহৃত হবে। আর ধর্মস্থানে, বক্তৃতায়, শিক্ষকতায়, বেতারে প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হবে উচ্চ উপভাষা।

খ. **মর্যাদা** ঃ

সাধারণভাবে উচ্চ উপভাষার মর্যাদা বেশি। অনেক ক্ষেত্রে আবার নিম্ন উপভাষাকে প্রকৃতভাষা বলে মনে করাই হয় না।

গ. **সাহিত্যিক উত্তরাধিকার** ঃ

সাধারণভাবে সাহিত্য উচ্চ উপভাষাতেই রচিত হয়। অনেকে আবার নিম্ন উপভাষায় লেখা লোকসাহিত্যকে উচ্চ উপভাষায় সংশোধন করে প্রকাশ করেন।

ঘ. **ভাষাশিক্ষা** ঃ

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু কিন্তু নানা উপভাষাই শেখে। স্কুল-কলেজে শেখে ফর্মাল ভাষা।

ঙ. **আদর্শরূপ** ঃ

উচ্চ উপভাষার ব্যাকরণ আছে। নির্দেশমূলক বা আদর্শব্যাকরণ তৈরি হয় উচ্চ উপভাষার উপর ভিত্তি করে। ফলে, তার একটি মান্য রূপ বা আদর্শরূপের ঐতিহ্য বর্তমান। নিম্ন উপভাষার ক্ষেত্রে সেরকম ঐতিহ্য নেই।

চ. **স্থায়িত্ব** ঃ

দ্বিবচন দীর্ঘকাল ধরে চলে আসে। অনেকসময় কোনো একটি ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও বোধহয় বিলুপ্ত হতে দীর্ঘসময় নেয়। যেমন, বাংলা ভাষায় সাধুভাষা বিলুপ্তির পথে চলে এলেও অনেক সাহিত্যিক নতুন করে এই ভাষার প্রতিষ্ঠা দিতে চান। যেমন কমলকুমার মজুমদারের লেখার ভাষা।

ছ. ব্যাকরণ ঃ

ব্যাকরণগত দিক দিয়েও উচ্চ উপভাষার ও নিম্ন উপভাষার তফাত থাকে। নিম্ন উপভাষায় ব্যাকরণগত জটিলতা অনেক কম থাকে। যেমন বাংলা সাধু ও চলিত ভাষায় ব্যাকরণগত পার্থক্য হিসাবে বলা যায় ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ আলাদা-যাইতেছে (সাধু) যাচ্ছে (চলিত) ইত্যাদি।

জ. শব্দভাণ্ডার ঃ

শব্দভাণ্ডারে তেমন কোনো তফাত দেখা যায় না। তবে উচ্চ উপভাষায় পারিভাষিক শব্দ, স্বল্প প্রচলিত শব্দ বা পরিবর্তিত শব্দের ব্যবহার বেশি। উচ্চ উপভাষার শব্দভাণ্ডারের মার্জিত রূপটিও লক্ষ্য করা যায়।

ঝ. ধ্বনিতত্ত্ব ঃ

ধ্বনিতত্ত্ব পার্থক্য তেমন দেখা না গেলেও কখনো কখনো দেখা যায়। সুইস জার্মান ও মান্য জার্মানের ক্ষেত্রে বেশ তফাত দেখা যায়।

১৩.৫ দ্বিভাষিকতা

ফিশম্যান 'domain' বা এলাকা-এই পরিভাষাটি প্রয়োগ করেন। তিনি স্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজ এবং অস্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। স্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজে আছে দ্বিবচন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে দুটি ভাষাকে ব্যবহার করা হয়। আর অস্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজে ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রের তেমন কঠোর নয়। মাতৃভাষা ও অন্যভাষা পাশাপাশি চলে।

ব্লুস দু'রকমের দ্বিভাষিকতার কথা বলেছে। আর এগুলি হল অন্তর্দ্বিভাষিকতা ও বর্হিঃদ্বিভাষিকতা। ফিশম্যান গাম্পার্জকে অনুসরণ করে বলেন যে, বহুভাষিক দেশে দ্বিবচন উপলব্ধি করা যায়। যেখানে স্থানীয় ভাষা ও ধ্রুপদী ভাষা আছে সেখানে ব্যবহৃত হয়। যেখানে আলাদা আলাদা উপভাষা, রেজিস্টার বা নানা ধরনের ভাষাবৈচিত্র্য আছে সেখানেও পাওয়া যায়।

দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতায় জায়গাটি 'situation shifting' বা 'Code swituching'-এর এলাকা। এক ভাষাবৈচিত্র্য থেকে অন্য ভাষাবৈচিত্র্যে অবস্থা অনুসারে পরিস্থিতিও প্রয়োজন অনুসারে আমরা চলে যাই। তাই সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন একজন মানুষ একাধিক ভাষা ব্যবহার করতে পারে। বহুভাষিক দেশে এ ব্যাপার প্রায়শই ঘটে। একে বহুভাষিকতা (Polylingualism) বা দ্বিভাষিকতা (bilingualism) বলে। যদি একাধিক উপভাষা বা সমাজউপভাষা ব্যবহার করে তবে তাকে দ্বি-উপসর্গ ব্যবহার করতে হয়। যেমন, ইট ভাঁটার কর্মরত সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা বলে আর দোকানে বাজারে বা বাংলাভাষী লোকের সঙ্গে বাংলাভাষা ব্যবহার করে। এটি দ্বিভাষা ব্যবহারের নিদর্শন হিসাবে দেখা যেতে পারে।

১৩.৬ রেজিস্টার

রেজিস্টার বিষয়ক ধারণাটি তৈরি হয়েছে ইংলন্ডে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রিড ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য বোঝাতে রেজিস্টার পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন। হ্যালিডে প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী রেজিস্টার সম্পর্কে বলেন

যে, মানুষের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য বোঝাবার জন্যে ভাষা, উপভাষা, ছাড়াও রেজিস্টার বিশেষ সাহায্য করে। এঁরা রেজিস্টারকে 'ব্যবহার অনুসারে ভাষাবৈচিত্র্য' হিসাবে দেখেছেন। হ্যালিডে উপভাষা বলতে ভাষাব্যবহারকারী অনুসারে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে বুঝিয়েছেন আর রেজিস্টার বলতে ভাষা ব্যবহার অনুসারে যে বৈচিত্র্য হয়—তাকেই বুঝিয়েছেন। তিনি রেজিস্টারের তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন। এগুলি হল—

ক. বচন এর ক্ষেত্র (field) ।

ক্ষেত্র বলতে বোঝায় কেন এবং কীসের জন্য কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে বোঝাচ্ছে। যেমন, পড়াশুনো সম্পর্কিত কথাবার্তা, খেলাধুলো সম্পর্কিত কথাবার্তা ইত্যাদি।

খ. বচন এর প্রকার (mode) ।

কীভাবে কথা বলা হচ্ছে তা বোঝায়। কোন্ বিশেষ অবস্থায়, পরিবেশ বা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। মাধ্যমটি লিখিত না মৌখিক তা বোঝাচ্ছে ইত্যাদি।

গ. বচন এর রীতি (style) ।

কাকে বলা হচ্ছে। সামাজিক সম্পর্ক অনুসারে ভাষা ব্যবহারের যে বদল ঘটে তাকে রীতি বলা হয়। যেমন, শিক্ষক ছাত্র, বাবা-মেয়ে, ভাই-বোন, অপরিচিত লোক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বদলে যায় ভাষারীতি।

মৃণাল নাথ 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন,

১. আপনার যন্ত্রণার উপশমের জন্য একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি।

২. খানিক পর কাড়ায় আলু ও টমাটো ছেড়ে দিন। কষতে থাকুন। কিছুক্ষণ কষা হলে কড়ায় অল্প জল ঢেলে দিন। সঙ্গে দিন আন্দাজমতো নুন ও মিষ্টি।

প্রথমটি চিকিৎসকের ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়টি রান্না শেখানোর ক্ষেত্র আলাদা প্রসঙ্গ আলাদা এবং ভাষারীতিও পৃথক।

ফলে, মান্য ভাষার মধ্যেও আছে রেজিস্টারগত ভাষাবৈচিত্র্য। পবিত্র সরকার ব্রাইট ও ফিশম্যান অনুসারে জানান যে,

"রেজিস্টার আর কিছুই নয়, শ্রোতা (receiver of the message) এবং উপলক্ষ্য (setting)-এ দুয়ের প্রভাবে একটি ভাষার ব্যবহারে যে রীতিগত বৈচিত্র্য ঘটে, তাই। এ বৈচিত্র্য ভাষার যে কোন উপভাষার মধ্যেই ঘটতে পারে, তবে লেখার উপভাষায় একটু বেশি ঘটে।" ['সমাজ ভাষা বিজ্ঞান', 'ভাষা-দেশ-কাল']

১৩.৭ সমাজভাষা ও সামাজিক স্তর

সামাজিক স্তরের কথা সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। তাঁরা দেখেছেন, ভাষার সামাজিক স্তরভেদ সামগ্রিকভাবে সমাজভাষা বা sociolect-এর পরিচয় বহন করে। কিন্তু, সামাজিক স্তরভেদ খুব একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়নি। কাজ চালানো গোছের ধারণার আশ্রয় নিয়েই সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চা চলে বলে মনে করেন পবিত্র সরকার।

ক. জাতি উপভাষা ঃ

জাতি অনুসারে সমাজভাষার একটি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। তা এক এক দেশে এক এক রকম। কারণ সমাজ নির্দিষ্ট ও প্রথা হিসাবে চলে আসা স্তরগুলি গ্রহণ করা হয়। মৃণালনাথ 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে K. Ranger এর An outline of Tamil socialinguistics (1986) অনুসরণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে জাতিগত স্তরটি নির্দেশ করেন।

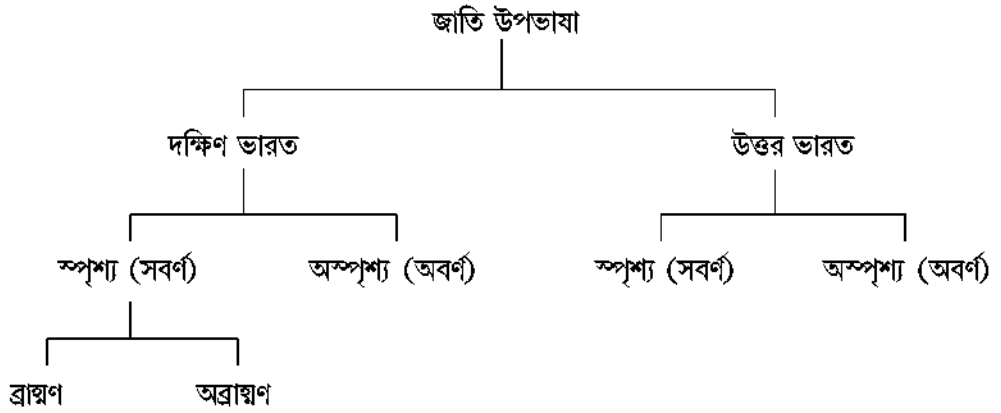

পূর্বভারতে বিশেষত বাংলাভাষা যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সব অঞ্চলে একসময়ে এই জাতিগত ভেদ যে প্রবলমাত্রায় ছিল তার প্রমাণ ভাষার মধ্যে রয়ে গেছে।

খ. নৃ-গোষ্ঠী অনুসারে উপভাষা ঃ

একই সময়ে বা দেশে যেমন একাধিক নৃ-গোষ্ঠী একই ভাষায় কথা বলে তখন মূল ভাষা ব্যবহারকারীর ভাষার সঙ্গে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহারের তফাত দেখা যায়। আমেরিকায় নিগ্রোদের অর্থাৎ কৃষ্ণকায়দের ইংরেজি আর শ্বেতকায়দের ইংরেজির মধ্যে তফাত আছে। আমাদের দেশে সাঁওতাল গোষ্ঠীর লোকেরা যখন কথা বলেন তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় আদর্শ ভাষাটিকে গ্রহণ করেন আর অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা তখন আলাদা হয়ে যায়।

গ. ধর্ম অনুসারে উপভাষা ঃ

মেকলে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু তফাৎ আছে তা লক্ষ করেছিলেন। রাজীব হুমায়ুন বাংলাভাষী হিন্দু মুসলমানের ভাষা ব্যবহারগত বৈচিত্র্য দেখান। যেমন,

	ধর্মের ভাষা	আত্মীয়তার ভাষা	দ্রব্য
হিন্দু—	স্বর্গ-	বাবা, মা, মাসি, পিসি,	জল
মুসলমান—	বেহেশত-	আব্বা, আম্মা, খালা, ফুফু	পানি

ঘ. শ্রেণি উপভাষা ঃ

লেবভ পেশা বা জীবিকা, শিক্ষা এবং আয় বা অর্থনৈতিক অবস্থা—এই তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণির স্তরবিন্যাস করেছিলেন। তিনটি মানদণ্ডকেই তিনি সমান গুরুত্ব দেন। এভাবে তিনি নিউইয়র্কে চারটি শ্রেণি পান।

১. নিম্নশ্রেণি, ২. শ্রমিক শ্রেণি, ৩. নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, ৪. উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ট্রাডজিল একে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেন।

১. মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ২. নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, ৩. উচ্চ শ্রমিক শ্রেণি, ৪. মধ্য শ্রমিক শ্রেণি, ৫. নিম্ন শ্রমিক শ্রেণি। তিনি মানদণ্ড হিসাবে জীবিকা, আয়, শিক্ষা, বাসস্থান, এলাকা ও পিতার আয় এই ছ'টি সূচক ব্যবহার করেছিলেন।

১৩.৮ মিশ্র ভাষা

সমাজের নানা স্তরের মানুষের ভাষা সমাজভাষাবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। যখন দুটো ভাষা পাশাপাশি অবস্থান করে তখন মিশ্র ভাষা তৈরি হয়। মিশ্র ভাষা হিসেবে পিজিন ও ক্রেওল ভাষা পাওয়া যায়।

১৩.৮.১ পিজিন ভাষা

ইংরেজি (Business) শব্দটি চিনা ভাষায় হল পিজিন। আর তার থেকেই এইরকম বিকৃত উদাহরণের ইংরেজি ভাষা নাম হয় পিপিন ইংলিশ। প্রধানত ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য যখন দুটি ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোক দুটি ভাষার মিশ্ররূপ ব্যবহার করে তখন তাকে পিজিন বলা হয়। সারা পৃথিবীতে বেশি কিছু পিজিন মূলত ব্যাবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে গড়ে উঠেছে। এটি দ্বিতীয় ভাষা বা L2 হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পিজিনকে যোগাযোগের ভাষা বলা হয়। মাতৃভাষা হিসেবে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। পিজিনের এলাকা সীমিত এলাকা। তার শব্দ ভাণ্ডারও সীমিত। এ ভাষার ব্যাকরণ সরল। ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং অল্প কথাবার্তা বলা থেকেই পিজিনের জন্ম হয়। একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর মিলনে তৈরি হওয়া পিজিনে নীচের স্তর হিসাবে স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়।

একই ভাষা সম্প্রদায়ের লোক কখনো নিজেদের মধ্যে পিজিন বলবে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎস থেকেই অধিকাংশ পিজিন তৈরি হয়েছে। তাই ইংরেজি, ফরাসি, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ এই সব ভাষার ভিত্তিতেই অধিকাংশ পিজিনের উদ্ভব হয়েছে।

সিঙ্গাপুর, হংকং সাংহাই প্রভৃতি বন্দরে চিনাদের মুখেই ইংরেজি ভাষা একটি পিজিন তৈরি করেছে। এর নাম পিজিন ইংলিশ। মেলানেশিয়া, নিউগিনি অঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে বহু ভাষা। এক ভাষাগোষ্ঠী অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা বুঝতেও পারে না। আর তার ফলে এই অঞ্চলে তৈরি হয়েছে পিজিন ইংলিশ। এখন এটি মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হিসাবে গৃহীত। পশ্চিম আফ্রিকা ও বোর্নিও অঞ্চলে পোর্তুগিজ ভাষাকে নিয়ে একটি পিজিন পোর্তুগিজ ভাষা তৈরি হয়েছে। জার্মানে অবস্থিত তুর্কি শ্রমিকরা পিজিন জার্মানে কথা বলে। ভারতবর্ষে চার রকমের পিজিনের কথা পাওয়া যায়। উপনিবেশ স্থাপিত হলে সেখানে পিজিন ভাষার উদ্ভব ঘটে। পরে তা লোপ পেতে পারে।

১৩.৮.২ ক্রেওল ভাষা

'ক্রোয়োল হল পিজিনের পরবর্তী ধাপ। পিজিন কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষারূপে গণ্য হলেই তা ক্রোয়োল হয়ে যায়। ক্রোয়োলকে পূর্ণাঙ্গ ভাষা হিসাবেই গ্রহণ করা যায়।' [পবিত্র সরকার, ১৯৮৬, ১৭১-১৭২]

ইউরোপের ভাষাকে অবলম্বন করেই অধিকাংশ ক্রোয়োল তৈরি হয়েছে। মৃণাল নাথ জানান যে, পোর্তুগিজ Criouls থেকে এসেছে ইংরেজি creole শব্দটি। এর অর্থ-ক্রান্তিবৃত্তীয় ও অর্ধক্রান্তিবৃত্তীয় অঞ্চলে জাত ও পতিপালিত ইউরোপীয় মানুষ। পরে অর্থবিস্তার ঘটে, স্থানীয় ও ইউরোপীয় নয় এমন লোকজনদেরও বোঝাতে থাকে। পরে, ক্যারিবীয় অঞ্চলেও পশ্চিম আফ্রিকার ক্রেয়লদের দ্বারা কথিত কোন কোন ভাষা বোঝায়।

আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত চিনুক, জারগণ চিনুক ও নুটকা ভাষা থেকে উদ্ভূত। আফ্রিকায় সোয়াহিলি থেকে উদ্ভূত ক্রেয়াল ব্যবহৃত হয়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ও তার আশেপাশে, পশ্চিম আফ্রিকায় ছোটোখাটো গোষ্ঠীত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রোয়াল বলা হয়। উৎস হিসাবে ক্রেয়েলের নানা শ্রেণি হতে পারে। যথা, ইংরেজি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল, ফরাসি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল, পোর্তুগীজ ভাষানির্ভর ক্রেয়ল, ওলন্দাজ নির্ভর ক্রেয়ল, আরবি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল ও সোয়াহিলি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল।

১৩.৯ সারাংশ

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান বক্তা-শ্রোতা এবং উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষাগত পার্থক্য করা যায়। উপলক্ষ্য অনুসারে সংকেত বদল ঘটে—উচ্চতম বা নিম্নতম ভাষা নির্বাচন করে ব্যবহার করা হয়। মান্য ভাষার একাধিক রূপ পাশাপাশি চলতে পারে। একে দ্বিবচন বলা হয়। একাধিক ভাষা যেখানে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় সেখানে আর ব্যবহার বা ক্ষেত্র অনুসারে ভাষা ব্যবহারকে রেজিস্টার বলা হয়। সমাজভাষার নানা সামাজিক স্তর বা শ্রেণি অনুসারে উপভাষাগত পার্থক্য পাওয়া যায়। একে শ্রেণি উপভাষা বলে। দুটি ভাষার পাশাপাশি অবস্থান থেকে মিশ্রভাষার উদ্ভব হয়। যোগাযোগের ভাষা হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ের এই মিশ্রভাষাকে পিজিন বলে। আর মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষার মর্যাদা যদি কোনো মিশ্র ভাষা পায়, তবে তাকে ক্রোয়েল ভাষা বলে। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে এই ধরনের বৈচিত্র্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায় এবং নিদর্শনগুলির বিশ্লেষণ করা হয়।

১৩.১০ অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. বক্তা খ. শ্রোতা গ. উপলক্ষ্য ঘ. দ্বিবচন ঙ. দ্বিভাষিকতা চ. রেজিস্টার ছ. পিজন জ. ক্রোয়েল ঝ. শ্রেণি উপভাষা

২। ভাষারীতির বদলের ক্ষেত্রে বক্তা-শ্রোতা-উপলক্ষ্যর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করুন।

৩। উচ্চতম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিবচন-এর নানা দিক আলোচনা করুন।

৪। সমাজভাষার পরিচয় জানার ক্ষেত্রে ভাষার সামাজিক স্তরভেদ-এর গুরুত্ব কোথায়? এই প্রসঙ্গে শ্রেণি উপভাষা কত ধরনের হতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫। মিশ্রভাষা হিসাবে পিজিন ও ক্রেয়ল-এর পরিচয় দিন।

১৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ১৯৮৩, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রত্নাবলী, কলকাতা।

নাথ, মৃণাল, ১৯৮৯, সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা,

১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ

সরকার, পবিত্র, ১৯৮৪, ভাষা-দেশ-কাল

হুমায়ুন, রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান

Hudson, R. A. 1980 Sociolinguistics

Labor, W. 1978, 'Sociolinguistics' Patterns, Philadelphia, University of Pennsylvanir press

Trudgill, P. 1974, Sociolinguistics, Hamondsworth, Pengins books.

একক ১৪ ❐ উপভাষাতত্ত্ব

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ উপভাষা

১৪.৪ উপভাষা নির্ণয় ঃ পারস্পরিক বোধগম্যতা

১৪.৫ ক্ষেত্রসমীক্ষা

১৪.৫.১ নমুনা সংগ্রহের স্তর। উপভাষা মানচিত্র

১৪.৫.২ ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য উপাদান নির্বাচন। উপভাষা মানচিত্র

১৪.৫.৩ ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করার বিভিন্ন সূচক। ভাষা মানচিত্র

১৪.৬ ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল

১৪.৭ সারাংশ

১৪.৮ অনুশীলনী

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- ভাষার সঙ্গে উপভাষার পার্থক্য বোঝা যাবে।
- নানা অঞ্চলে ভাষা যে বদলে বদলে যাচ্ছে তা উপলব্ধ হবে।
- একই ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এক অঞ্চলের লোকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকের মধ্যে যে ভাষাগত পার্থক্য তৈরি হচ্ছে তার কারণ ও সেই বিষয়টি বোঝা যাবে।
- ভাষা মানচিত্র তৈরি ও ক্ষেত্র গবেষণার পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা যাবে।

১৪.২ প্রস্তাবনা

উপভাষা হল প্রকৃত ভাষা ব্যবহার। একই ভাষার অঞ্চল ভেদে ভাষা ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে উপভাষাতত্ত্ব। উপভাষাতত্ত্বের কাজকর্ম আমাদের দেশে কিছু কিছু হয়েছে। গোপাল হালদার, কৃষ্ণপদ গোস্বামী, মনিরুজ্জামান, নির্মল দাস প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে নানা গবেষণা করেছেন।

বর্তমান যুগে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যেই উপভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ নানা শ্রেণি উপভাষার পাশাপাশি অঞ্চলভেদে ভাষার যে বৈচিত্র্য পাই তা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। উপভাষা তত্ত্বের সমাজ-পরিষেবা ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এখানে সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যেই উপভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা হল।

১৪.৩ উপভাষা

উপভাষাতত্ত্বে (Dialectalogy) একটি ভাষার অন্তর্গত রূপগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথাগত ধারণা থেকে বলা যায় যে, কোনো একটি ভাষার শিষ্ট বা আদর্শরূপ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে তাকে উপভাষা (Dialect) বলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে আদর্শ বা শিষ্ট ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করি। আর তার পেছনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা কারণ থাকে। ফলে, আদর্শভাষাও কোনো এক অঞ্চলের ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে উপভাষাগুলির পারস্পরিক পার্থক্য থাকতেই হবে। সুতরাং শিষ্ট বা আদর্শ ভাষা থেকে উপভাষার জন্ম হয়—এ ধারণা বর্তমানে গ্রহণ করা হয় না। ঠিকঠাক বলতে গেলে, উপভাষা হল একই ভাষার নানা রূপগত বৈচিত্র্য। ভাষা থেকে তাকে আলাদা করা যায় না।

"An dialect is a language such that (i) theres is at least other language with which it has a highe degree of similarity; (ii) there is no language which is regionally included within it as a proper past; and (iii) neither its writing system nor its promneiation nor its lexicon nor its syntax is officially normalized." [Ammon, 1983, pp. 63]

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব—একটি উপভাষাও হল ভাষা। এর মধ্যে অবস্থিত বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

ক) উপভাষা হল সেই ভাষা যার সঙ্গে অন্ততপক্ষে চূড়ান্তভাবে সাদৃশ্যযুক্ত একটি ভাষা থাকবে।

খ) অন্য কোনো ভাষা আঞ্চলিক ভাবে এ ভাষার যথার্থ অংশ হিসাবে থাকবে না।

গ) এই ভাষার লিখনপদ্ধতি, উচ্চারণ পদ্ধতি, শব্দকোষ বা এর অন্বয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অবশ্যই আলোক ভাষা হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঘ) আদর্শ ভাষা থেকে এটি আলাদা হবে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে,

- প্রত্যেকটি মানুষের ভাষা আলাদা। তাকে বলে নিভাষা (idealect)।
- কতকগুলি নিভাষা বা ব্যক্তির নিজ ভাষা জুড়ে একটি বড়ো ভাষাগোষ্ঠী হয়। তাকে বলে বিভাষা (sub-dialect)।

● এই বিভাষাগুলি সাদৃশ্য অনুসারে আরও বড়ো গোষ্ঠী তৈরি করে। তাকে বলে উপভাষা (Dialect)।

● উপভাষাগুলি মিলিতভাবে কোনো একটি ভাষার সম্পূর্ণ রূপ তৈরি করে। সুতরাং বলা চলে, ভাষা হল একটি বিমূর্ত ধারণা। উপভাষাগুলি হল তার মূর্ত বা প্রকৃত রূপ।

১৪.৪ উপভাষানির্ণয় ঃ পারস্পরিক বোধগম্যতা

একটি উপভাষা কতটা অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে তা জানতে গেলে পারস্পরিক বোধগম্যতা (Mutual Intelligibiltiy) বিষয়টি জানা প্রয়োজন। উপভাষাগুলি আসলে পারস্পরিক বোধগম্যতার মাধ্যমে গৃহীত ভাষা রূপ। যেখানে বোধগম্যতা কাজ করছে না তা পৃথক ভাষা তৈরি করছে। আর যেখানে বোধগম্যতা আছে সেখানে একই ভাষা আছে। এরকম সিদ্ধান্ত করা হয়।

যদি দুজন লোক তাদের কথা বলার পার্থক্য সত্ত্বেও একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে তবে তারা আলাদা আলাদা উপভাষা বলছে বোঝা যাবে। কিন্তু যদি তারা একে অন্যের ভাষা বুঝতে না পারে তবে তারা আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহার করছে। একজন কলকাতাবাসী আর একজন চট্টগ্রামবাসী লোক যদি পরস্পরের কথা বুঝতে পারে কিন্তু তাদের কথা বলার ভাষায় যদি পার্থক্য থাকে তবে তারা দুটি পৃথক উপভাষা ব্যবহার করছে বলা যাবে। আজ যদি একজন দক্ষিণভারতীয় লোকের সঙ্গে একজন বাঙালির ভাষাগত পার্থক্য এমন হয় যে কেউ কারো কথা বুঝতে পারে না তবে তারা পৃথক দুটি ভাষা ব্যবহার করছে প্রমাণিত হবে।

Hockette বলেন, একটি নিভাষা থেকে অন্য নিভাষা পারস্পরিক বোধগম্য কিনা তা দেখা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা পারস্পরিক বোধগম্য যে নিভাষাগুচ্ছ পাবো তাকে সহজভাষা (L-simplex) বলা হবে। পারস্পরিক বোধগম্য এবং পারস্পরিক বোধগম্য নয় এমন ভাষা মিলিতভাবে তৈরি করে জটিল ভাষা (L-Complex)। পারস্পরিক বোধগম্য দুটি বা এতোধিক নিভাষা এবং পারস্পরিক যেতে পারে। এই রেখাচিত্রের প্রত্যেকটি বিন্দু এক একটি নিভাষা। রেখা দ্বারা নিভাষাগুলির মধ্যে শৃঙ্খল তৈরি করা হয়েছে।

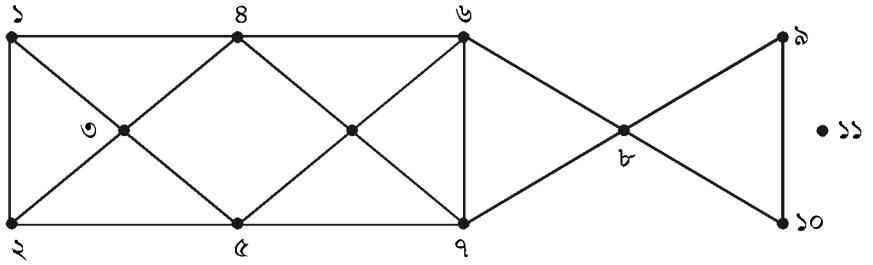

প্রথম সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	১	২	৩	৪	৫	পারস্পরিক বোধগম্য
দ্বিতীয় সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	৪	৫	৬	৭		পারস্পরিক বোধগম্য
তৃতীয় সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	৬	৭	৮			পারস্পরিক বোধগম্য
চতুর্থ সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	৮	৯	১০			
প্রথম সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	১১					

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ সহজ নিভাষাগুচ্ছ নয় কারণ ১২৩ এর সঙ্গে ৬ এর পারস্পরিক বোধগম্যতা নেই। সুতরাং ১ ২ ৩ ৪ ৫ পারস্পরিক বোধগম্য। অথচ ১ থেকে ১০ পারস্পরিক বোধগম্যতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ১ ৫ ৬ ৮ ১০ কিংবা ১ ৫ ৪ ৭ ৮ ১০ এর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। ফলে ১-১০ একটি সহজ ভাষা গঠন করছে। ১১টি ১-১০ এর শৃঙ্খলের বাইরে অবস্থিত। ফলে সেটি গঠন করছে অন্য সহজ ভাষা। ১-১১ গঠন করছে জটিল ভাষা (L-Complex)।

আর এভাবেই উপভাষা অঞ্চলে নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব।

১৪.৫ ক্ষেত্রসমীক্ষা

উপভাষা অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—উপভাষার এলাকা ঠিক করা। উপভাষার প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা এবং উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ করা। এ কাজ কেবল বই পড়ে বা লোকের কাছে শুনে সম্ভব নয়। এর জন্যে চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা। যথাযথ ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে উপভাষা চিহ্নিত করা তার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করা ইত্যাদি।

উপভাষার উপাত্ত সংগ্রহের দুটি প্রধান পদ্ধতি আছে। পরোক্ষ পদ্ধতি ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

ক. পরোক্ষ পদ্ধতি

Wenker পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে উপভাষার নিদর্শন ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে শিক্ষিত লোকেদের মাধ্যমে উপভাষা নিদর্শন ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত স্থানীয় লোকের মাধ্যমে এই নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়। তবে স্থানীয় লোক যে হবেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ডাকযোগে উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ করা যেতে পারে। বর্তমানে এই পদ্ধতি খুব একটা ব্যবহার করা হয় না।

খ. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আরম্ভ করেন Gillieorn। সরাসরি নিজে গিয়ে উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সরাসরি মুখের ভাষা সংগ্রহ করা যেতে পারে। লিখিতভাবে নিদর্শন সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় টেপরেকর্ডার বা ভিডিও টেপ নিয়ে মুখের ভাষা সংগ্রহ করা।

পরোক্ষ পদ্ধতিতে একসঙ্গে প্রচুর উদাহরণ কম খরচে এবং কম সময়ে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এর একটি অসুবিধাও আছে। যাঁরা তথ্য সংগ্রহ করে দেন অনেক সময় তাঁদের তথ্য ও নমুনা সংগ্রহের জন্য যে শিক্ষা দরকার তা থাকে না। অনেক সময় তাঁরা স্বনিম লিপি ব্যবহার করতেও জানেন না। ফলে ভাষার প্রকৃত উদাহরণটি কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে। ফলে, পরোক্ষ পদ্ধতিতে সূক্ষ বিজ্ঞানসম্মত দিকটি মানা হয় না।

প্রত্যক্ষ ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে নিশ্চিতভাবে সেই ভাষার লোকের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে ভাষাসংগ্রহ করলে ভাষার উচ্চারিত রূপটি ধরা থাকে। আর সেটি-ই ভাষার আসল চেহারা। অবশ্য এর অসুবিধাও আছে কিছু। এ ধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষা ব্যয় বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সীমাবদ্ধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ উপাদান নিয়ে এ কাজ করা হয়।

১৪.৫.১ নমুনাসংগ্রহের স্তর—উপভাষা মানচিত্র

উপভাষা জরিপ এবং উপভাষা মানচিত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আর প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে এই নমুনা সংগ্রহ করা উচিত। Hockett উপভাষা মানচিত্র তৈরি করবার ক্ষেত্রে কতকগুলি স্তরের কথা বলেছেন। এই স্তরগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। এই স্তরগুলি আমরা এভাবে সংক্ষেপে দেখতে পারি।

ক. প্রথমে একটি অঞ্চলে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য কোথায় আসছে তার প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে নিতে হবে। আর সেজন্য সেই অঞ্চলের একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করে নিতে হবে। একে পাইলট সার্ভে বলে।

খ. তারপর, যে প্রাথমিক পরিমাপক তৈরি করতে হবে তার দুটি দিক থাকবে। একটি দিক হল—যে যে অঞ্চলের ভাষা সংগ্রহ করতে হবে তার তালিকা। দ্বিতীয় দিক হল—কথা বলার কোন কোন বিষয় বা উপাদান পর্যালোচনা করা হবে তার তালিকা। এই তালিকা প্রশ্নোত্তরের ধাঁচে হবে।

গ. তৃতীয় পর্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষক ওই নির্বাচিত অঞ্চলগুলিতে এক বা একাধিক তথ্যপ্রদাতা নির্বাচন করবেন। ওই অঞ্চলে ছোটোবেলা থেকে বসবাস করছেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তি যদি তথ্যপ্রদাতা হন তবে ভালো হয়। তাঁর জন্য একটি প্রশ্নোত্তর তৈরি করা হবে।

ঘ. চতুর্থ পর্যায়ে, এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করে ইনডেক্স কার্ডে সাজানো যেতে পারে। সাজানোর ক্ষেত্রে বর্ণনুক্রমে বিষয় অনুসারে, অঞ্চল অনুসারে বা কোনো বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজাতে হবে। বর্তমান সমাজে, গণকযন্ত্র (computer) সাজানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে ভালো। এতে তাড়াতাড়ি এবং নির্ভুল ভাবে তথ্য সাজানো সম্ভব।

ঙ. পঞ্চম পর্যায়ে, তথ্য বিন্যাসের পর তাকে নানা মানচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরের বিষয় ধরে ধরে কথা বলার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অনুসারে নানা আঞ্চলিক এলাকায় ভাগ করে মানচিত্র আঁকতে হবে।

আর এভাবেই ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে ভাষা মানচিত্র তৈরি করা হয়।

১৪.৫.২ ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য উপাদান নির্বাচন-উপভাষা মানচিত্র

ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য যে উপাদানগুলি নির্বাচন করা হয় সেগুলি নানা ধরনের হতে পারে। যথা,

ক. শব্দ পদ বা পদগুচ্ছ

কোনও একটি অঞ্চলে কোনও বিষয় বোঝাতে কোন ধরনের শব্দ পদ বা পদগুচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন, জল আনার পাত্রকে কলসি বলছে না কুঁজো বলছে না ঘড়া বলছে নাকি হ্যারিকেন বলছে তা লক্ষ করা। কিংবা বাজার আনার অন্য—বাজারের থলে বলছে না ব্যাগ বলছে নাকি প্যাকেট বলছে তা লক্ষ্য করা।

খ. শব্দের অর্থ

একটি নির্দিষ্ট পাত্র কোন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে তা দেখা। যেমন, শিষ্ট চালিত বাংলায় ঘড়া হল ধাতুনির্মিত জলপাত্র। কলসি, কুঁজো হল মাটির তৈরি জলপাত্র। পিপে হল কাঠের জলপাত্র তবে তেল রাখার জন্যেই ব্যবহৃত। মশক হল চামড়ার জলপাত্র। কলসি মাটির বোঝালেও অনেক সময় অন্য ধাতুর তৈরি হলে সেই ধাতুটির নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তামার কলসি, সোনার কলসি ইত্যাদি।

গ. শব্দের উচ্চারণ

একটি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্বনিমগত বৈশিষ্ট্য এখানে দেখা হয়। যেমন, কোথায় 'জ' উচ্চারিত হচ্ছে আর কোথায় 'জ' (যেমন জানতি) উচ্চারণ হচ্ছে তা দেখা। কোথায় 'শ' আর কোথায় 'স' উচ্চারিত হচ্ছে তা দেখা ইত্যাদি।

ঘ. রূপগত পার্থক্য

দুটি রূপের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যেতে পারে। যেমন, 'নীড়' আর 'নীর' ইংরেজি 'Cof' আর 'caught' এক না আলাদা রূপ তা দেখা।

ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গেলে এই সব উপাদান বিশেষভাবে দেখতে হয়। এই ধরনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে উপভাষা মানচিত্র অঙ্কন করা। পরোক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পাওয়া তথ্যের ওপরেও তা নির্ভর করে।

যুক্তরাষ্ট্রে স্বল্পসংখ্যক একক নিয়ে বহুসংখ্যক লোকের তথ্য লক্ষ্য করা হয়েছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে অনুপুঙ্খ মানচিত্র। এই অনুপুঙ্খ মানচিত্রে ধরা পড়ে একটি বিশেষ ব্যবহার কোন অঞ্চলে বাড়ছে কিংবা কমছে। কেবল অঞ্চল ধরেই নয় সময় ধরেও ভাষা মানচিত্র তৈরি করা দরকার। দীর্ঘসময় ধরে দেখলেও এই বাড়া বা কমা বা লোপ পাওয়া বিষয়টি ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা নিয়ে এ ধরনের ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে নিখুঁত ভাষামানচিত্র রচনার কাজ এখনো হয়নি।

১৪.৫.৩ ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করার বিভিন্ন সূচক ভাষা মানচিত্র

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সূচক (Index) ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ক. সমধ্বনি রেখা (Irophone)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে মানচিত্র তৈরি হয়। এই মানচিত্রে একই ধরনের উচ্চারিত ধ্বনি আর একই ধরনে উচ্চারিত নয়, এমন ধ্বনি-র এলাকা নির্দেশ করা হয়।

খ. সমরূপ রেখা (Iromorph)

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে মানচিত্র অঙ্কন করা হয়।

গ. সমশব্দকোষ রেখা (Iro-suggmentic)

এই মানচিত্রে শব্দকোষগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়।

ঘ. সমবাক রেখা (Iro-lex)

একই ধরনের ব্যবহার এর সাদৃশ্যযুক্তগঠন ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়।

ঙ. সম শব্দার্থ রেখা (Iro-seme)

এই মানচিত্রে শব্দের অর্থ অনুসারে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়।

চ. সম ভাষা সংস্কৃতি রেখা (Iropleth)

ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজসংস্কৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়।

ছ. সম স্বর রেখা (Irotone)

একই ধরনের অধিধ্বনি অর্থাৎ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর, যতি, দ্রুতি (Tempo) ইত্যাদি যে মানচিত্রে দেখানো হয়।

জ. সম শব্দ রেখা (Irogon)

কোনো একটি বিশেষ শব্দ যে অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় তার সীমা নির্ধারণ করে যে মানচিত্র আঁকা হয় তাকে সমশব্দরেখা বলে। অনেকগুলি সমশব্দরেখা যেগুলি কাছাকাছি আছে বা একটির ওপর আরেকটি এসে পড়েছে তাদের নিয়ে তৈরি হয় সমশব্দরেখাগুচ্ছ।

প্রথানুসারী মানচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি ধরনের মানচিত্র। যথা—

ক. বিভিন্ন রকম প্রতীক ব্যবহার। এক একটি প্রতীক এক একটি বিশেষ ব্যবহার প্রদর্শন করে। যেমন শস্যজাতীয় শব্দের জন্য একটি প্রতীক। গৃহজাতীয় শব্দের জন্য আরেকটি প্রতীক ইত্যাদি।

খ. দ্বিতীয় ধরনের মানচিত্রে সমশব্দ রেখাগুচ্ছ দিয়ে ভাষা ব্যবহারের ভৌগোলিক সীমারেখা অঙ্কন করা হয়।

১৪.৬ ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল

S. Potter জানান যে, বিস্তৃত সীমারেখার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ভাষারূপ অধ্যয়ন করা হল ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল।

ভাষা মানচিত্রে আমরা এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ভাষা কেমন বদলে যাচ্ছে তা লক্ষ করি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। সেগুলিও এই ভাষা মানচিত্রে লক্ষ করা হয়। অঞ্চলগত এই ভাষা পরিবর্তন বিবর্তনধর্মী। উল্লম্ব রেখা দ্বারা তা বোঝানো হয়। নীচের রেখাচিত্রে ভাষার অঞ্চলগত পরিবর্তন আনুভূমিক রেখা দ্বারা এবং সময়গত পরিবর্তন উল্লম্বের রেখার দ্বারা দেখানো হল।

স্থানগত বা অঞ্চলগত ভাষা পরিবর্তন-ই 'উপভাষার সীমা' নির্ধারণ করে। Server Pop দেখেন যে, কথ্য ভাষা বদলে যায়। বেশিদিন একভাবে থাকে না। জার্মানির নববৈয়াকরণগণ যেমন Brugmann, Osthoff, Paul, Delburuck প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি বোঝার জন্য উপভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁরা দেখেন যে জীবন্ত বা উপভাষা ভূগোল নিয়ে বিশেষ ভাবেন নি। উপভাষার অভিধান রচনা করার দিকে তারা বিশেষ মনোযোগ দেন।

আমাদের দেশেও বাংলা ভাষাকে ঘিরে উপভাষা মানচিত্র তৈরি করবার তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। বরং উপভাষার অভিধান রচনা করার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ পাশ্চাত্যে বিশ শতকের প্রথমেই প্রকাশিত হয়েছে ভাষা মানচিত্র। Gillieron এর মানচিত্র ১৯০২ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এর আসা ১৯৮৮ তে Bruno Paulin Gaston মানচিত্র তৈরি করার পদ্ধতি কে Gilliéron এর ছাত্র Karl Jaberg এবং Jakob jub প্রকাশ করলেন ভাষা মানচিত্র (Sprach und-Sachatlas Italiens und der siidschewetz)। ১৯৩৯-৪৩ খ্রিস্টাব্দে H. Kurath, M. L. Hanley এবং B. Block ৭৩০টি মানচিত্রসহ প্রকাশ করলেন 'Atlas of New England'। আর এই মানচিত্র নির্মাণ প্রস্তুতি থেকেই জন্ম নিল 'The Linguistic Atlas of the United States and Canada' নামক মানচিত্র সিরিজ।

ক্ষেত্রসমীক্ষকগণ টেপ আর ডিস্ক ছাড়াও ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করলেন। Albert Dauzat তৈরি করলে নতুন ফরাসি মানচিত্র 'Le Nourel atlas Linguistique de la France' [NALF]। 'Golliéron' একটি মাত্র কালের আঞ্চলিক মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। Dauzat বহু শিক্ষিত ক্ষেত্র গবেষকের মাধ্যমে মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই মানচিত্র তৈরি করলেন। তিনি সহজে গ্রহণ করা যায় এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

উপভাষা শব্দকোষ বা অভিধানের গুরুত্ব আছে। কিন্তু তার থেকেও প্রয়োজনীয় উপভাষা মানচিত্রের। কারণ, উপভাষা মানচিত্রে অঞ্চল অনুসারে উচ্চারণগত পার্থক্য এবং তার ব্যবহার সূক্ষ্মভাবে দেখা সম্ভব। উপভাষা জরিপ করার মাধ্যমে এই উপভাষা মানচিত্র তৈরি করা হয়। এই মানচিত্রে উপভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। ইংরেজি থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। উপভাষায় অভিধানে লেখা আছে burn শব্দটি। উপভাষার মানচিত্রে অঞ্চল অনুসারে তার উদাহরণগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। কোথাও তা উচ্চারিত হয় -born, কোথাও bon কোথাও boon ইত্যাদি। আর উপভাষায় এই স্পষ্ট চেহারা বোঝাতেই S. Pop 'LaDialectologic গ্রন্থে উপভাষা জরিপ করলেন। তৈরি করলেন উপভাষা চর্চার আন্তর্জাতিক সংস্থা। বুলেটিন প্রকাশ করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল তৈরি করা ও আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র এভাবেই গড়ে উঠল।

১৪.৭ সারাংশ

উপভাষা একই ভাষার রূপগত বৈচিত্র্য। অঞ্চল ভেদে এই যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে আঞ্চলিক উপভাষা বলে। দুজন লোক যদি তাদের ভাষা ব্যবহার আলাদা হলেও পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে তবে তার একই ভাষা ব্যবহার করছে কিন্তু উপভাষা ব্যবহার করছে পৃথক পৃথক। উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহের জন্য প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ যে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বেশি বৈজ্ঞানিক তাই এটি ব্যবহার করাই ভালো। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক বা খসড়া সমীক্ষা করা প্রয়োজন। ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য শব্দ, পদ, পদগুচ্ছ, শব্দের অর্থ, শব্দের উচ্চারণ, শব্দের রূপগত পার্থক্য প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করে অনুপুঙ্খ ভাষা মানচিত্র তৈরি করা প্রয়োজন। ভাষা মানচিত্রে ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করবার নানারকম সূচক ব্যবহার করা হয় যেমন-সমধ্বনি রেখা, সমশব্দ রেখা, সমরূপরেখা, সমশব্দার্থ রেখা ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল তৈরি করার ক্ষেত্রে অঞ্চলগত ভাষাপরিবর্তন উপভাষার সীমা নির্দেশ করে। উপভাষা মানচিত্র তৈরি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১৪.৮ অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. উপভাষা খ. পারস্পরিক যোগ্যতা গ. ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ঘ. সমশব্দরেখা

২। উপভাষা কাকে বলে ? উপভাষা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোধগম্যতার গুরুত্ব কোথায় তা আলোচনা করে সহজ ভাষা ও জটিল ভাষা বলতে কী বোঝায় তা দেখান।

৩। ক্ষেত্রসমীক্ষা বলতে কী বোঝায় ? নমুনা সংগ্রহ, উপাদান নির্বাচন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। উপভাষা মানচিত্র তৈরি করার বিভিন্ন স্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করার বিভিন্ন সূচকগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা দিন।

৬। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন।

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

দাশ, নির্মলকুমার, ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা মনরুজ্জামান ১৯৯৪, উপভাষা চর্চার ভূমিকা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Anderson, J. A 1973, Structural Aspects of Language Change, Longman.

Chambers, J. K. & Trudgill, P. 1986, Dialectology, Cambridge University Press.

Kurath, H. 1972, Studies is Area Linguistics, Indian University Press.

একক ১৫ ❐ ভাষা পরিকল্পনা

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ ভাষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্ধারণ

১৫.৪ ভাষা সংস্কার

১৫.৫ ভাষা পরিকল্পনার নানা ক্ষেত্র

১৫.৬ সারাংশ

১৫.৭ অনুশীলনী

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে ভাষা নিয়ে যে নানাবিধ ভাবনা চিন্তা চলছে তার একটি পরিচয় লাভ করা যাবে।
- ভাষা পরিকল্পনা বলতে ঠিক কী বোঝায় সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।
- ভাষা সংস্কারের প্রয়োজন কোথায় তা বোঝা যাবে।
- ভাষা সংস্কারের জন্য যে বিধিবদ্ধভাবে পরিকল্পনার প্রয়োজন তা বোঝা যাবে।

১৫.২ প্রস্তাবনা

মুখ দিয়ে বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে অর্থবহ ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাই ভাষা। এই ভাষা লোকের মুখে মুখে নানা যুগে নানা স্থানে বিভিন্ন রকম রূপ পায়। যখন আমরা সেই ভাষার লিখিত রূপ দিই তখন মুখের ভাষার সঙ্গে অনেক তফাত দেখা যায়। অনেক দিন ধরে চলে আসা বানান-লিপি একসময়ে দেখা যায় স্থবির হয়ে পেড়েছে। তখন সেই অসংগতি দূর করার দরকার হয়। দরকার হয় সমস্যাগুলির সমাধান করা। আর রক্ষণশীল স্থবির নিয়মকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে নিতে হয়।

এসব ক্ষেত্রে সরকার, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সকলেরই ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। সকলের সক্রিয় ভূমিকায় সুচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা ভাষাকে আরও গ্রহণযোগ্য ও সমস্যামুক্ত করার জন্য বিশেষ সহায়ক হয়। আর এই প্রচেষ্টাই

ব্রাইট, ফিশম্যান প্রমুখ কথিত প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি বিষয় হয়ে ওঠে। একেই আমরা ভাষা পরিকল্পনা হিসাবে দেখি।

১৫.৩ ভাষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্ধারণ

সমাজ বদলায়। ভাষাও বদলায়। সমাজ ও ভাষা একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ভাষার পরিবর্তন অসচেতন ভাবে যেমন হতে পারে তেমনি সচেতনভাবেও তার পরিবর্তনও ঘটানো যায়। সচেতনভাবে ভাষার এই পরিবর্তন ভাষার সমাজতত্ত্ব বা Sociology of language বলা যায়। আর এই পরিবর্তনে তত্ত্ব ভাষা-পরিকল্পনা বলে বর্তমান কালের ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বৈয়াকরণ পাণিনি সুচিন্তিতভাবে ভাষাকে মান্য রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই ভাষাসংস্কারকে বলা যায় প্রথম ভাষা পরিকল্পনার উদাহরণ। এর পর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। আধুনিক যুগে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'International Communication-A symposium on Language Problem' গ্রন্থে ভাষা সমস্যা নিয়ে নানা আলোচনা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে Edward Sapir 'Language is in a state of continuous flux' বলে মন্তব্য করেছেন। ভাষার এই পরিবর্তন ধর্মকে নিয়েই ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করেন অনেকে। গ্রন্থে বলেছিলেন, অনেকসময় সামাজিক প্রেরণার ফলে ভাষার পরিবর্তন হয়। সামাজিক প্রয়োজনে সুচিশ্চিতভাবে ভাষার পরিবর্তন করা ভাষা পরিকল্পনা মূল বিষয়। ভাষা পরিকল্পনা শব্দটি কিন্তু বেশি দিনের নয়। এই শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করেন Uriel Weinreicth১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারের আলোচ্য বিষয় হিসাবে তিনি এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

Haugen ভাষাপরিকল্পনার তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে ভাবেন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'planning for a Modern Language in Norway' সেখানে তিনি ভাষাপরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

"কোন অসমরূপসম্পন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের লেখক ও বক্তার (কথক) পথ নির্দেশনার জন্য আদর্শ লিখনরীতি বা লিপিরীতি, ব্যাকরণ ও অভিধান তৈরির যে সব কাজ সেগুলোকে ভাষা পরিকল্পনা বলা যায়" [ডঃ মনসুর মুসা, ভাষা পরিকল্পনার সমাজতত্ত্ব পৃ-২]

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এটি ভাষার মান্যীকরণ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Language Modernization and planning in Compsisons with other types of National Modernization and planning' প্রবন্ধে বলেন, রীতিমতো জাতীয় পর্যায়ে ভাষাসমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াস হল জাতীয় পরিকল্পনা।

এ সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে Weistein 'The cliviv Tongue : Polotica consequences of Language choices' গ্রন্থে জানান যে, কোনো সমাজের যোগাযোগ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার অনুমোদিত দীর্ঘমেয়াদী এবং সচেতন প্রয়াসে যদি ভাষার কার্য পরিবর্তন করা হয় তবে তাকে ভাষা পরিকল্পনা বলে। বলাবাহুল্য এ মতবাদও সীমাবদ্ধ।

'Rubin J and Jermudd, B. H.' সম্পাদিত গ্রন্থ 'Can Language be planned?' (1971) গ্রন্থে খুব সহজ করে বলা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুচিন্তিত উপায়ে ভাষা পরিবর্তন করা হয়। আর তাই 'Language Planning is deliberate language change.'

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যশ্লোক রায় Language Planning [Quest, No. 31] প্রবন্ধে বলেন যে, ভাষা

ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হলে তখন সেই সমস্যার পছন্দমতো সমাধানের জন্য সুপারিশ করা হল ভাষাপরিকল্পনা। তিনি ব্যক্তি এবং সরকার উভয়ের ভূমিকাকেই স্বীকার করেছেন। 'Jenudd' এবং 'Dasgupta' (1971) বলে, ভাষাসমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ হল ভাষা পরিকল্পনা।

"যে ভাষা আছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা উন্নতি করা অথবা একটি নতুন সাধারণ আঞ্চলিক ভাষা জাতীয়, ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা তৈরি করার প্রণালীবদ্ধ কার্যকলাপ হচ্ছে ভাষাপরিকল্পনা"। [টৌলি, ১৯৭১, ২৫২, দ্রঃ মৃণালনাথ, ভাষা ও সমাজ পৃ-২৭০]

১৫.৪ ভাষা সংস্কার

ভাষা সংস্কারের ভারতে প্রথম উদ্যোগ নেন পানিনি। একথা আগেই বলা হয়েছে। পানিনি একক ভাবে এ চেষ্টা করলে তা এত ব্যাপক এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নিশ্চয়ই থাকত না। সম্ভবত তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পেয়েছিলেন। তাহলে, এটিই ভাষাপরিকল্পনার প্রথম নিদর্শন।

পরবর্তীকালে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্স ভাষা একাডেমি ভাষা পরিকল্পনায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে এবং ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে সুইডেনে ভাষাপরিকল্পনার নানা কাজকর্ম আরম্ভ হয়। পানিনি ভাষার বিশুদ্ধিকরণ নিয়ে যেমন কাজ করেছিলেন এঁরাও তেমনি বিশুদ্ধিকরণ নিয়ে কাজ করেছেন।

● ভাষার আদর্শরূপ

উনিশ শতকে ইউরোপ-আমেরিকায় এবং অন্যত্র শিক্ষা বিস্তার হওয়ার ফলে প্রচুর পাঠ্য বইয়ের দরকার হল। ফলে, আদর্শ ভাষার দরকার হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই আদর্শ বাংলা তৈরি করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। আর সে ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন ইংরেজ শাসকবৃন্দ।

● নতুন সরকারি ভাষা

বিশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জাতিভিত্তিক নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। রাজনৈতিক কারণে সরকারি ভাষার প্রয়োজন দেখা দিল সেইসব নতুন রাষ্ট্রে। যেমন ১৯১৭ তে ফিনল্যান্ড, ১৯২১ এ আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে নরওয়ে, ১৮২৯-এ গ্রিস, ১৯৪৮এ ইসরায়েল প্রভৃতি রাষ্ট্রের নব অভ্যুত্থান ঘটল। ফলে, নতুন সরকারি ভাষা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হল। ইসরায়েলে হিব্রুভাষার অভ্যুত্থান ঘটল। এসব কাজে সরকার, প্রতিষ্ঠান বা ভাষা একাডেমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানিক কোথাও বা ব্যক্তির উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। আদিম নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষার সহায়ক হিসাবে ক্ষুদ্র ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষাগুলির একটি আদর্শরূপ এই সময়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারীই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

● নতুন লিখিতরূপ

বাইবেল অনুবাদ ও ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা বহু ভাষার লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাবিজ্ঞানের সামার স্কুল-ও বহু ভাষার লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। ১৯২০, ১৯৩০-এর প্রথম দিকে রাশিয়ার সরকার সোভিয়েত দেশে 'কোলা সামিম'-এর মতো বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার লিখিত রূপ দেন।

● ভাষা পুনর্গঠন

উনিশ ও বিশ শতক ধরে ভাষা পুনর্গঠন নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয় ও চলতে থাকে। হাঙ্গেরীয়, নরওয়ে, চীনা, তুর্কি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষার লিপি, বানান, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রভৃতি পুনর্গঠিত হতে থাকে। এর মধ্যে নরওয়ে ও তুর্কি ভাষায় পরিবর্তন ঘটে সবচেয়ে বেশি করে।

E. H. Jahr জানান, ১৯৬০ এর দশকে একটি আলাদা শাখা হিসাবে ভাষা পরিকল্পনা সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ রূপে যুক্ত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। তৃতীয় বিশ্বে বহুভাষা সমস্যা নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ হতে থাকে। ভাষা পরিকল্পনার তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন ঘটে। নরওয়ের ভাষাপরিকল্পনা নিয়ে Haugen আলোচনা আরম্ভ করলেন। তাঁর এই ভাষা আলোচনার সূত্রে পরিকল্পনা একটি তাত্ত্বিক মডেল নির্মিতি পায়। আর প্রায় তখন থেকেই ভাষাপরিকল্পনা সামাজিকভাষাবিজ্ঞানের একটি উন্নত শাখা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। নানা রকমের গবেষণার কাজও আরম্ভ হয়ে যায়।

১৯৮৭ তে Fishman যে কথা বললেন তার অনুসরণে বলা যায় যে, ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং ভাষার উপাদানগুলির লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন উপাদান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করাই হল ভাষা পরিকল্পনা পুরনো প্রয়োগ যেগুলি বাদ দেবার সেগুলি বাদ দেওয়া আর গ্রহণযোগ্য উপাদান গ্রহণ করা এর অন্তর্গত।

এক কথায় ভাষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা দেওয়া বোধহয় দুরুহ। ভাষা পরিকল্পনা বলতে বোঝায়

- কোনও একটি সমাজে, সাধারণ জাতীয় স্তরে, ভাষার সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া।
- ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কোনও ভাষার মৌখিক, লিখিত বা যে কোনও একটি বৈচিত্র্যের ভাষাতাত্ত্বিক আদর্শ নির্দেশ করা হয়।
- কোনও ভাষার মৌখিক বা লিখিত বা যে কোনও একটি বৈচিত্র্যের ভাষাতাত্ত্বিক আদর্শ সংরক্ষণ করা হয়।
- কোনও ভাষার মৌখিক বা লিখিত বা কোনও একটি বৈচিত্র্যের সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা বদলানো হয়।
- কর্মসূচি ঘোষণা করে ভাষা পরিকল্পনা করা হয়।
- নির্ধারিত বিষয় নিয়ে তত্ত্ব পরিকল্পনা করা হয়।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ভাষা পরিকল্পনা করা হয়।
- 'সরকারি কমিটি, প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারিভাবে নিযুক্ত কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর মাধ্যমে ভাষাপরিকল্পনা করা হয়।
- ভাষাপরিকল্পনার প্রধান কাজ ঊর্ধ্ব সামাজিক মর্যাদাযুক্ত লিখিত আদর্শ স্থাপন করা।
- এই লিখিত আদর্শকে মৌখিক আদর্শ অনুসরণ করে।

Language Planning এর বাংলা পরিভাষা হল ভাষা-পরিকল্পনা। অনেক Language Planning অর্থে বলতে চেয়েছেন "Language Engineering" বা ভাষাপ্রযুক্তি। যেমন ১৯৪৬-তে springer, ১৯৭১ Sibayan প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এই ভাষাপ্রযুক্তির কথা বলেছেন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাষার উন্নয়ন বিষয়ে সচেতন প্রয়াস হল ভাষাপ্রযুক্তি। কিংবা সরকারি নির্দেশে ভাষা ব্যবহারকে প্রভাবিত করা হল ভাষাপ্রযুক্তি। বিভিন্ন ধরনের সংযোগ মাধ্যম যথা টিভি, রেডিয়ো ইত্যাদির মাধ্যমে সেই পরিবর্তন নির্দেশ করা হল ভাষাপ্রযুক্তি।

কেউ কেউ ভাষা পরিকল্পনা না বলে বলেছেন Glottoploitcs বা রাজনৈতিক শব্দ নীতি, যেমন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে Karam 'Towards a Definition of Language Planning' প্রবন্ধে এই রাজনৈতিক শব্দ-রীতির

কথা বলেছেন। ঔপনিবেশিক অঞ্চলে বা অন্যত্র দ্বিভাষিকতা যেখানে যেখানে আছে সেই সব অঞ্চলে সরকারিনীতির প্রয়োগ বোঝাতে এই পরিভাষাটি তিনি ব্যবহার করেছেন।

ভাষাপরিকল্পনার বদলে Language Development বা ভাষা উন্নয়নও অনেকে বলেছেন। এ বিষয়ে মৃণাল নাথ ভাষা ও সমাজ (১৯৯৯) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হনলুলুর 'East West Center'-এ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভাষা পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়। এক দশক ধরে কাজকর্ম চলে। ভারতবর্ষ, ইসরায়েল, ইন্দোনেশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ভাষাসমস্যা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এ বিষয়ে Rubin & Jermudd (১৯৭১), Fishman (১৯৭৪), Cobarrubias & Fishman (১৯৮৩) প্রমুখের গবেষণা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে Rubin ও Jermudd ভাষাপরিকল্পনার গ্রন্থতালিকা প্রকাশ করেন। হনলুলুতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'Language Planning News letter' প্রকাশ পায়। আর ১৯৮৬ থেকে ভারতবর্ষের মহীশূর থেকে 'New Langugage Planning News letter' প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ থেকে 'Language Problems and Language Planning' বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে।

১৫.৫ ভাষা পরিকল্পনার নানা ক্ষেত্র

ভাষাপরিকল্পনা নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে তা থেকে কতকগুলি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা ভাষাপরিকল্পনার নানাক্ষেত্র বিষয়ে একটি ধারণা তৈরি করে নিতে পারি। একটি হল প্রয়োগগত দিক। অন্যটি বিষয়বস্তুগত। এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

১. প্রয়োগগত

ক. ভাষা পরিকল্পনা প্রথমে হয়তো ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু পরে তা সমষ্টিতে প্রবেশ করে। আর সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও সরাকরি উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা নেয়। একে collective consciousness বা সমূহিক সচেতনতা হিসাবে দেখা উচিত।

খ. ভাষা পরিকল্পনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত হলেও এর কাজ অনেকটা নির্দেশমূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Prescriptive Linguistics) মতো।

গ. উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে ভাষা পরিকল্পনা বিশেষভাবে জরুরি। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজন অবশ্য আছে।

ঘ. ভাষা পরিকল্পনা সচেতন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

ঙ. সংসদ, প্রতিষ্ঠান, সরকার প্রভৃতির মাধ্যমে ভাষা পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ সেগুলিকে মেনে চলার জন্য গুরুত্ব দেয়।

চ. ভাষা পরিকল্পনা হল তাত্ত্বিকনীতি।

ছ. ভাষা পরিকল্পনার তাত্ত্বিক নীতি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য সরকার বা প্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা গ্রহণ করবেন তাকে ভাষা নীতি বলে। ভাষানীতি গ্রহণ ছাড়া ভাষাপরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় না। তাই ভাষানীতি ও ভাষাপরিকল্পনার অন্তর্গত হবে।

২. বিষয়গত

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে kloss ভাষা পরিকল্পনার বিষয়বস্তুগত কয়েকটি দিক নির্দেশ করেন। এগুলি হল

ক. ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনা।

রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত তৈরি করা।

উপভাষাকে আদর্শ বা মান্য ভাষার মর্যাদা দান।

খ. ভাষার অঙ্গ পরিকল্পনা।

- ভাষাকে মান্য রূপ দান।
- নতুন শব্দ নির্মাণ, পরিভাষা তৈরি করা।
- বানান সংস্কার করা।
- ভাষার রূপতত্ত্বে সমতা নিয়ে আসা।
- লিপি সমস্যা।
- যে কোনো ভাষাগত শৃঙ্খলা আনা।

Hangen ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিষয়বস্তুগত যে ভাগগুলি দেখান পরে ১৯৮৪ তে তার একটি পরিমার্জিত রূপ তৈরি করেন এগুলি হল—

ক. একটি আদর্শ রূপ নির্বাচন করা।

খ. ভাষাকে সংকেতবন্ধ করা।

গ. প্রয়োগ।

ঘ. প্রসারণ।

Hangen প্রদত্ত বিশেষ কার্যকরী বলে অনেকে গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন দেশে ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই মডেলটি গৃহীত হয়েছে।

Klon এর বিভাজন ভাষা পরিকল্পনা দুটি ভিন্ন কাজকর্মের কথা জানায়। Hangen এর মডেল ভাষার অঙ্গ বিভাজন বিষয়ে বেশি কার্যকরী।

E. H. Jahr জানান ভাষা পরিকল্পনা নিয়ে অজস্র কাজকর্ম হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে কিন্তু সে সব কাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য বর্ণনা করা। তত্ত্ব তৈরি করা নয়। তত্ত্ব নির্মাণ বিষয়টিও ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

১৫.৬ সারাংশ

ভাষা পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা হল যে, কোনও ভাষার সমস্যাগুলি সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে সমাধান করার জন্য যে সক্রিয় ভূমিকা সরকার, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেওয়া হয় তাকে ভাষা পরিকল্পনা বলে। ভাষা সংস্কারের নানা দিক আছে। যথা আদর্শ রূপ তৈরি, সরকারি ভাষা তৈরি, নতুন লিখিত রূপ বা ভাষা পুনর্গঠন করা ইত্যাদি। ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োগগত ও বিষয়বস্তুগত নানা ক্ষেত্রে রয়েছে।

১৫.৭ অনুশীলনী

১। ভাষা পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়, তা আলোচনা করুন।

২। ভাষা সংস্কারের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করুন।

৩। ভাষা পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ

মুসা, মনসুর, ১৯৮৫, ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান।

Rubin, J, Fishman, J. A. & Ferguson, F. E (Eds.) 1977 Language Planning Processes, The Hague : Maoton.

একক ১৬ ❐ বাংলা ভাষার সংস্কার ও পরিকল্পনা

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ প্রস্তাবনা

১৬.৩ বাংলা ভাষা সংস্কার ও পরিকল্পনার নানা দিক

১৬.৪ লিপি সমস্যা ও সংস্কার

১৬.৫ বানান সমস্যা ও সংস্কার

১৬.৬ পরিভাষা নির্মাণ

১৬.৭ অভিধান ও উচ্চারণকোষ তৈরি

১৬.৮ প্রশাসনের ভাষা

১৬.৯ শিক্ষা ও মাতৃভাষা

১৬.১০ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা

১৬.১১ বাংলা প্রাইমার রচনা

১৬.১২ সারাংশ

১৬.১৩ অনুশীলনী

১৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা ভাষা পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের কথা জানা যাবে।
- লিপি সমস্যা, বানান সমস্যা, পরিভাষা তৈরির সমস্যা, অভিধান রচনার সমস্যা প্রভৃতি সমস্যা এবং তার সমাধানের কথা জানতে পারা যাবে।
- প্রশাসনের ভাষা, শিক্ষার ভাষা প্রভৃতি বিষয়ও স্পষ্ট হবে।
- ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা যে থেমে নেই তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে।

১৬.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ভাষা সংক্রান্ত নানা সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষিক দেশে ইংরেজি ভাষার একটি প্রাধান্য দেখা যায়। আর তাই শিক্ষিত সচেতন বাংলাভাষী লোকের ক্ষেত্রে বাংলা। ভাষা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার একটি সার্থকতা আছে। ভাষার নানারকম অসঙ্গতি ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে দূর করা হয়। এই পরিকল্পনা এককভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে নিলে সার্থকতা পায় না। সার্থকতা পাবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেশব্যাপী সার্বিকভাবে প্রয়োগ। এখানে ভাষা পরিকল্পনার সূত্র ধরে বাংলা ভাষার উন্নতি এবং সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নেওয়া প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৬.৩ বাংলা ভাষা সংস্কার ও পরিকল্পনার নানা দিক

বাংলা ভাষা নিয়ে ভাষা পরিকল্পনার কাজকর্ম নানা ব্যক্তি ও নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক দিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। যেমন, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটি বানান বিষয়ে নানা সুপারিশ করেছিলেন। আরও আগে ব্যক্তি হিসাবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় মাতৃভাষা ও শিক্ষা নিয়ে উদয় চাঁদ আঢ্য-র প্রবন্ধ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে ভাবনা চিন্তা আরম্ভ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি ভাষা পরিকল্পনার নানা কাজকর্ম করে চলেছে। এই সব কাজকর্মের ক্ষেত্রে সাহিত্য একাডেমির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভাষা সমস্যা ও পরিকল্পনার কিছু নির্দশন দেওয়া হল।

গোপাল হালদার বাংলা ভাষা নিয়ে যেসব সমস্যার কথা বলেছেন তার মধ্যে দিয়ে যে যে বিষয়ে পরিকল্পনার প্রয়োজন তার একটি চিত্র পাওয়া যাবে 'বাঙালি ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির "প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা" গ্রন্থে মুদ্রিত]

প্রথমত, বাংলাভাষী লোকেদের নিরক্ষরতা দূর করা। কারণ, যতদিন তারা নিরক্ষর থাকবে ততদিন এ ভাষার উন্নতি অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মাতৃভাষা বাংলা। তাই উভয়ের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সমস্যাগুলিকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

চতুর্থত, সংস্কারের ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

এগুলি হল প্রাথমিক পরিকল্পনা। এর পর প্রধান সমস্যাগুলির কথা তিনি বলেছেন। সেগুলি হল—

ক. লিপি সমস্যা ও লিপি সংস্কার।

খ. বানান সমস্যা ও বানান সংস্কার।

গ. পরিভাষা নির্মাণ সমস্যা ও পরিভাষা নির্মাণ।

ঘ. অভিধান রচনা, উচ্চারণকোষ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ।

১৬.৪ লিপি সমস্যা ও সংস্কার

বাংলা লিপির আসল চেহারা পুঁথিতে পাওয়া যাবে। বাংলা হরফের মুদ্রিত প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল হ্যালহেডের লেখা 'A grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮) গ্রন্থে। চার্লস উইলফিন্সের নির্দেশে পঞ্চানন কর্মকার পুঁথির আদর্শে বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। এটি লিপির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রথম সংস্কার। কিন্তু লিপির সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়নি।

শ্রীরামপুরে ১৮০১ থেকে মুদ্রিত নানা গ্রন্থে নানারকম লিপি পাওয়া যায়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশু শিক্ষা গ্রন্থে কিছু সংস্কার করেছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ তে বিদ্যাসাগর কিছু লিপি সংস্কার করলেন।

হ্যালহেডের ব্যাকরণে বাংলা হরফে ৩৫৫টি রূপ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর তা বাড়িয়ে করেছিলেন ৯৭৩টি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের ফলে ৫০৭টি রূপ পাওয়া যায়।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ আগস্ট বাংলা একাডেমিতে লিপিসংস্কার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাতে পবিত্র সরকার, প্রসূন দত্ত এবং অশোক মুখোপাধ্যায় একমত ছিলেন। ভিন্ন মত পোষণ করেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। গৃহীত সিদ্ধান্ত হল—

সিদ্ধান্ত ১-এ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ও ঋ-ফলা সর্বত্রই একই রকম হবে। চিহ্নগুলি অক্ষরের নীচে বসবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ডানপাশে নীচের দিকে বসতে পারে। যথা- কু, শু, কৃ, রু ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত ২-যে কোনো যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলির মূল চেহারা অবিকৃত থাকবে। তবে, আপাতত কেবল নীচের যুক্তাক্ষরগুলির প্রচলিত রূপ বজায় থাকবে। যথা ক্ষ, ক্ষ, ত্র, দ্র, ন্ন, জ্ঞ, হ্ন, ত্ত, থ।

সিদ্ধান্ত ৩-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানা ও প্রকাশিত পুস্তকাদিতে ওপরের সিদ্ধান্তগুলিকে রূপদান করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হোক।

সিদ্ধান্ত ৪-প্রয়োজন বোধে ক্র অক্ষরটি 'অ্যা' স্বর এর জন্য রাখা চলতে পারে। স্বরচিহ্ন হিসাবে থাকতে পারে। যথা, ক্রুসিড, কেলকুলেশন।

বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের পর প্রায় সাত বছর কেটে গেছে। সেভাবে লিপি সংস্কার সর্বত্র ঘটেনি।

১৬.৫ বানান সমস্যা ও সংস্কার

নানা কারণে বানানের অসঙ্গতি তৈরি হয়। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার শব্দসমূহও নানা ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার দেশি শব্দগুলি। আর এই শব্দগুলির বানান মূলত উচ্চারণ অনুসারেই করা হয়েছে। তার বড়ো কারণ, বাংলাদেশি শব্দের লিখিত ঐতিহ্য দশম শতকের আগে অর্থাৎ বাংলা ভাষা উদ্ভবের আগে ছিল না। তাই সে সব শব্দের বানান নিয়ে তেমন সমস্যা নেই। সমস্যা তৈরি হয়েছে ধার করা শব্দগুলির ক্ষেত্রে।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড়ো ধার সংস্কৃত ভাষার কাছে। লিখিত সংস্কৃত বানানকে সোজাসুজি বাংলায় আনা হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় থাকেনি। বাংলা বর্ণমালায় বহু বর্ণ আছে যেগুলি বাংলায় উচ্চারিত

হয় না কিন্তু বানানে আছে। যেমন, 'যৎপরোনাস্তি'-র 'ইয়' কে উচ্চারণ করি 'জ'। আবার এমন স্বনিম আছে বাংলা বর্ণমালায় যা নেই। যেমন 'অ্যা' [একটা]। কিন্তু একটি ধ্বনি একটি প্রতীক এভাবে যদি বাংলা বর্ণমালার সংস্কার ঘটিয়ে উচ্চারণ অনুসারে বানান সংস্কার করা হয় তবে তা এক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবে। মোটামুটিভাবে বাংলা লিপিকে বজায় রেখেই বানান সংস্কার করতে হবে।

বাংলা বানান নিয়ে অনেকে মনে করেন, যেমন চলছে তেমনই চলুক। অনেকে মনে করেন মুখের উচ্চারণ অনুসারে বানান হোক। কারো মতে তৎসম শব্দকে মোটামুটি বজায় রেখে বাকিগুলিকে উচ্চারণ অনুসারে করতে হবে। ভাষা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে শেষ দুটি মতবাদ নিয়েই আলোচনা দরকার।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত বাংলা আকাডেমির সুপারিশটি এখানে আলোচনা করা হল। উপসমিতির মূল বিশ্বাস ও নীতি ছিল—

ক. অভ্যস্ত সংস্কারের আমূল পরিবর্তন প্রচলনের সহায়ক হবে না।

খ. সীমাবদ্ধ এলাকায় ছোটো ছোটো সংস্কার বানান সরলীকরণে সাহায্য করবে।

■ **তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে,**

১. ই, ঈ, উ, ঊ এবং ই, ঈ, উ, ঊ কার বিকল্প যেসব বানানে আছে তার মধ্যে অধিকতর প্রচলিত বানানটি গ্রহণ করা।

২. ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে হ্রস্ব-ইকার নিষ্প্রয়োজন। ফলে, শশিভূষণ, শশীভূষণ উভয় চলতে পারে।

৩. বাংলা প্রত্যয়যুক্ত হলেও মূল দীর্ঘ ঊ, দীর্ঘ ঈ চিহ্ন রক্ষিত হবে। যেমন নীলা।

৪. কালে শেষে হসন্ত দেবার দরকার নেই। বিস্বান।

৫. ক্রমশ, অনন্ত ইত্যাদি শব্দের পর বিসর্গ থাকবে না।

৬. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সর্বত্র বর্জিত হবে। কার্তিক।

■ **অর্ধ তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে,**

১. মূলে দীর্ঘস্বর থাকলেও তা হ্রস্বস্বর হবে। পুজো।

২. ক্ষ, ক্ত, শব্দের প্রথমে হলে খ, গ, মাঝখানে ক, খ, গ্, গ দিয়ে লেখা চলবে। যেমন, খোওর, জিগ্‌গেস।

৩. মূলের ণ সর্বত্র দন্ত্য ন হবে। বরণ

৪. মূলের য ফলা বজায় থাকবে। ভাগ্যি।

৫. মূলের য, স, ষ যেখানে বদলে গেছে সেখানে ছাড়া অন্যত্র বজায় থাকবে। দস্যি।

■ **তৎভব শব্দে**

১. স্ত্রী বাচক শব্দের প্রত্যয় হ্রস্ব-ই-কার। ইনি, আনি, নি ও লেখা যায়

২. জাতি বাচক, ভাষাবাচক শব্দে হ্রস্ব-ই-কার। বাঙালি।

৩. সাধারণ বিশেষ্যপদে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন গ্রাহ্য হবে।

৪. অর্থের জন্য ভারী-ভারি, কী-কি-র তফাত থাকবে।

৫. ছোটো, বড়ো লেখা যায়। ভালো, এগারো এসবও লেখা যাবে। কিন্তু কোন্-কোনো তফাত করতে হবে।

৬. ক্রিয়াপদে ঊর্ধ্বকমা ও অকারণ ও-কার বর্জনীয়। বল্, বল, বলো, বোলো, ইত্যাদি পার্থক্য প্রয়োজন।

৭. সময়বাচক শব্দে বা অন্যত্র নিশ্চয়ার্থক-ই বা -ও পৃথক রাখা উচিত। এখনই, এখনও

৮. ঐ-কার, ঔ-কার বিশ্লিষ্ট করে লিখতে হবে। খই বউ ইত্যাদি।

৯. সর্বত্র দন্ত্য-ন হবে।

১০. জাঁতি, জুঁই, জোগাড়, জোয়াল, জোড়া, জো, জোগান ইত্যাদি শব্দ ছাড়া শব্দের আদি য বজায় থাকবে। যখন।

১১. শ, স, ষ প্রচলিত বানান অনুসারে হবে। শিস।

■ **বিদেশি শব্দ**

১. হ্রস্ব স্বরচিহ্ন লেখা উচিত। সিট

২. আরবি বা ফারসি মূল শব্দের স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ 'শ' হবে। যথা মাশুল প্রচলিত শব্দ ও ব্যক্তিনামে 'স' দেওয়া যেতে পারে। সুলতান।

৩. ইংরেজি শব্দে 'ষ্ট' থাকবে। পুরনো বঙ্গীকৃত ঋণ 'স্ট' থাকতে পারে। ইস্টিমার।

৪. কেবল দন্ত্য 'ন'-ই ব্যবহৃত হবে।

৫. শব্দের গোড়ায় যুক্তাক্ষর বজায় থাকবে। মাঝখানে ভাঙা সুবিধাজনক নয়।

বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাবগুলির সবগুলিই যে সমর্থনযোগ্য হয়ে উঠেছে বিদগ্ধ জনের কাছে সে কথা বলা যায় না। বিতর্ক আছে। তবে বাংলা আকাডেমির বানান অভিধান ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের আরও ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে একথা স্বীকার করা উচিত।

১৬.৬ পরিভাষা নির্মাণ

সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা বলতে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বোঝানো হয়। ইংরেজিতে বলা হয় টেকনিক্যাল শব্দ। ভাষা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিভাষা তৈরি। বাংলা ভাষায় পরিভাষা তৈরির কাজ বিদেশিদের বাংলা ভাষা চর্চার সময় থেকে শুরু হয়েছিলা।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে পিটার ব্রেইন সংকলিত গ্রন্থে শারীর বিদ্যার ছশোর মতো পরিভাষা ছিল।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জন ম্যাক-এর 'প্রিনসিপলস অব রেজিষ্টি'-র বাংলা অনুবাদে রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা পাওয়া যায়।

১৮৭৭ রাজেন্দ্রলাল মিত্রর 'এ স্কীম ফর রেন্ডারিং অব ইউরোপীয়ান সায়ান্টিফিক টার্মস্ ইন টু দ্য ভারনাকুলারস্ অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮৯৪-১৯১৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিভাষা নিয়ে তাদের পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে।

১৯০৭ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ কেন্দ্রীয় সমিতির মাধ্যমে নানা শাস্ত্রের পরিভাষা ও শব্দ সংকলন করা হয়। ভাষাবিজ্ঞান সমিতি, পরিভাষা সমিতি ও শব্দ সমিতি মিলে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়েছিল। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অস্থিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পারিভাষিক শব্দ সংকলন করেছিলেন বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রদীপ, ভারতবর্ষ, ভারতী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রভৃতিতে পরিভাষা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। এছাড়াও গ্রহণীয় —

যোগেন্দ্রনাথ রায় রচিত 'রত্নপরীক্ষা'

অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'পদার্থশিক্ষা'

নবীনচন্দ্র দত্ত রচিত 'খগোল বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা তৈরি করেছিল।

১৯৬০ ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল পরিভাষা তৈরির কমিশন গঠন করা হয়, 'Commision of Scientific and Technical Terminology' নামক কমিশন।

১৯৬৪ তে তারা বিজ্ঞান কার্যাবলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯৮৫ তে বাংলা আকাডেমি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত তৈরি করেন।

প্রকৃতপক্ষে পরিভাষা নিয়ে, তার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জানান যে, বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রচলিত ভাষা থেকে আলাদা।

"একটি নির্দিষ্ট শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে। সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না। এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।"

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৮৯৪ খ্রিঃ]

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় অপূর্বচন্দ্র দত্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃতজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানকে গুরুত্ব দেন। রামেন্দ্রকুমার ইংরেজি পরিভাষা বাংলায় অনুবাদ না করে অক্ষরান্তরিত করতে চেয়েছেন। যোগেশচন্দ্র রায়ও বিষয়টিকে সমর্থন করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অযথা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে পরিভাষা তৈরির প্রয়োজন কী—এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেখেন যে,

"যত কম পরিবর্তন করিয়া ইংরেজী নামগুলি গ্রহণ করিতে পারা যায়, তা বিষয়ে সর্বাগ্রে যত্নবান হওয়া উচিত।"

হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধে বললেন,

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত উপযুক্ত শব্দ গ্রহণ।

খ. নতুন শব্দ তৈরি।

গ. অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দে স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ভাবে গ্রহণ।

ঘ. অন্যান্য জাতি যে সমস্ত শব্দ বা সাংকেতিক চিহ্ন কোন এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে তা কোথাও অক্ষরান্তরিত করে গ্রহণ ও কোথাও সরাসরি গ্রহণ।

রাসবিহারী মণ্ডল 'খনিজবিদ্যার পরিভাষা' (১৯২১) তৈরি করার ক্ষেত্রে আরও মুক্ত মনের পরিচয় দিলেন। রবার্টসন এর বই থেকে তিনি চারটি উৎস পেয়েছেন বলে জানালেন। যেমন,

ক. কয়লাভূমিতে ব্যবহৃত স্থানীয় পরিভাষা। যেমন Surveyor কম্পাসবাবু

খ. অপরিবর্তিতরূপে গৃহীত পরিভাষা। Dyke ডাইক

গ. সহজে উচ্চারণ করার জন্য সামান্য পরিবর্তিত শব্দ। Bolt বোল্টু

ঘ. খুব বেশি বিকৃত। Holding Clown bolt-হরিনারায়ণ বোল্টু প্রাদেশিক ভাষাতে অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নতুন কথা গড়া প্রবন্ধে প্রচলিত ভাষার মধ্যে পারিভাষিক শব্দটি না পেলে প্রাদেশিক ভাষাতে অনুসন্ধান করতে বলেছেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিজ্ঞানের কিছু পরিভাষা তৈরি করেন। যেমন, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি। সুকুমার সেন, পুণ্যশ্লোক রায়, পবিত্র সরকার প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী পরিভাষা তৈরি করেছেন। কিন্তু সবাই একমত হয়ে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। ৯.৮.১৯৮৫ তারিখে বাংলা আকাডেমির পরিভাষা উপসমিতির সিদ্ধান্ত হল—

১. পরিভাষা যথাযথ, সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শব্দ বিদেশি হলেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বর্জন না করা।

৩. পরিভাষায় গৃহীত শব্দ বাংলা ভাষা স্বভাবের বিরোধী না হয় তা দেখা।

৪. পরিভাষা নিয়ে পূর্বেকার সমস্ত উদ্যোগ, যথাযথভাবে বিবেচনা করা।

৫. প্রশাসন ও বিদ্যাচর্চার বিভিন্নক্ষেত্রে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের পরিভাষা সংকলনে পরামর্শ গ্রহণ।

৬. পরিভাষা নির্মানকালে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নির্মিত পরিভাষাও প্রয়োজনে বিবেচনা করা।

সুপারিশ হিসাবে, জনমত যাচাই করার জন্য পরিভাষায় খসড়া সংসদ পত্র বা সাময়িক পত্র বা পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করা। বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি নিয়ে উপসমিতি তৈরি করে পরিভাষা সংকলনের কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।

১৬.৭ অভিধান ও উচ্চারণকোষ তৈরি

বাজার চলতি অভিধানগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করার কথা বলেন ডঃ নির্মল দাশ। বড়ো এবং ছোটো। বৃহদায়তন অভিধানগুলির মধ্যে হরিহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (২ খণ্ড) ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের 'বাঙলা ভাষার অভিধান' (২ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য। আর ক্ষুদ্রায়তন অভিধান হিসাবে শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত 'সংসদ বাঙলা অভিধান' (১ম খণ্ড) উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এসব অভিধানের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাই নতুন অভিধান রচনার কথা ডঃ নির্মল দাশ জানান। সেজন্য কতকগুলি দিক লক্ষ করার কথা তিনি বলেন। যেমন,

ক. অভিধানে নতুন নতুন শব্দকে স্থান দেওয়ার জায়গা খোলা রাখতে হবে।

খ. শব্দের সঙ্গে প্রয়োগগত এলাকা নির্দেশ করতে হবে।

গ. উচ্চারণ নির্দেশ করা দরকার।

ঘ. উদ্দেশ্য অনুসারে সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎ উভয় প্রকার অভিধানই রচনা করতে হবে।

শব্দ, উচ্চারণ, পদবিভাগ, স্তর নির্দেশ (গ্রাম্য, কথ্য ইত্যাদি), উৎস নির্দেশ ও ব্যুৎপত্তি সহজ শব্দ, বাক্যখণ্ড ও বাক্যে প্রাথমিক অর্থনির্দেশ, উদাহরণ দিয়ে প্রয়োগ নির্দেশ, প্রতিশব্দ, প্রয়োজনে বিপরীত শব্দ, পদান্তর নির্দেশ প্রভৃতি সংহত অভিধানে দেওয়া দরকার। সুবৃহৎ অভিধানে এছাড়াও শব্দের ইতিহাস, প্রথম প্রয়োগ ও পরবর্তী পরিণাম, অর্থান্তর, তুলনামুলক পর্যালোচনা, শব্দের উচ্চারণ ও বানানের কালান্তর ব্যাপী বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথ নির্দেশ প্রভৃতি যুক্ত হতে পারে।

বাংলা অভিধানে উপসমিতি যেসব সিদ্ধান্তে নেয় তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১. সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য অভিধান রচনা।

২. উচ্চারণ, উৎস, ব্যুৎপত্তি, বিশেষ শব্দের দৃষ্টান্ত, সম্ভব হলে প্রথম প্রয়োগের ইতিহাস যুক্ত করতে হবে। শব্দ চয়নের আদর্শ—ক. সাহিত্যে ব্যবহার খ. সাহিত্যে সংবাদপত্রে তার ব্যবহার এর frequency দেখতে হবে গ. ১৫ শতক থেকে শব্দ চয়ন শুরু করতে হবে। শব্দসংখ্যা আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার।

৩. বাচ্যার্থ-লক্ষ্যার্থ-সাংকেতিক এই ক্রমে অর্থ নির্দেশ করতে হবে। দরকার হলে লিঙ্গান্তর ও বিপরীত শব্দ দিতে হবে।

৪. প্রচলিত অভিধানের শব্দ ছাড়াও সাধারণ লোকের কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

শব্দার্থ অভিধান নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। তারপর কিশোর অভিধান, আঞ্চলিক - লৌকিক কোষ, জীবনী কোষ, সাহিত্যকোষ, তুলনামূলক ভাষা অভিধান প্রভৃতি রচনা করতে হবে।

১৬.৮ প্রশাসনের ভাষা

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশাসনের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইনটি অনুমোদিত হয়। মাঝে মাঝে সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হলেও সে ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়নি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রীসভা কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যথা—

ক. সরকারি নথিপত্রে বাংলা ভাষায় মন্তব্য লিখতে হবে।

খ. সরকারি ফর্ম, রেজিস্ট্রার ইত্যাদি বাংলা ভাষায় ছাপাতে হবে।

গ. জনসাধারণের কাছে বাংলায় চিঠি লিখতে হবে।

ঘ. নিম্ন আদালতে কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করা দরকার।

ঙ. বাংলা ভাষায় স্টেনোগ্রাফি ও টাইপিং জ্ঞান আবশ্যিক করতে হবে।

চ. ইংরেজি স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিষ্টদের বাংলা প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

ছ. বাংলা টাইপরাইটার কিনতে হবে।

জ. সরকারি অফিসে ফলকগুলি বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

প্রশাসনের কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করা যেমন—ভাষাপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তেমনি প্রশাসনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিলে আমাদের চারপাশের জীবনে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

কেন্দ্র ও অন্য রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে কিংবা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা অবশ্য ব্যবহার করতে হবে।

১৬.৯ শিক্ষা ও মাতৃভাষা

লিখতে জানার আগে শিক্ষা ছিল মৌখিক ও শ্রুতিনির্ভর। আর তা অবশ্যই মাতৃভাষা নির্ভর। সাক্ষরতার সঙ্গে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হবে না অন্য ভাষা হবে সে প্রশ্ন জড়িত হয়। ইংরেজ শাসকদের আসার আগে যখন শাসনকাজের ভাষা ফারসি ভাষা ছিল তখন সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ শাসক এদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। কিন্তু বিষয় বা ধারণা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখতে পারলেই তা নিজস্ব বিষয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলনের ভূমিকা গ্রহণ ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্গত।

কিন্তু কোনো মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলন করলেই হবে না। প্রয়োজন শিক্ষার উপযোগী আদর্শগ্রন্থ রচনা করা। বাংলা ভাষার এরকম বই খুব কম। ফলে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচলনের পাশাপাশি মাতৃভাষার উপযুক্ত গ্রন্থ রচনা করা এবং বাংলা ভাষায় বিদেশি বই অনুবাদ করা বিশেষ প্রয়োজন। না হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমাগত পিছিয়ে যাব।

১৬.১০ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা

সারা পৃথিবীতে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক প্রচার দেখা যায়। প্রায় সব দেশেই ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। Otto Jesperson ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জানান যে, ইংরেজির প্রসারের মূল কারণ, অন্যদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব। অধীনস্থ প্রজারা নিজেদের স্বার্থে ইংরেজি শিখেছে। পবিত্র সরকার জানান, যে মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের কাছে ইংরেজি শেখার সঙ্গে চাকরি পাওয়া, উচ্চশিক্ষা লাভ করা এইসব সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই বাংলাভাষী লোকের কাছেও ইংরেজি ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখার গুরুত্ব আছে।

দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কথা বলতে বলতে শেখার কথাই ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন। এছাড়া দরকার ইংরেজি মাতৃভাষার মতো বলতে পারেন এমন শিক্ষক। শিক্ষক ভাষাবিজ্ঞানী হল ভালো। যথেষ্ট পরিমাণে বাক্য ব্যবহার অভ্যাস করা দরকার। টেপরেকর্ডার, রেকর্ডপ্লেয়ার, ভিডিয়ো, ফিল্ম, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা

দানের পাশাপাশি ভাষাগবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্লাসের বাইরে ভাষা শেখানো, বাড়িতে ক্যাসেট চালিয়ে শেখা, উপযুক্ত পাঠ্যবই, রেকর্ড, ক্যাসেট তৈরি করা ইত্যাদির উপর জোর দিতে হবে।

১৬.১১ বাংলা প্রাইমার রচনা

লেখাপড়া শেখার প্রথম পদক্ষেপ হল প্রাইমার। নানা সময়ে বাংলা শেখানোর জন্য প্রাইমার লেখা হয়েছে। পড়িবার বই, (তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৩৫), বর্ণমালা (স্কুল বুক সোসাইটি ৭ম সং ১৮৫৩), বর্ণপরিচয় (বিদ্যাসাগর ১৮৫৫), বর্ণপরীক্ষা (হীরালাল মুখোপাধ্যায়), বর্ণপরীক্ষা (নবকুমার নাথ, ১৮৭৫), বর্ণশিক্ষা (গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮), বর্ণবোধ (চারজন একই নামে লেখেন ১৮৭৩-৭৫-এ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৪-৭৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ অনুগত, ১৮৭৭ রামনাথ রায়), হাসিখুশি (যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৮৯৮), সহজপাঠ (রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০) নিজে পড় (সুখলতা রাও ১৯৫৬), কিশলয় (পঃ বঃ সরকার, ১৯৮১) প্রভৃতি।

পবিত্র সরকার 'ভাষা-দেশ-কাল' গ্রন্থে বাংলা প্রাইমারের নানা দিক আলোচনা করেছেন। তিনি পড়া-লেখা এবং উচ্চারণ শেখানো আলাদা ভাবে এই তিনটি দিক ধরে আদর্শ প্রাইমার রচনার একটি মানদণ্ড তৈরি করেছেন। এগুলিকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলেছেন। যথা,

পড়তে শেখানো।

ক. লিপির সঙ্গে পরিচয়।

খ. বর্ণকে আলাদা ভাবে চেনানো।

গ. একই বর্ণের রূপভেদগুলি চেনানো।

ঘ. বর্ণ সময়ের ধারণা নিয়ে চেনানো।

উচ্চারণ শেখানো।

ক. বর্ণ ও তার উচ্চারণের সম্পর্কটি শেখানো।

খ. বাক্য ও তার স্বরভঙ্গি শেখানো।

লিখতে শেখানো

ক. কিছু সরল ডিজাইন অভ্যাস করিয়ে বর্ণগুলির চেহারা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করানো।

খ. বর্ণ-বর্ণভেদ বারবার লিখিয়ে অভ্যাস করানো।

গ. প্রতিবর্ণের পরিমাণ, মধ্যবর্তী দূরত্ব, দুটি শব্দের মাঝখানের ফাঁক ইত্যাদি শেখানো।

ঘ. কমা, সেমিকোলন, কোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি বিরতি চিহ্নের ব্যবহার শেখানো।

ঙ. বানান শেখানো।

এসব ছাড়াও আরও কিছু দিক দেখা দরকার বলে তিনি মনে করেছেন।

ক. প্রাইমারে শিশুর অভিজ্ঞতার সমর্থন বা বৃদ্ধির উপাদান যথেষ্ট আছে কিনা তা দেখতে হবে।

খ. বর্ণশেখানোর পদ্ধতি বর্ণানুক্রমিক, ধ্বনিমূলক, শব্দানুক্রমিক, বাক্যানুক্রমি, গাল্পিক কিম্বা প্রভৃতির মিশ্ররূপ তা দেখতে হবে।

গ. উপাদান উপকরণ শিশুর কাছে আগ্রহ তৈরি করছে কিনা তা দেখতে হবে।

ঘ. অক্ষর পরিচয় ছাড়াও অন্য কোনো লক্ষ্য আছে কিনা তা দেখতে হবে।

বলা বাহুল্য, বাংলা প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে বর্ণবিন্যাসের প্রধান তিনটি পদ্ধতি আছে।

একটি পদ্ধতিতে বর্ণবিন্যাস শিখিয়ে তারপর শব্দ এবং বাক্য শেখানো।

অন্য পদ্ধতিতে বাক্য ভেঙে শব্দ এবং শব্দ ভেদে বর্ণপরিচয় ঘটানো।

এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে বর্ণ থেকে শব্দ-বাক্য এবং বাক্য থেকে সব-বর্ণ এই মিশ্ররূপ শেখানো হয়।

প্রাইমারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদ্ধতিটি অবলম্বন করা শ্রেয়।

প্রতিটি বর্ণ শেখানোর পর সেগুলি লিখতে শেখান যথেষ্ট প্রয়োজন।

জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের দিকে যাত্রা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য শেখানো প্রয়োজন। পরিবারের লোকজন—বাড়িতে ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম প্রভৃতি জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন। মূর্ত শব্দগুলি আরো শেখানো দরকার। এবং বর্ণের পাশে চিত্র ব্যবহার করা দরকার। বিমূর্ত শব্দ একদম শেষে শেখানো দরকার।

অনেকে মনে করেন শিক্ষামূলক বিষয় ছোটোদের শেখানো দরকার। প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক, নীতিশিক্ষামূলক বিষয়কে তাঁরা গুরুত্ব দেন। আসলে শিশুদের কৌতূহল আর ভালোবাসা না জন্মালে শিক্ষার বিষয়টি তাদের কাছে নিষ্প্রাণ মনে হবে। প্রাইমার থেকে সেই ধারণা তৈরি না হলে পরবর্তীকালে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ কমে যাবে। প্রাইমার রচনার সময় এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৬.১২ সারাংশ

বাংলা ভাষার সংস্কার ও নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভাষাবিজ্ঞানী এবং পন্ডিতবর্গ আলোচনা করেছেন। গোপাল হালদার সমস্যাগুলিকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেন। লিপি, বানান, পরিভাষা ও অভিধান নিয়ে কাজকর্মের কথা তিনি বলেন। পুঁথিতে বাংলা লিপির আসল চেহারা পাওয়া যায়, ছাপার ক্ষেত্রে লিপির চেহারা নিয়ে গবেষণাও নানাবিধ হয়েছে। বানান-এর সামঞ্জস্য বিধান নিয়ে নানাবিধ প্রস্তাব নানা সময়ে দেওয়া হয়েছে। অভ্যস্ত সংস্কারের আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে ছোটো ছোটো সংস্কার ঘটানোর কথা বলা হয়। পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে যথাযথ, সহজ ও সংক্ষিপ্তকরণের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনমত যাচাই করার কথাও বলা হয়। অভিধান উচ্চারণ বোধ তৈরির ক্ষেত্রে একটি ছোটো এবং একটি সুবৃহৎ অভিধান রচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রশাসনের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন এর পাশাপাশি সার্থক বাংলা প্রাইমার রচনার দিকে জোর দেওয়া হয়।

১৬.১৩ অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. লিপিসংস্কার, খ. তৎসম শব্দের বানান, গ. তদ্ভব শব্দের বানান, ঘ. পরিভাষা নির্মাণের সুপারিশ

২। বাংলা ভাষা সংস্কার ও পরিকল্পনার নানা দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। বানান সমস্যা এবং তার সংস্কারের দিকগুলি নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৪। পরিভাষা নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন দিকগুলি দেখা দরকার বলে আপনি মনে করেন তা লিপিবদ্ধ করুন।

৫। প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব দেখিয়ে আলোচনা করুন। প্রসঙ্গত বাংলা প্রাইমার এর বৈশিষ্ট্য কী হবে তা দেখান।

৬। বাংলা প্রাইমার রচনার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য কী কী তা আলোচনা করুন।

১৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ

মুসা, মনসুর, ১৯৮৫, ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব।

হুমায়ুন রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬ প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার।

Rubin, J, Fishman, J. A. & Ferguson, F. E (Eds.) 1977 Language Planning Processes, The Hague : Maoton, -1-1

ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব

একক ১৭ ❐ রসবাদ, ধ্বনিবাদ ও বক্রোক্তিবাদ

গঠন

১৭.১ প্রস্তাবনা ঃ রসবাদ

১৭.২ রসবাদ

১৭.৩ সারাংশ

১৭.৪ অনুশীলনী-১

১৭.৫ প্রস্তাবনা ঃ ধ্বনিবাদ

১৭.৬ ধ্বনিবাদ

১৭.৭ সারাংশ

১৭.৮ অনুশীলনী-২

১৭.৯ প্রস্তাবনা-বক্রোক্তিবাদ

১৭.১০ বক্রোক্তিবাদ

১৭.১১ সারাংশ

১৭.১২ অনুশীলনী-৩

১৭.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.১ প্রস্তাবনা ঃ রসবাদ

একদা প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা কাব্যের দেহ ও আত্মার স্বরূপ সন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন। কাব্য সাহিত্যের দেহ কী ? আত্মাই বা কাকে বলে ? কাব্যের বাহ্যরূপটা যদি হয় দেহ তাহলে সেই কাব্যদেহ নির্মাণের একমাত্র উপাদান হল 'শব্দ' কিন্তু যে কোনো শব্দই বা অর্থহীন শব্দ পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে না। একালের য়ুরোপীয় রূপবাদী সাহিত্যরসজ্ঞগণ শব্দের অর্থবহ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের আলোচনা করেছেন। সুতরাং কাব্যদেহের স্বরূপ আলোচনায় শব্দ ও অর্থের, বহাচক ও বাচ্যের লীলাতত্ত্বই আলোচনা করতে হবে। সাহিত্য হল শব্দ ও অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন। শব্দার্থ দিয়ে গঠিত সাহিত্যের আত্মা কী—এই আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আলঙ্কারিকেরা রসবাদ, ধ্বনিবাদ এবং বক্রোক্তিবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আপনারা এই এককটি পড়ে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। রস কী, সাহিত্য পাঠ করে পাঠক মনে রসের উৎপত্তি ঘটে কীভাবে, সাহিত্য পাঠের সার্থকতাই বা কোথায়, সাহিত্য আনন্দদায়ক কেন, ধ্বনিকাব্য কাকে বলে, বক্রোক্তির কাজ কী — ইত্যাদি সম্পর্কিত নানান ধারণা গড়ে উঠতে সাহায্য করবে এই এককটি।

১৭.২ রসবাদ

রসের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আচার্য ভরত প্রশ্ন তুলেছিলেন 'রস ঃ ইতি কঃ পদার্থঃ ? প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন, 'উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ' অর্থাৎ তাই 'রস' যা আস্বাদ্য। এই রসের আস্বাদন ঘটে কীভাবে তা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে জানালেন ঃ 'বিভাবনুভাবব্যভিচারী সংযোগাদ্রসনিষ্ঠাত্তিঃ' অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যবভিচারীর সংযোগ থেকে রসনিষ্পত্তি ঘটে। আলোচ্য শ্লোকে তিনি স্থায়িভাবের কথা উল্লেখ না করলেও নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে স্থায়ীভাবই যে রসত্বপ্রাপ্ত হয় সে কথা ঘোষণা করলেন একাধিকবার। ভরতের মতে, স্থায়ীভাবের সংখ্যা আট এবং শাম নামক স্থায়ীভাবকে স্বীকার করলে তার সংখ্যা দাঁড়ায় নয়। যতগুলি ভাব ততগুলিই রস, সুতরাং রসের সংখ্যাও দাঁড়াবে আটটি বা নয়টি। ভাব ও রসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; এই, সম্পর্ক বোঝাতে ভরত লিখেছেন—'ন ভাবহীনোহস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ/পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরণয়োঃ রসভাবয়োঃ'। অভিনবগুপ্তাচার্য ভাব বলতে বুঝিয়েছেন 'স্থায়ীভাব' ও 'ব্যাভিচারী ভাবকে'। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এদুটি ভাবই রসের অন্তরঙ্গা উপাদান এবং বিভাব ও অনুভাব হল রসের বহিরঙ্গা উপাদান। রসের এই অন্তরঙ্গা উপাদান দুটি অর্থাৎ 'স্থায়ীভাব' ও 'ব্যাভিচারী' ভাব দুইই পাঠক বা দর্শকের অন্তরে বিরাজ করে। এই ভাবদুটিকে পুষ্ট হতে সাহায্য করে বিভাব ও অনুভাব। সুতরাং 'রস' যদি হয় আস্বাদ্য তাহ'লে বুঝতে হবে পাঠক বা দর্শকের অন্তরস্থ স্থায়ীভাবই তাঁর কাছে হয়ে উঠবে আস্বাদ্য। এমন কোনো রসের অনুভূতিই ঘটতে পারে না যা গড়ে তোলার জন্য স্থায়িভাব নেই।

ভরতাচার্য শৃঙ্গারাদি মোট আটটি 'রস'-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। আবার শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং বীভৎস—এই চারটিকে মূল রস বলে মনে করেছেন। অভিনবগুপ্ত মনে করেন, ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গের সঙ্গে চারটি রস যুক্ত—'যে চাত্রোৎপত্তি-হেতব উক্তাস্তে যথা স্বয়ং (যথাবং) পুরুষার্থ চতুষ্কব্যাপ্তাঃ'। তবে রসের সংখ্যা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত রস সম্পর্কে বহুবচন এবং কখনো একবচন প্রয়োগ করেছেন। ষোড়শ শতকে কবি কর্ণপুর গোস্বামী বলেন, রজঃ এবং তমোগুণ বিনির্মুক্ত একমাত্র সত্ত্বগুণের দ্বারা গঠিত রসানুভূতি 'এক'। বিভাবাদির বিভিন্নতার জন্যই এক রসের বিভিন্ন অভিধা। 'অলঙ্কার কৌস্তভ'-এর ৫ম কিরণে কবিকর্ণপুর লিখেছেন—'রসস্য আনন্দধর্মত্বাৎ একত্বম, ভাব এবহি।' আলঙ্কারিক ভোজরাজ আটটি নয়, চারটি রসের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে চারটি রস হল—শান্তু, প্রেয়স, উদাত্ত এবং উদ্ধত। অনুরূপভাবে ব্যাভিচারীর সংখ্যা নিয়েও মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ভরত রসের কথা উত্থাপন করেছিলেন নাটক প্রসঙ্গে। সেই নাট্যরসই কালক্রমে কাব্যরসরূপে গৃহীত হয়েছে। তবে ভরতের রস নিষ্পত্তির সূত্র নিয়ে পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছিলেন। ভরতের সূত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর রস সম্পর্কে চারটি মতবাদ গড়ে তুলেছেন। এইগুলি হল ঃ

১। ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ

২। ভট্টশাঙ্কুরের অনুমিতিবাদ

৩। ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

৪। অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

ভট্টলোল্লট উৎপত্তিবাদী হিসেবে পরিচিত। লোল্লটের মতে, নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রস নট-নটীতে আরোপিত হয় মাত্র। এ অনেকটা রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো। লোল্লট মনে করতেন, যে অসত্য অনুভূতি দর্শক বা পাঠকের মধ্যে জাগে তা আনন্দদায়ক। রসের উৎপত্তি ব্যাপারটি তাঁর মতে, নায়িকা-নায়িকাগত। সুতরাং রসের উৎপত্তি হয় এবং তা হয় নায়ক-নায়িকার মধ্যে ; দর্শক বা পাঠক সেই রসকে আরোপ করে নট-নটীতে। এই মতানুসারে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উভয়ের মধ্যে যে শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি হয়, দর্শকরা নট-নটীতে প্রত্যক্ষ করার সময় সেই রস নট-নটীতে আরোপ করে থাকেন।

লোল্লটের এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করেন অনুমিতিবাদী ভট্টশঙ্কুক। তিনি বললেন, রসের উৎপত্তি ঘটে অনুমান থেকে। কুয়াশা-দ্বারা ব্যাপ্ত দেশে অবিদ্যমান ধূমের মিথ্যা অনুমান থেকে যেমন ধূমযুক্ত বহ্নির অনুমান হয়, সেইরকম নিপুণ নট-নটী যখন অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা অবিদ্যমান দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে প্রকাশ করে তখন দর্শকের মধ্যে নট-নটীতে দুষ্মন্ত্যাদি—গত রতির অনুমান হয়। সেই অনুমান থেকেই দর্শক তথা 'সামাজিকের' হৃদয়ে রসের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই যে অনুমান, কার স্বরূপ কী ? শঙ্কুক বললেন, চিত্রার্পিত অশ্বকে যেমন দর্শক অশ্বজ্ঞান করে এই অনুমানও সেইরকম। চিত্রার্পিত অশ্বকে দেখে দর্শকের মধ্যে সম্যক, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য—এই চারটি জ্ঞানের কোনোটিই হয় না। সুতরাং শঙ্কুকের সিদ্ধান্ত হল, চিত্রার্পিত অশ্বে অশ্বের অনুমান হয় বলে, তা আনন্দদায়ক। সেই রকম নট-নটীতে নায়ক-নায়িকার অনুমানের দ্বারা দর্শকেরা আনন্দ বা রস অনুভব করেন।

অতঃপর এলেন ভট্টনায়ক। ভুক্তিবাদী ভট্টনায়ক পাত্র-পাত্রীর মধ্যে রসোৎপত্তি, নট-নটীতে নায়ক-নায়িকার অনুমান হেতু রসের অনুমান কোনোটিই মানলেন না। তিনি নাট্যদর্শন বা কাব্যপাঠকালে দুটি ক্রিয়ার উদ্ভবের কথা বলেছেন—ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব। প্রথমটির দ্বারা 'সহৃদয়ে'র তটস্থতা দূর হয়। নায়ক-নায়িকা যে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সর্বসময়ের ও সর্বকালের তা বোঝা যায় 'ভাবকত্ব' ক্রিয়াটির দ্বারা। ভাবকত্ত্বের কাজ দুটি সাধারণীকরণ এবং পার্থিব চিন্তাধারায় ভার থেকে মুক্ত করে চিত্তে তন্ময়তা-সৃষ্টি করা। ভট্টনায়কের মতে, অতঃপর ভোজকত্ব ব্যাপার দ্বারা ললনা বিষয়ক রতি 'সামাজিক' গণ উপভোগ করেন এবং ওই প্রকার রতির উপভোগ থেকেই রসের নিষ্পত্তি ঘটে।

অভিব্যক্তিবাদী অভিনব গুপ্ত ভাবকত্ব বৃত্তিটি স্বীকার করলেও ভোজকত্বরূপ বৃত্তিটি স্বীকার করলেন না। তিনি মনে করেন, ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই রসোপলব্ধি ঘটে থাকে। ফলে ভোজকত্ব রূপ বৃত্তিটির কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। ভট্টনায়কের মত, অভিনব গুপ্তও স্বীকার করেছেন যে, সহৃদয় রসিক ও দর্শকের ব্যক্তিগত জীবনে যে ভাবনাস্রোত বল তা কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনকালে সাময়িকভাবে থেমে যায়। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বোধ যা রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে বিঘ্নকারক, বাক্যপাঠকালে সেই বিঘ্ন দূর হয়। যতক্ষণ ব্যক্তিগত চিন্তা চৈতন্যকে আবৃত করে রাখে ততক্ষণ রসাস্বাদ সম্ভব নয়। অভিনব গুপ্ত সাতরকম বিঘ্নের কথা উল্লেখ করেছেন—প্রতিপত্তি বিষয়ে অযোগ্যতা, স্বগত বা পরগতভাবে দেশ-কালের অনুভব, নিজের সুখ ও দুঃখ বোধের দ্বারা বিবশভাব, প্রতীতির উপায়ে বৈকল্য, অস্পষ্টতা, অপ্রধানতা ও সংশায়িত প্রতীতি। এইসব রজঃ ও তমোগুণই রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে বিঘ্নস্বরূপ। সুতরাং রজঃ এবং তমোগুণ বিনির্মুক্ত হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হলে তাই রসের আস্বাদ সম্ভব। সত্ত্বগুণে চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থির হয়। চিত্রের এই স্থিতিই হল, অভিনবগুপ্তাচার্যের ভাষায় 'চিত্তবিশ্রান্তি'। অভিনব গুপ্ত জানেন, মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে অহং-মুক্ত স্থির চিত্ত সর্বদা থাকে না। ফলে

কাব্য-নাট্যপাঠ বা দর্শনকালে যখন সেই বিশ্রান্তচিত্তে 'স্ব-সংবিদানন্দ চর্বণ-ব্যাপার' সম্ভব হয়, তখনই রসাস্বাদ ঘটে। এই রসের আস্বাদক নায়ক-নায়িকা বা নট-নটীতে নয়। নট-নটী যদি রসের আস্বাদে সক্ষম হয় তবে তাঁরা তা আস্বাদ করেন সাধারণ দর্শকের ভূমিকা থেকে। সুতরাং রস অনুভব একমতার্ দর্শকের পক্ষেই সম্ভব। এই দর্শক বা পাঠককেই বলা হয় 'সহৃদয় সামাজিক'। অভিনব গুপ্ত বলছেন—'যেধাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভাবনযোগ্যতা তেহত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কাব্যচর্চায় স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত মনোমুকুরের অধিকারীই সেই পাঠক, যার অন্তরে রসের অভিব্যক্তি ঘটে। তাহলে বোঝা গেল যে, অভিনবগুপ্ত রসের উৎপত্তি বা অনুমানে বিশ্বাসী নন, বিশ্বাসী নন এই মতেও যে, নায়ক-নায়িকা রসের আশ্রয়। তাঁর মতে হ'ল, রসের প্রতীতি ঘটে পাঠক বা দর্শক হৃদয়ে। এই পাঠক বা দর্শক ধ্বনিকারের ভাষায় 'কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞ'।

ভারতের পর ভামহ এবং দণ্ডী 'রস' সম্পর্কে ততটা গুরুত্ব দেননি। ভামহ বলেছিলেন 'সৈবা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন অলঙ্কারের উপর এবং রসবৎ অলঙ্কার রূপে রসের মাহাত্ম্য স্বীকার করেছিলেন। দণ্ডীও তাঁর 'কাব্যাদর্শে', রস-কে মাধ্র্যগুণের অন্তর্গত করেছিলেন। দণ্ডী রসবাদীদের পন্থায় রসের স্বরূপ আলোচনা করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহাকাব্যে ভাব এবং রস দুই থাকবেই। বিশ্বানাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণ'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে রসের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, রস হ'ল বেদান্তর সম্পর্কশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর, স্বপ্রকাশ অখণ্ড চিন্ময়ানন্দ, এবং লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ। বেদান্তর সম্পর্কশূন্য কথার অর্থহল, রসের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কোন সম্বন্ধ নেই। রজঃ গুণগত কামনা-বাসনা, তমঃ গুণজাত দুঃখ-মোহ প্রভৃতি দূর হয়ে চিত্তে সত্ত্ব গুণের আবির্ভাব হয় ; এই অবস্থায় বাহ্যবস্তু বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। এইভাবে বেদান্তর-সম্পর্কশূন্যতা সৃষ্টি হয়। আর 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' কথার অর্থ হ'ল, ব্রহ্মানুভূতির সময়ে যেমন অপর কোন বস্তুর জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি, রসানুভূতির সময়ে বিষয়ান্তরের জ্ঞান থাকে না। তবে এখানে 'সহোদর' শব্দটির দ্বারা 'ব্রহ্মবাদ' ও 'কাব্যস্বাদে'র মধ্যে একটা পার্থক্য করা হয়েছে। 'সহোদর' শব্দটির অর্থ হল 'মতো'। অর্থাৎ কাব্য ব্রহ্মের মতো অবাঙ্মনসগোচর নয়, তার 'রূপ' আছে। 'স্বপ্রকাশ' কথার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, অন্য কোনো জ্ঞানের দ্বারা রসানুভূতি হয় না। রসোৎপত্তির কারণেই রসের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ বিশ্বনাথ বলছেন যে, অলৌকিক কাব্যের পর্যালোচনায় যে অনির্বাচনীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে চিত্তের বিস্তার করে, সেই বিস্তার রূপ উদারতাই চমৎকার পদার্থ। ওই চমৎকার পদার্থই রসের প্রাণ। সুতরাং কাব্যরসিকের মানসিক উদারতার কারণ যদি হয় রস, তাহলে সেই রসকে বলা হয় 'চিত্তাবিস্তারক'।

রসবাদীদের মতে, রস হল 'লোকোত্তর-চমৎকার প্রাণ।' লোকোত্তর চমৎকারিত্বই কাব্য বা নাটক থেকে অনুভূত হয়, যেহেতু কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনের মুহূর্তে পাঠক বা দর্শক ব্যক্তিগত লাভক্ষতির ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ পাঠক বা দর্শক অনুভব করেন ও ঘটনা তাঁর ব্যক্তিজীবনের নয় অথচ তাঁর জীবনেও এঘটনা ঘটা সম্ভব ; আবার এই ঘটনা অপরের এবং সম্পূর্ণ অপরেরও নয়। একই সঙ্গে এই বিপরীত ধরনের অনুভূতি বাস্তবে সম্ভব নয়, কিন্তু বাস্তবের অসম্ভব ঘটনাই কাব্যে সম্ভব হয় বলেই কাব্যের বা রসের জগৎ লোকোত্তর আনন্দের জগৎ। লৌকিক আনন্দে ব্যক্তিগত স্বার্থজড়িত থাকে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে যেহেতু বাস্তব প্রয়োজন ও জীবনের প্রাত্যহিক উপলব্ধির কোনো স্থান থাকে না তাই তো অলৌকিক। ভাষাসাহিত্য পাঠকালে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্য-বর্জিত বিষয়বস্তুর একাত্মতা ঘটে থাকে। রসবাদীরা মনে করেন, এই একাত্মতাই শিল্পজ

আনন্দের কারণ। ভারতীয় আলঙ্কারিকের একেই বলেছিলেন 'সাধারণীকরণ'। এই 'সাধারণীকরণ' কী? 'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন, 'ব্যাপারোহস্তি বিভাবার্দেনাম্না সাধারণী কৃতিঃ', 'প্রমাতা তদভেদেন সাত্মানং প্রতিপদ্যতে' অর্থাৎ বিভব প্রভৃতি সাধারণীকৃতি—রূপ ব্যাপারের ফলে সহৃদয় বিভাবাদির সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বোধ করেন। এই 'সহৃদয়' কাব্যাদিগত 'বিভব' ইত্যাদি এমন এক ঐক্য লাভ করে, যার ফলে সহৃদয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে কিন্তু থাকে না। এই সাধারণীকৃতি নামক ব্যাপার থেকে আত্মাতে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অভেদজ্ঞান হয় এবং সেই অভেদজ্ঞান থেকেই সামাজিকের নায়কাদি বিষয়ে রত্যাদির উদয় হয়। এই সাধারণীস্কৃতির দ্বারাই যে বস্তু জগতে অনিত্য, কাব্যজগতে তাই হ'য়ে ওঠে নিত্য এবং শ্বাশ্বত। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যে 'সাধারণীকরণের' কথা বলেছেন, কান্ট তাকেই বলেছেন 'Subjective Universality'।

রস আনন্দদায়ক ; তাই দুঃখের কাব্য-নাটক থেকে আমরা দুঃখ নয়, আনন্দই লাভ করে থাকি। এ নিয়ে অ্যারিস্টটল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, 'ভীতি' ও 'করুণা'র মিশ্রণে ক্যাথারসিস ঘটে এবং ট্রাজিকপ্লেজার লাভ হয়। অনেকে মনে করেন, 'দুঃখ ও আনন্দের মধ্যে হেতুগত কোন পার্থক্য নেই।' শেলীর মতে, 'তীব্রতম দুঃখই মহত্তম আনন্দের কারণ'। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সাহিত্যিকের কাজ 'সত্য' কে নিয়ে এবং এই সত্য সাহিত্যে রূপায়িত হয় বলেই সাহিত্য আনন্দদায়ক। তিনি আরও বলেছেন, 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক'। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা রসের ব্যাখ্যায় যে ধরনের অনুভূতির কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'ট্রাজেডির আনন্দ' ব্যাখ্যা অনেকটা যেন সেই জাতীয় বলেই মনে হয়। সুতরাং সকলেই একথা মেনেছেন যে, সাহিত্য হ'ল আনন্দদায়ক এক রূপনির্মিতি।

১৭.৩ সারাংশ

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে রসের প্রসঙ্গ বহু প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভরত থেকে শুরু করে সকলেই রস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে ভরতের পর রসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অভিনব গুপ্ত। বিশ্বনাথ কবিরাজ একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, কাব্যপাঠের ফলে রজঃ এবং তমোগুণের বিলোপ হয়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। সেই অবস্থায় রস অনন্তমূর্তিতে পাঠকের মনে আনন্দরূপে অন্যস্থান রহিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সরাস্বাদ, তাঁর মতে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তুল্য। অনুরূপভাবে কাব্যরসের আস্বাদনজাত আনন্দ একমাত্র কাব্যপাঠকের কাছেই সত্য হয়ে ওঠে। কাব্যপাঠকই যেহেতু কাব্যের একমাত্র আস্বাদক ও বিচারক, সেজন্য রসাস্বাদনকে ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে পার্থক্য এইখানে যে, কাব্য, ব্রহ্মের মতো বাক্ ও মনের অগোচর নয়, কাব্য হল বাণী-শিল্প। শব্দকে আশ্রেয় করে তার বোঝ জন্মে। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা এইভাবে কাব্যপাঠজাত আনন্দকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারজাত আনন্দের সুঙ্গে তুলনা করে কাব্যানন্দকে অলৌকিক বলে চিহ্নিত করেছেন।

১৭.৪ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ও আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

১। ভরতের গ্রন্থটির নাম কী? রস সম্পর্কে তিনি ওই গ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

২। ভরতছাড়া আরো দুজন রসবাদীর নাম করুন।

৩। 'রস' সম্পর্কে যে চারটি মতবাদ পাওয়া যায় সেগুলি কী কী ? সেই মতবাদের প্রবক্তাদের নাম করুন।

৪। রসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কে দিয়েছেন ? তাঁর সেই মতবাদ কী নামে পরিচিত।

৫। অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদটি আলোচনা করুন।

৬। 'রস' আনন্দদায়ক কেন ?

৭। 'রস' ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা অলৌকিক বলেছেন কেন ?

৮। 'সাধারণীকরণ' ব্যাপারটি কী ?—বুঝিয়ে বলুন।

৯। 'রস' কে 'ব্রহ্মাস্বাদঃ সহোদর' কেন বলা হয়েছে—ব্যাখ্যা করুন।

১০। আলঙ্কারিকেরা বলেন রস হল, 'লোকোত্তরচমৎকার প্রাণ'—এ কথার অর্থ কী ?

১১। 'কাবার্থতত্ত্বজ্ঞ' কে ?

১২। 'রস' কী—এ সম্পর্কে একটা অনুচ্ছেদ লিখুন।

১৭.৫ প্রস্তাবনা ঃ ধ্বনিবাদ

সাধারণ ভাষা কাব্যভাষার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। সাধারণ ভাষা কোনোভাবে বুঝিয়ে বললেই চলে কিন্তু কাব্যভাষাকে সাদা-মাটা হলে চলে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় আভাস ও ইঙ্গিতের। কাব্য ভাষার এই অসামান্যতার কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের প্রতীকী তাৎপর্যে মুগ্ধ হয়ে একদল তরুণ কবি লন্ডনের সোহো জেলার অন্তর্গত একটি রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়ে imagist Group গঠন করেছিলেন। মহিলা কবি এমি লোয়েল, এজরা পাউন্ড, এলিয়ট প্রমুখ ছিলেন এই গ্রুপে। এঁরা ঠিক করেছিলেন, একটি মাত্র সার্থক প্রতীক সৃষ্টি করা একটি মহাকাব্য রচনার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কাব্য ভাষা সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের কবি সাহিত্যিকেরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছিলেন। কিন্তু এরও পূর্বে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের একটি ছক, যাঁরা ধ্বনিবাদী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা কাব্যভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব মন্তব্য করেছিলেন। এই এককটিতে কাব্যভাষা সম্পর্কে ধ্বনিবাদীদের সেই আলোচনাকে তুলে ধরা হল।

১৭.৬ ধ্বনিবাদ

কাব্যের রসস্বাদনে কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে ধ্বনিবাদের কথা আধুনিক কালে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দুটি করে অর্থ থাকে—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। বাচ্যার্থ হল বাচক শব্দের আভিধানিক অর্থ। বাচ্যার্থ ছাড়া কাব্যের ক্ষেত্রে প্রধান রূপে গণ্য হয় সেইটি হয় ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনি অথবা প্রতীয়মান অর্থ। কবি যখন বলেন—

'মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া—'তখন পদটির সৌন্দর্য শুধুমাত্র তার বাচ্যার্থ বা অভিধা অর্থের ওপর নির্ভর করে না।

চতুর্দিকে বর্ষণমুখর প্রকৃতির মধ্যে প্রিয় বিরহে কাতর এক নারীর যে হৃদয়ের বেদনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা দেখতে পাই শ্রেষ্ঠকাব্য তার বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে বিয়াম্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকরো এই বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'। ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনি হচ্ছে কাব্যের আত্মা। ধ্বনিবাদী আনন্দধ্বনি এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

তবে ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধনের পূর্বে ধ্বনি সম্পর্কে আরো তিনটি মত প্রচলিত ছিল—

১) ধ্বনি বলে কিছু নেই।

২) ধ্বনি মানে হল লক্ষণা।

৩) ধ্বনি হল অনিবার্চনীয়।

এই তিনটি বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করে আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ধ্বনির মাহাত্ম্য স্বীকারে যাঁরা সম্মত নন, তাঁরা মনে করেন অলংকার এবং গুণ থাকাই যেখানে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বলাভের উপায়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন থাকতে পারে না। দ্বিতীয় দল মনে করেন, কাব্যপাঠকালে অভিধাশক্তির দ্বারা যা বোঝায় সেই মুখ্যার্থের বাধা থাকলে মুখ্যার্থের সঙ্গে যুক্ত অপর অর্থ যে শক্তির দ্বারা বোঝা যায় সেই লক্ষণা শক্তি হল ধ্বনিরই নামান্তর। এই লক্ষণাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—প্রয়োজনমূলা ও বারিমূলা। প্রয়োজনমূলার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—অর্থাৎ ঘোষেরা গঙ্গায় থাকে। এখানে 'গঙ্গায়' বলতে গঙ্গার তীর বোঝায় কিন্তু 'গঙ্গায় বাস' বললে গঙ্গার শীতলতা এবং পবিত্রতার বোঝ জন্মে। এই 'শীতত্ব' ও 'পাবনত্বে'র বোধকেই আলঙ্কারিকেরা 'প্রয়োজন' আখ্যা দেওয়ায় উদাহরণটি 'প্রয়োজনমূলা লক্ষণা'র। কিন্তু যদি বলা হয় 'কলিঙ্গা সাহসিকঃ' তাহলে কলিঙ্গা বলতে কলিঙ্গাদেশ নয়, 'কলিঙ্গাদেশবাসী'কে বুঝতে হবে। এখানে যেহেতু আধেয় বোঝাতে আধার ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এক 'রাঢ়িমূলা' লক্ষণা বলে। 'ধ্বনিকে' যাঁরা লক্ষণা বলে মনে করেন, তাঁদের যুক্তি হ'ল, যেহেতু লক্ষণার মধ্যে মুখ্য অর্থ বাধিত হচ্ছে তাই 'ধ্বনি' লক্ষণা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ধ্বনিকার একথা মানতে সম্মত নন। কারণ লক্ষণায় গৌণার্থ প্রধান হলেও বাচ্যার্থের সঙ্গে তার যোগ আছে। তাই গৌণার্থটি অভিধা অর্থের সঙ্গে যুক্ত, তা বেশিদূর ছাড়িয়ে যায়নি। অন্যদিকে ধ্বনির কাজ হল বাচ্যার্থকে কেন্দ্র করে তাকে বহুদূর ছাড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং লক্ষণা ও 'ধ্বনি' এক নয়।

ধ্বনিবাদের তৃতীয় প্রতিপক্ষ হল অনিবর্চনীয়বাদী। এঁদের মতে, ধ্বনি কী তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তা সহৃদয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামাত্র। অতএব ধ্বনি অনির্বচনীয়। অভিনব গুপ্তচার্য এই তিন বিরূপ মতবাদীদের সম্পর্কে বলেছেন, প্রথমদল ধ্বনির স্বরূপ জানেন না। দ্বিতীয় দল সংশয়ী এবং তৃতীয় দল অজ্ঞতবশে ধ্বনির সংজ্ঞাদানে বিরত হলেও ধ্বনির অস্তিত্বে তারা বিশ্বাসী। —এই তিনটি বিরুদ্ধমতকে খণ্ডন করার পর আনন্দ বর্ধন ক্রমে ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন।

'ধন্যালোক'-এর প্রথম উদ্দ্যোতে ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই ধ্বনিকার বললেন, কাব্যের সেই অর্থ বা সহৃদয়ের কাছে প্রীতিপ্রদ তা দু'ভাগে বিভক্ত—বাচ্য এবং প্রতীয়মান অর্থ। বাচ্য অর্থ আভিধানিক, এবং দীর্ঘকাল ধরে শব্দার্থবাদী ও রীতিবাদীরা এই বাচ্যার্থের রমণীয়তা সৃষ্টির কথাই বলে গেছেন নানাভাবে। কিন্তু আনন্দবর্ধন যে ব্যঙ্গার্থের কথা বলেছেন তা অলংকার যোগ বা বিয়োগের দ্বারা বর্ধিত বা বিনষ্ট হয় না। এই ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান অর্থের সার্থক উপমা তাঁর মতে রমণীদেহের লাবণ্য—

'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বাস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।

যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।।'

এই লাবণ্যসদৃশ প্রতীয়মানার্থের জন্যই ক্রৌঞ্চিদ্বয়ের একের বিয়োগে অপরের বেদনা আদি কবির মনে উপজাত শোককে শ্লোকে পরিণত করেছিল। সুতরাং প্রতীয়মানার্থই 'ভাব' থেকে 'রস' সৃষ্টির উপায়। কিন্তু ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন সহৃদয়ের আস্বাদ্য যে অর্থের কথা বলেছিলেন তার প্রথমটি হল বাচ্যার্থ। সুতরাং তিনি যে বাচ্যার্থকে অস্বীকার করছেন না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি প্রতীয়মানার্থই সহৃদয়ের প্রীতি উৎপাদনে সক্ষমতার জন্য কাব্যের আত্মা বলে উল্লিখিত হয় তাহলে আর বাচ্যার্থের প্রয়োজন আছে কি ? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ধ্বনিকার একটি খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বললেন—আলোকার্থী যেমন দীপশিখার প্রতি যত্নবান হন সেই রকম ব্যঙ্গার্থের জন্য প্রয়োজন হয় বাচ্যার্থ বোধের। অর্থাৎ দীপশিখার কাজ দীপশিখাতেই সমাপ্ত নয়, কোন বস্তুকে উদ্ভাসিত করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। সুতরাং দীপশিখা এখানে 'ব্যঞ্জক' আর উদ্ভাসিতকে 'ব্যঙ্গ্য' বলতে হবে। অনুরূপভাবে যিনি কাব্যের অর্থ উপলব্ধি করতে চান তাকে প্রথমে বাচ্যার্থ বুঝতে হবে, তারপর ব্যঙ্গ্যার্থ—এই 'ব্যঙ্গ্যার্থই' হল তার অনুসঙ্গেয়। বাচ্যার্থ যে ব্যঙ্গ্যার্থ বোধের সঙ্গে অপরিহার্য সম্পর্কে বদ্ধ আনন্দবর্ধন সেকথা জানিয়ে সহৃদয়ের কাছে বাচ্যার্থ যে আগ্রহসৃষ্টিক্ষম সেকথা বুঝিয়ে দিলেন। সুতরাং এই ব্যঙ্গ্যার্থই আনন্দবর্ধনের মতে কাব্যার্থ। তিনি আরও বললেন, শব্দার্থের বোধ থাকলেই চলবে না কাব্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন কাব্যার্থের বোধ। এই ব্যঞ্জিত অর্থের মাহাত্ম্য পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকেরাও নানাভাবে কীর্তন করেছেন। এই ব্যঙ্গ্যার্থই হচ্ছে 'ধ্বনি'। যেহেতু এই ধ্বনি রসসৃষ্টিতে সক্ষম তাই আলংকারিকেরা একে বলেছেন 'রসধ্বনি'।

মহাকবি কালিদাস পার্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গে যখন বলেন—

'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী

লীলাকমলপত্রানি গণয়ামাস পার্বতী।।' তখন লীলাকমের পত্রগণনার দ্বারা পার্বতীর পূর্বরাগের লজ্জাকে অসামান্যকৌশলে ব্যঞ্জিত করেন। এখানে বাচ্যার্থকে ছড়িয়ে অর্থটি সুদূরে পৌঁছে দেয় পাঠককে। তাই এটি একটি উৎকৃষ্ট কাব্য হয়েছে! কিন্তু এই একই বিষয় নিয়ে কবি যখন লেখেন 'কৃত বরকথালাপে কুমার্যঃ পলকদগমৈঃ .....' তখন তা মহাকাব্যপদবীতে উন্নীত হতে পারে না। কারণ এখানে বাচ্যার্থই মুখ্য, ব্যঙ্গ্যার্থ নয়। তাই কালিদাসের উক্ত শ্লোকটিকে আমরা বলব ধ্বনি। এই ধ্বনিই পাঠকের অন্তরে রসের সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং কেবল ধ্বনি নয়, রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা।

বিশ শতকে এই ব্যঞ্জিত অর্থের মাহাত্ম্য পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা কীর্তন করেছেন নানাভাবে। ব্রাডলে বলেছিলেন, যে কোনো কবিতার চতুর্দিকে বিরাজ করে এক অসীম ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গার্থের জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে' আপাত অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও পাঠকের কাছে আস্বাদনীয় হয়েছে। সুতরাং ব্যঞ্জনা বা Suggested sense-এর ভূমিকা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের কবি-নব্য সমালোচকেরা সেই সত্যকে স্বীকার করেছেন।

আনন্দবর্ধন ব্যঙ্গার্থে বা প্রতীয়মান অর্থের ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি অলংকারকে প্রাধান্য

না দিলেও অলংকার ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে, ব্যঙ্গার্থ-বিশিষ্ট কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গা, বর্ণনা, অলংকার প্রভৃতির তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে তাকে কী কাব্য বলা যাবে? এই প্রসঙ্গে তিনি 'গুণীভূত ব্যঙ্গা, কাব্যের আলোচনা করলেন বৈন্যালোকরে তৃতীয় উদ্দ্যোতে। ধ্বনিকার বললেন, রমণীর লাবণ্যসদৃশ যে ব্যঙ্গা অর্থ প্রতিপাদন করা হয় তার প্রাধান্য ঘটলে তা ধ্বনিবাদবাচ্য হয়। কিন্তু ব্যঙ্গা অর্থ গৌণ হয়ে বাচ্যার্থ রমণীয় ও সুপ্রকট হয়ে উঠলে ব্যঙ্গা গুণীভূত হওয়া কাব্যটিকে গুণীভূত ব্যাঙ্গাকাব্য বলা হয়। সুতরাং তা কাব্য নয়, কাব্যের অনুকরণ মাত্র। এইভাবে তিনি ধ্বনিকাব্যকে শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে গণ্য করে বিপরীত দিকে আর দুই শ্রেণির কাব্যের কথা বললেন আনন্দবর্ধন গুণীভূতব্যাঙ্গাকাব্য ও চিত্রকাব্য। গুণীভূত ব্যঙ্গো বস্তুর বর্ণনা এবং অলংকারের দ্বারা ব্যঙ্গার্থ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আর চিত্রকাব্যে ব্যঙ্গার্থের কিছুমাত্র স্পর্ষ থাকে না। ব্যঙ্গ্যকাব্যই রসিকদের কাছে গ্রাহ্য।

১৭.৭ সারাংশ

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে 'ধ্বনির' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতীয় আলংকারিকদের একদল ধ্বনি সম্পর্কে অভিনব কিছু বক্তব্য রাখেন। এঁরাই ধ্বনিবাদী বলে পরিচিত। তাঁদের আলোচ্য তিনটি মতকে খণ্ডন করে পরবর্তীকালে আনন্দবর্ধন তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দেখিয়েছেন, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দুটি অর্থ থাকে বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ। বাচ্য অর্থ আভিধানিক এবং দীর্ঘকাল ধরে আলংকারিকের বাচ্যার্থের রমণীয়তা সৃষ্টির কথাই বলে আসছেন নানাভাবে। কিন্তু আনন্দবর্ধন মনে করেন, ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান বিশিষ্ট কাব্যই শ্রেষ্ঠকাব্য। বিজ্ঞান, দর্শন, জ্ঞানের কথা বলে, কিন্তু কাব্য বহন করে ভাবের কথা। তাই তাকে প্রমাণ করলে চলে না, এক হৃদয় থেকে অপর হৃদয়ে তাকে সঞ্চারিত করে দিতে হয়। আর এই সঞ্চার কার্যটির জন্যই কাব্যের ভাষাকে, ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার' তখন তিনি যে শুধুই নৈসর্গিক জোয়ার ভাটার কথা বলেন না এ সত্য সহৃদয় বাকি মাত্রই জানেন। এই ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রাণ। এ ব্যঞ্জনা না থাকলে 'কাব্য' কাব্যপদবীতে উন্নীত হতে পারে না। কবিরা সামান্য ক'টি কথার আঁচড়ে অসামান্য কিছু বক্তব্য পেশ করেন। এই সামান্য কথার ভিতরে যে নিহিতর্থাটি লুকিয়ে আছে সহৃদয় পাঠকের দায়িত্ব তাকেই উপলব্ধি করা। সুতরাং কাব্য এমন একটি বিশেষ art form যার সাহায্যে কবি নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে বলে যান এমন কিছু কথা যা হয়ে ওঠে অসামান্য ব্যঞ্জনা বা প্রতীয়মান অর্থ ছাড়া এই অসামান্যতা ফুটে ওঠা সম্ভব নয়। এই কারণেই আধুনিক সমালোচনা তত্ত্বে ধ্বনির গুরুত্ব অপরিসীম অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

১৭.৮ অনুশীলনী-২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

১। ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধনের গ্রন্থটির নাম কী? ধ্বনি সম্পর্কে তাঁর আলোচনার পরিচয় দিন।

২। আনন্দবর্ধনের পূর্বে ধ্বনি সম্পর্কে যে তিনটি মত ছিল সেগুলি কী কী? মতগুলি আলোচনা করুন।

৩। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের কয়টি অর্থ আছে? সেগুলি কী কী? সেই অর্থ দুটির ব্যাখ্যা করে কাব্যের ক্ষেত্রে কোনোটি গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।

৪। 'ধ্বনি' কী? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৫। কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে 'বাচ্যার্থ' এবং 'ব্যাঙ্গার্থ'—এই দুই এরই প্রয়োজন আছে কী? থাকলে কেন তা বুঝিয়ে বলুন।

৬। শ্রেষ্ঠ কাব্য বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে — একথার অর্থ কী?

৭। ধ্বনিকাব্য এবং গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকাব্য কি এক? যদি এক না হয় তাহলে কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন?

৮। 'ধ্বনি কাব্যের আত্মা'—ধ্বনিবাদীদের এই মত কতদূর গ্রহণযোগ্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৯। আধুনিক সমালোচনাতত্ত্বে ধ্বনির গুরুত্ব অপরিসীম কেন?

১৭.৯ প্রস্তাবনা ঃ বক্রোক্তিবাদ

রূপনির্ভর সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। যে সাহিত্য ভাষার মধ্যস্থতায় বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করেনি, তাকে কি সাহিত্য বলা যাবে? নীরব কবিত্বকে স্বীকার করবেন না কেউই। বস্তুত রূপ নির্ভর কাব্য-সাহিত্যের মাধ্যমই হল ভাষা, তথা শব্দ। তেমনি সংগীতের মাধ্যম সুর ও কথা, চিত্রের মাধ্যম রং ও তুলি। যদিও শব্দটাই সাহিত্য নয়, তাই বাক্ এবং অর্থের সম্পর্ক নির্ধারণে মহাকবিরা 'পার্বতী পরমেশ্বরৌ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং শুধু শব্দ বলাই যথেষ্ট নয়, অর্থানুকূল শব্দের ব্যবহারেই কবির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব। অর্থযুক্ত শব্দের দ্বারা যে সাহিত্য গড়ে উঠলো, ছন্দ, অলংকার তার মহিমা বাড়িয়ে দেয়। —এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ বক্রোক্তি হল কাব্যের প্রাণ স্বরূপ। সাহিত্য যেহেতু ভাবের কথা বহন করে, এবং অপরের হৃদয়ে সেই ভাবকে সঞ্চারিত করে, সেইহেতু সহজ কথাকে সহজভাবে না বলে আভাসে-ইঙ্গিতে বলতে হয়। এই বক্রোক্তি হচ্ছে কুন্তকের ভাষায় 'বৈদ্যগ্ধভঙ্গীভণিতিঃ'। সুতরাং যে কোনোরকম তীর্যক মন্তব্যই কবিতা নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য যেহেতু পাঠক হৃদয় সেইহেতু সাহিত্যের শব্দের চরম সিদ্ধি যেখানে, সেখানেই শব্দ পাঠকের হৃদয় জগৎকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

১৭.১০ বক্রোক্তিবাদ

কবির ভাষা যে উক্তি নয়, বক্রোক্তি কুন্তকাচার্য সে কথা তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিতম্ গ্রন্থে আলোচনা করেছিলেন। কুন্তকের পূর্বে বক্রোক্তি ছিল মুখ্য শব্দালংকার। কিন্তু তিনি সাধারণ অলংকারকে 'অভিধা-প্রকার-বিশেষ' রূপে চিহ্নিত করে বক্রোক্তিকে কবি ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল বিশেষ ধরনের উক্তি বলে সাধারণ অলংকার থেকে পৃথক করে দিলেন। বক্রোক্তি ছিল একটি বিশেষ শব্দালংকার মাত্র। যারা শব্দালংকার রূপে বক্রোক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন তারা বক্রোক্তির দুটি বিভাগের কথা বলেছিলেন—'কাকু এবং শ্লেষ'। প্রথমটি নির্ভর করে উচ্চার ভঙ্গির উপর এবং দ্বিতীয়টিতে বাহ্য অর্থ ছাড়াও থাকে অন্য আর একটি অর্থ। কিন্তু

ভামহ বক্রোক্তিকে গুণ এবং অলংকার থেকে পৃথক করে নিলেন। তিনি অন্যান্য অলংকার প্রসঙ্গে আলোচনার পর অতিশয়োক্তির ক্ষেত্রে বললেন 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ' তাঁর সিদ্ধান্ত হল মহাকাব্য-নাটক-কথা সর্বত্রই বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। অভিনব গুপ্ত বক্রোক্তি বলতে বুঝিয়েছেন 'লোকোত্তীর্ণেন রূপেশবস্থানম্'। কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিতম্'-এর তৃতীয় উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায় 'লোকাতিক্রান্ত গোচরা' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন 'প্রসিদ্ধা ব্যাপারাতীত' অর্থে। দণ্ডী স্বভাবোক্তি থেকে যাবতীয় অলংকারের পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন বক্রোক্তি কথাটির দ্বারা। দণ্ডীর মতে, বাঙ্ময় কাব্য স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি এই দু'ভাগে বিভক্ত। তিনি বক্রোক্তিকে লক্ষণার দ্বারা রচিত অর্থালংকার বলে চিহ্নিত করলেন। সুতরাং দণ্ডীর বক্রোক্তি প্রচলিত অর্থে বক্রোক্তি নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে ভামহ এবং দণ্ডীর কাছে বক্রোক্তির তাৎপর্য ছিল একরকম আর বামন এবং রুদ্রটের কাছে ছিল অন্যরকম।

'বক্রোক্তিজীবিত্ম-এর প্রথম উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায় কুন্তক বলেছিলেন—

"লোকোত্তরচমৎকারকারিবৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে।

কাব্যস্যয়মলঙ্কারঃ কোহপ্যপূর্বো বিধীয়তে।।"

প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'অসামান্যাহ্লাদবিধায়িবিচিত্রভাবসম্পত্তয়ে' অর্থাৎ কাব্যালংকার বলতে কুন্তক যা বুঝতেন সেই অলংকার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল অসামান্য আনন্দদান। পরবর্তী কারিকায় শেষ অংশে বললেন, সর্পবজ্ঞা কাব্যের লক্ষ্য হল অভিজাতদের হৃদয়ে আহ্লাদ বা আনন্দ সৃষ্টি। সুতরাং বক্রতা ব্যবহারের পিছনে রয়েছে সহৃদয়গণের আনন্দসৃষ্টির উদ্দেশ্য। নিতান্ত চারুত্ব সৃষ্টির জন্য নয়, পাঠকচিত্তের রস সৃষ্টির জন্যই কুন্তকাচার্য বক্রোক্তি ব্যবহারের কথা বলেছেন। সপ্তম কারিকার বৃত্তিতে বক্রোক্তি হল শাস্ত্রাদিকে শব্দার্থের যে মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেয়ে পৃথক। মহিমভট্ট বলেছিলেন বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ মার্গ পরিত্যাগ করে যে অন্যভাবে বলা হয় তাকেই বলে বক্রোক্তি। দশম কারিকায় কুন্তক বলেছেন, বক্রোক্তি হ'ল — 'বৈদগ্ধভঙ্গীভনিতিঃ'। অর্থাৎ বক্রোক্তি হল সেই কবি কৌলিন্যপ্রসিদ্ধ প্রস্থান বর্জন করে গড়ে ওঠা ভণিতি প্রকার। যদৃষ্টং তল্লিখিতং কাব্যকবিতা কুন্তকের মতে, সহৃদয়ের চিত্তে আনন্দ উৎপাদন করে না। অতঃপর যে বক্রোক্তির কারণ কবি ব্যাপার, কুন্তকাচার্য তাকে ছয়ভাগে ভাগ করলেন—

১। বর্ণবিন্যাস বক্রতা

২। পদপূর্বার্ধ বক্রতা

৩। বাক্য বক্রতা

৪। প্রত্যয়াশ্রয় বক্রতা

৫। প্রকরণ বক্রতা

৬। প্রবন্ধ বক্রতা

প্রথম শ্রেণির বক্রতা নির্ভর করে বর্ণের বিন্যাসের উপর। এই শ্রেণির বক্রতার দ্বারা অনুপ্রাস ও যমক অলংকার সৃষ্টি হয়। সমার্থক শব্দ, রূঢ় শব্দ, কল্পনা-নির্ভর সাদৃশ্যবোধক শব্দ, বিশেষণ, সংবৃত্তি, বৃত্তি (সমাসবদ্ধ,

তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ), ভাব, লিঙ্গ, ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয় পদপূর্বার্ধবক্রতা ; কাল, কারক, সংখ্যা, পুরুষ, বাচ্য এবং অব্যয় প্রভৃতির দ্বারা গড়া হয় প্রত্যয়াশ্রয় বা পদপরার্ধবক্রতা। বাক্যবক্রতার কোনো শ্রেণি নেই। রসবৎ, প্রেয়স প্রভৃতি যে সব অলংকার মুখ্যত রসসৃষ্টি করে তাদের দ্বারা বাক্যবক্রতা সৃষ্টি হয়। প্রকরণ বক্রতা এবং প্রবন্ধ বক্রতা আলোচনা করে কুন্তক জানিয়েছেন প্রবন্ধ বক্রতা রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে।

কুন্তকাচার্য দশম শতকের মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতকের মধ্যভাগের যে কোনো সময়ে আবির্ভূত হয়ে 'বক্রোক্তি জীবিতম্' রচনা করেছিলেন। তিনি বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলে দাবি করেন। অবশ্য তাঁর অনেক আগেই বামন কাব্যাত্মার সন্ধান করে জানিয়েছেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। সুতরাং শব্দ ও অর্থের দ্বারা গঠিত কাব্যদেহের স্বরূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে ভারতীয় আলংকারিকেরা একসময় কাব্যত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে ব্রতী হন। রীতি, ধ্বনি এবং রসকে আলংকারিকেরা বিভিন্ন সময়ে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাদের পথেই অগ্রসর হয়ে কুন্তকও একসময় বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

১৭.১১ সারাংশ

কাব্যের উদ্দেশ্য যদি হয় পাঠকচিত্তে আনন্দদান, তাহলে সেই কাব্যকে অলংকার, ধ্বনি প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দর করে তুলতে হয়। সাধারণ কথা যেহেতু সাহিত্য নয়, সেজন্যই কবিরা বিশেষ ভঙ্গিভনিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। বক্রোক্তি যদি কাব্যের প্রাণ নাও হয়, তথাপি কাব্য রসসৃষ্টিতে বক্রোক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তা বোঝা যায় যখন জীবনানন্দ দাশ চাঁদের রং বোঝাতে 'নীলকস্তুরী' ব্যবহার করেন। অথবা নায়িকার ব্যাথিত চোখের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন 'নীলাভ বেতের ফলের মতো' তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এই সমস্ত কথা অলংকৃত বাক্ বিন্যাস। সুতরাং কবির কথা যে সাধারণ কথা থেকে পৃথক 'বিশেষভঙ্গীভণিতি' বিশিষ্ট তাতো বলাই বাহুল্য।

১৭.১২ অনুশীলনী-৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

১। 'বক্রোক্তিজীবিতম্' কার রচনা ? তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?

২। বক্রোক্তিকে শব্দালংকার বলে মনে করেছিলেন কারা ? তাঁরা বক্রোক্তির কয়টি বিভাগের কথা বলেছিলেন এবং কী কী ?

৩। কুন্তক বক্রোক্তি বলতে কী বুঝতেন ?

৪। কুন্তক বক্তোক্তিকে কয় ভাগে ভাগ করলেন এবং কী কী ?

৫। 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' বলতে কী বোঝায় ?

৬। কুন্তকের কাছে বক্রোক্তি কেন কাব্যপ্রাণ—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৭। কাব্যের উদ্দেশ্য কী ? আলোচনা করুন।

১৭.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। কাব্যজিজ্ঞাসা - শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত

২। কাব্যালোক - শ্রী সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

৩। ভরতের নাট্যশাস্ত্র; অনু: গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

৪। আনন্দবর্ধনের ধন্যালোকঃ অনুবাদ

৫। সাহিত্যবিবেক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। সাহিত্যবিচার—ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৭। সাহিত্য পাঠের ভূমিকা - বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

একক ১৮ ❐ পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব

গঠন

১৮.১ প্রস্তাবনা

১৮.২ ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার পদ্ধতি

১৮.৩ নব্য ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার

১৮.৪ রোমান্টিক সমালোচনা

১৮.৫ বস্তুবাদী সমালোচনা

১৮.৬ অববয়বাদী সাহিত্যবিচার পদ্ধতি

১৮.৭ অনুশীলনী

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.১ প্রস্তাবনা

যে কাঠ জ্বলে নি তা যেমন আগুন নয়, যে মানুষ কোনো অনুভূতি প্রকাশ করেন নি তিনি কবি নন ; তেমনি যে পাঠকের হৃদয় সাহিত্যপাঠের ফলে বাঙ্ময় প্রকাশ রূপ লাভ করে নি তিনি সমালোচক ন'ন। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূত-সভার সভাধিপতির ('আমি') মুখ দিয়ে বলেছিলেন, কাব্য থেকে কেউ ইতিহাস সন্ধান করতে পারেন, কাব্য থেকে কেউ দর্শন উৎপাটন করতে পারেন, কাব্য থেকে কেউ হয়ত শুধুই কাব্য খুঁজে পেতে পারেন, যিনি যা পেলেন তাতেই তাঁর সন্তুষ্টি—বিবাদে ফল নেই, বিবাদের আবশ্যিকতাও নেই। স্রষ্টার মতো সমালোচক ও স্বয়ম্ভর—আপন জগতের অধীশ্বর আপনি-ই। এই বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের ভালো-মন্দ বিচার বোধের চেয়ে ভালো-লাগা মন্দ লাগার প্রকাশকেই দিয়েছিলেন সমধিক গুরুত্ব। ওয়াল্টার পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড ছিলেন এই মতাদর্শের প্রচারক। এই মতবাদীদের একটি বিশেষ প্রবণতা আসে কান্তিবাদের দিকে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের দিকে অতিরিক্ত আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় কান্তিবাদী তথা কলাকৈবল্যবাদীদের মধ্যে ; করণ তাঁরা শিল্পের সার্থকতা শিল্প ছাড়া অন্যত্র সন্ধান করেন না। সুতরাং এই শিল্পীর ও তাঁর সৃষ্টির প্রকৃত সমাঝদার তিনিই হতে পারেন যিনি নিজেও একজন দক্ষ কারিগর। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা কবিকে 'কারায়িত্রী' এবং সমালোচককে 'ভাবয়িত্রী' প্রতিভার অধিকারী মনে করতেন। অপূর্ব্বস্তু নির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা-র অধিকারী সাহিত্যকই শুধু প্রতিভাবান নন, যিনি সাহিত্যকে আস্বাদ করেছেন সেই সহৃদয় সামাজিকেরও প্রতিভা আছে, তবে তা সৃজনধর্মী নয়। পুনঃ পুনঃ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসে যে সাহিত্যরসিকের মধ্যে এসেছে তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, তিনিই শুধু 'সহৃদয়' পদবাচ্য এবং তার প্রতিভা হল 'ভাবয়িত্রী' গোত্রের। স্রষ্টার মানসিকতার কিছুটা সমালোচকের থাকা উচিত। এই প্রতিভা বলেই তিনি স্রষ্টার না বলা বাণীকেও উপলব্ধি করে নেন। সাহিত্য বিচারের পথ তৈরি করা বা সে পথ দিয়ে ওপরের যাওয়ার সময় দুপাশের সৌন্দর্য দর্শনের সুযোগ হতে থাকে, কিন্তু সৌন্দর্যে মগ্ন হওয়ার অধিকার থাকে না। নিছক আনন্দ-

সম্ভোগ সমালোচকের জন্য নয়। আপন আনন্দটা তাঁকে অপরের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সাহিত্যবিচারের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিকে সমর্থন জানায়। কারণ Analytical পদ্ধতিও একটি পদ্ধতি। রূপবাদী বা Formalist যাঁরা তাঁরা তো কাব্যাস্বাদ করেন শব্দ, ছন্দ, অলংকার সব কিছুকে টুকরো করে। শৈলী বিচারকদের মেনেছেন অনেকে। আবার অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, অবয়বগত বিচারই কি শেষ কথা? এই শেষকথাটি কেউই বলতে পারেন না। নতুবা রূপবাদীদের মতো মার্কসবাদীরাও যথেষ্ট নবীন এবং চিন্তার দিক থেকে বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে সন্ধান করার মতো ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েন দেখে এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও-সে-তুং চিন্তিত হয়ে কাব্য-সাহিত্যের নিজস্ব একটা দাবিকে স্বীকার করেন অকুণ্ঠ চিত্তে।

বস্তুত পাশ্চাত্যে এই সমালোচনার ধারা শুরু হয়েছিল ক্লাসিক্যাল রীতিকে সামনে রেখে। তারপর ক্রমে রোমান্টিক, ঐতিহাসক, মার্কসীয়, শৈলী—নানান পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। মোটকথা সমালোচকের প্রথম কাব্যগুণ হল, সাহিত্যকে সরাসরি স্পর্শ করা, সে যে পদ্ধতিকেই তিনি অবলম্বন করুন না কেন। সাহিত্যিকের সঙ্গে সমালোচকের সাক্ষাৎ মধ্যপথে। কারণ সাহিত্যিক যাত্রা করেন ভাব থেকে রূপে, আর সমালোচক যাত্রা করেন রূপ থেকে ভাবে। সাক্ষাৎ মুহূর্তে সাহিত্যিকের কাছ থেকে রূপ-রসের যে মশালটি এক কালের সমালোচক নিজের হাতে নিয়ে নিলেন সেই মশালটি তিনি পৌঁছিয়ে দিলেন আগামী যাত্রার পথিকের কাছে। রসতীর্থ পথে কাল থেকে কালান্তরে পাঠকের যাত্রা চলল এইভাবে।

রোমান্টিক সমালোচনা

'রোমান্স' শব্দটি প্রভাঁস (ইতালি-র) অঞ্চলের প্রেমের কবিতার সঙ্গে যুক্ত। ক্রবেয়ারগণ প্রভাঁসের ভাষায় যেসব কবিতা লিখতেন সে সবই ছিল রোমান্টিক প্রেমের কবিতা। উত্তরকালে শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নারীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের কবিতা এবং নানারকম চমৎকারিত্বমূলক কবিতা। আমরা পার্থেনন-এর মধ্যে যেমন খুঁজে পেয়েছি আদর্শ তেমনি রোমান্টিক আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় গোথিক ক্যাথিড্রাল-এ। কোনো অখণ্ড সীমারেখার দ্বারা তা তৈরি নয়, দ্বিতীয়তঃ সামগ্রিকতা এর ধর্ম নয়। তৃতীয়তঃ ভিতরের অংশটি আলো-ছায়ার মাঝারিতে রহস্যময়। প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে রোমান্টিক সাহিত্য শিল্পের পার্থক্য এইখানে যে, রোমান্টিক শিল্প-অতিপ্রাকৃত সত্য, সীমাহীন রহস্য এবং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অসীমতার দিকে উন্মুখ। রোমান্টিকদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণ-আততায়ীদের প্রতি উন্মুখতা বর্তমান থাকে। ক্রবেয়াররা যে রোমান্টিক প্রেমের কবিতা লিখতেন তা-ও ছিল অতীন্দ্রিয়, সীমাহীন প্রেমের কবিতা। ক্লাসিকাল রচনার বৈশিষ্ট্য যেমন নিয়মতন্ত্রের অধীন, রোমান্টিকদের বৈশিষ্ট্য তেমনি নিয়মের বন্ধনকে অস্বীকার করা। রোমান্টিকেরা সাধারণভাবে কোনো নিয়মের দাসত্ব করতে না চাইলেও কল্পনার স্বৈরাচারকে মেনে নেন সর্বত্র। তাইতো নব্য-ধ্রুপদী সমালোচকদের প্রকরণসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ওয়ার্ডস্বার্থ তাঁর লিরিক্যাল ব্যালাড্স্-এর মুখবন্ধে। যদিও ক্লাসিক, নব্য ক্লাসিক বা রোমান্টিক সব শিল্পীকেই মূলত কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয় তথাপি ক্লাসিকদের সঙ্গে রোমান্টিকদের পার্থক্য এইখানে যে প্রথম দল কল্পনাকে কাব্যের বাহ্যউপাদান রূপে গণ্য করতেন এবং যার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক নেই ও যা অপ্রাসঙ্গিক তাকে বর্জনীয় জ্ঞান করতেন। রোমান্টিকদের আর একটি বৈশিষ্ট্য

ইন্দ্রিয়বেদতা। প্রাচীন গ্রিক দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার গুরুত্ব ছিল। কিন্তু গ্রিকেরা তাকে ভাবাবেগের স্তরে উন্নীত করেননি। ক্লাসিসিষ্টদের কাছে সত্য ছিল বহিরঙ্গো এবং এই সত্য সর্বজনীন। অপরপক্ষে রোমান্টিকেরা মনে করতেন সত্য রয়েছে বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে।

রোমান্টিকেরা তাঁদের রচনার প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন এই সমস্ত উপাদান থেকে ঃ—

ক. মধ্যযুগীয় মানসিকতা তথা গোথিকের পুনর্জাগরণ ঃ অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিকদের কাছে গোথিক ছিল বর্বরতা। মধ্যযুগ হচ্ছে অন্ধকার। কিন্তু রোমান্টিকেরা গোথিকের মধ্যে খুঁজে পেলেন উচ্চাশা ও আনন্দের প্রতীক। রহস্য, আধ্যত্মিকতা ও উল্লাস ছিল রোমান্টিকদের কাছে মধ্যযুগের স্বরূপ। মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে কাব্যবাহিনীকে স্থাপন করেছিলেন রোমান্টিকেরা ; কোলরিজের ক্রিস্টাবেল, স্কটের আখ্যানকাব্য, কীটসের 'The Eve of St. Agnes', মধ্যযুগীয় বাতাবরণে রোমান্টিক রহস্য বা প্রেমের কাব্য।

খ. গোথিক রোমান্সের কাহিনী রোমান্টিকদের প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল।

গ. প্রাচীন ব্যালাডের নবাবিষ্কার দেখা দিল। কোলরিজ ও কীটস এর দুটি রচনা এই প্রসঙ্গো স্মরণ করা যায়—The Rime of the Ancient Mariner (coleridge), La Belle Dame Sans Merci (Keats)

ঘ. অতিপ্রাকৃতের পরিমণ্ডল রচনা 'ব্যালাড' কর্মের ব্যবহার।

ঙ. পরিচিতকে অতিক্রম করে নতুন ভূগোলের সন্ধান। অনিশ্চিতের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার কবিতা 'The Rime of the Ancient Mariver' ।

চ. নিসর্গ-নগর ও নাগরিক সংস্কৃতির কৃত্রিম পরিমণ্ডলে থেকে বন-নদী-পাহাড় পর্বতের অন্ধ আদিম জীবনে উপস্থিত হওয়া।

ছ. অলীক স্বপ্নের জগৎ - অপূর্ণ বর্তমান থেকে অজ্ঞাত - অপরিচিত পরিবেশ মানুষের পূর্ণতা সন্ধানের জন্য অলীকের দিকে যাত্রা। শেলীর - 'Prometheus Unbound'

জ. রাজনৈতিক মুক্তি সন্ধান-ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ারূপে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী কাব্যে রূপ নিতে থাকে।

প্রাচীন গ্রিক-নাটকে রীতিগত বাস্তবতা ছিল না, ছিল বিষয়বস্তুর বাস্তবত। মধ্যযুগীয় রোমান্সে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা ছিল না, ছিল রূপ-রীতির বাস্তবতা। কিন্তু আমরা বাস্তবতা-প্রধান রচনা বলে প্রাচীন বা মধ্যযুগের কোনো সৃষ্টিকে গ্রহণ করিনা। বাস্তবজগতের ওপর একদা রচনার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হোমর-শেক্সপীয়র-প্রমুখ, আবার উনিশ শতকে স্তাঁদাল-বালজাক-ফ্লোব্যার, পুশকিন-তলস্তয়-শেকভ, ডিকেন্স-হেনরি জেমস সেই বাস্তব জগতের উপাদান এবং সমস্যাই তাঁদের গল্প উপন্যাস-নাটকে ব্যবহার করেছেন। তবে সাহিত্যে 'বাস্তবতা' বলতে যদি আমরা বুঝি বস্তু জগৎ থেকে আহৃত উপাদানের যথাযথ ব্যবহার তাহলে সেই বাস্তবতা যেমন হোমারে ছিল না, তেমনি নেই হেনরি-জেমস্ এও। প্রাত্যক্ষিক সত্যের যথাযথ রূপায়ণকে সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে সম্মত নন কোনো শিল্পী বা অলংকারিকই। অথচ 'বাস্তব' বলতে আমরা বুঝি সেই সত্য যা চোখে দেখি বা ধরতে ছুঁতে পারি। কিন্তু সেই অর্থে সাহিত্য কোনোদিনই 'বাস্তব' নয়।

সাহিত্য হল ভাষা দিয়ে গঠিত ভাবের রূপ। ভাবের রূপ প্রকাশ পেতে পারে সুরে, রঙে-রেখায়। তাহলে প্রাপ্ত রূপকে নাম দেব গান বা ছবি এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য .... ইত্যাদি। সুতরাং 'সাহিত্য' নামক শিল্পকর্ম যে একটি বিশিষ্ট অভিধা-চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, তার কারণ তার বাণী। ভাববাদীরা এই বাণী বা উক্তির মধ্যে সন্ধান করেন অনির্বচনীয় মাধুরী। বচনকে অতিক্রম করে এই যে অনির্বচনীয়তার মাধুর্য সন্ধান তারই ফলে কাব্যবিচার একসময় পরিণত হয় Interpretation-এ। লেখক যা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি পাঠককে দিয়ে বলিয়ে নিতে চান—এই হচ্ছে এই ধরনের ব্যাখ্যাতাদের মৌলিক প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের বিচার হল সাহিত্যের ব্যাখ্যা ; সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ সমালোচককে লেখা ও লেখকের মধ্যবর্তী দূত মাত্র ভাবতেন, যার একমাত্র কাঝ পাঠককে বুঝতে সাহায্য করা। তিনি বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বাণী মাধ্যম শিল্প যে সাহিত্য তাকে কি করে ধরা যাবে প্রথমেই। যদি না বাণী বিন্যাসের তাৎপর্য ধরা যায় ? যে কৌশলে কোনো কবি-লেখক বাণী বা শব্দসমূহ সজ্জিত করেন সেই কৌশল বা তাঁর আপনার ব্যাপার ; সুতরাং সাহিত্য হল ভাষা দিয়ে গঠিত ভাবের রূপ। ভাবের রূপ প্রকাশ পেতে পারে, সুরে, রঙে-রেখায়। তাহলে প্রাপ্ত রূপ-কে নামদের গান বা ছবি এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ..... ইত্যাদি। সুতরাং 'সাহিত্য' নামক শিল্পকর্ম যে একটি বিশিষ্ট অভিধা-চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, তার কারণ তার বাণী। ভাববাদীরা এই বাণী বা উক্তির মধ্যে সন্ধান করেন অনির্বচনীয় মাধুরী। বচনকে অতিক্রম করে এই যে অনির্বচনীয়তার মাধুর্য সন্ধান তারই ফলে কাব্যবিচার একসময় পরিণত হয়। লেখক যা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি পাঠককে দিয়ে বলিয়ে নিতে চান-এই হচ্ছে ধরনের ব্যাখ্যাতাদের মৌলিক প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের বিচার হল সাহিত্যের ব্যাখ্যা ; সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ সমালোচককে লেখা ও লেখকের মধ্যবর্তী দূত মাত্র ভাবতেন, যার একমাত্র কাজ পাঠককে বুঝতে সাহায্য করা। তিনি বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বাণী মাধ্যম শিল্প যে সাহিত্য তাকে কি করে ধরা যাবে প্রথমেই। যদি না বাণী বিন্যাসের তাৎপর্য ধরা যায় ? যে কৌশলে কোনো কবি-লেখক বাণী বা শব্দসমূহ সজ্জিত করেন সেই কৌশল বা তাঁর আপনার ব্যাপার ; সেখানে তাঁর ষ্টাইল' ধরা পড়ে, আর বিশেষে ষ্টাইলে তিনি 'কর্ম' দাঁড় করলেন সেখানে ধরা পড়ে তাঁর গঠন পরিপাট্য অবয়ব-বিন্যাসের কৌশল। সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য বিচারকেরা এ ঘেকে থাকেন নি, তুষ্ট থাকেন নি সাধারণ বা মার্কসীয় পন্থায় সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানের মধ্যে। তাঁর সাহিত্যের বিচারে এনে ফেলতে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও নৈব্যক্তিকতা। নিঃসন্দেহে কঠিনকাজ। যে পদ্ধতিতে একটা ব্যাঙ বা গিনিপিগ-কে টুক্‌রো করে ল্যাবরেটরি-তে বিশ্লেষণ করা যায়, সাহিত্যে সেই পদ্ধতি ব্যবহার আদৌ সম্ভব বা সংগত ? কিন্তু এই চেষ্টাই করলেন পাশ্চাত্ত্যের Explication মতবাদীরা, শৈলী বিজ্ঞানীরা (slylistics তত্ত্ব) এবং অবয়ববাদীরা (structuralist রা)।

১৮.২ ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার পদ্ধতি

সাহিত্যবিচারের শ্রেষ্ঠ উপায় কী ? সাহিত্যবিচারের শেষ কথা কে বলবেন ? নিঃসন্দেহে দুটি প্রশ্নের উত্তরেই নীরব থাকতে হয়। সাহিত্যবিচারের যেমন কোনো রাজপথ নেই, তেমনি শেষ কথাও কিছু নেই। এক্ষেত্রেও 'যত

মত তত পথ'। তবে যিনি যে পথেই অগ্রসর হোন, যে কোনো মতাদর্শকেই শেষপর্যন্ত ফিরে আসতে হবে এক জায়গায়। এ ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্বত্রই একই সত্য চোখে পড়ে। তাই ভারতের পর ভামহ, দণ্ডী, বামন, রুদ্রট, অ্যারিস্টটল, হোরেস, লঙ্গাহিনাস, সিডনি, বার্ক, লেসিং, কান্ট, হেগেল, মার্কস থেকে আরও অনেকে এসেছেন ও আসছেন। তবে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ধারা থেমে গিয়েছ কয়েক শতাব্দী আগে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য বিচারের ধারা আজও নানা চেহারায় অব্যাহত। আমরা বাংলায় যে-সব সাহিত্যবিচার পদ্ধতি ব্যবহার করি তা পাশ্চাত্ত্য মতাদর্শের কাছ থেকেই সংগৃহীত। একালে জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় উত্তরাধিকারের অবিনাশী অহংকারে লাভ নেই। ঐতিহ্যসূত্রে কিছু কিছু শব্দ এবং ধারণা (concept) একালেও হয়তো আমরা বহন করে চলেছি ; কিন্তু অবশ্যই পুরোনো শব্দের আভিধানিক অর্থতাৎপর্য একালে আর চলে না। আমাদের প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রের রীতিকে পাশ্চাত্ত্যের পরিভাষায় বলা যায়। কিন্তু ওদেশের মতো আমাদের সাহিত্যে Neoclassical আন্দোলন আসেনি। Romantic আন্দোলন যা এসেছে তা উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। পাশ্চাত্যের প্রভাবই সেক্ষেত্রে মুখ্য।

Classical শব্দটি বিশেষণ। মোটামুটি তিনটি অর্থে এই শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে ঃ

১। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ভাষা, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতির যা কিছু প্রাচীন তাই ক্লাসিকাল।

২। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নাটক, মহাকাব্য - প্রভৃতি যা কিছু গ্রিক ও রোমান শিল্পের অনুকরণে সৃষ্ট হয় তাকেই বলা হয় ক্লাসিকাল অথবা নব্য-ক্লাসিকাল।

৩। যে শিল্পকর্ম গ্রিক ভাবাদর্শ বা মেজাজ (Spirit) অনুকরণ করেছে তাই ক্লাসিক। বিশেষ 'classic' এবং বিশেষণ 'classical' আরও বিভিন্ন অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ সেরা রচনা বলতে বুঝি ক্লাসিক। এ অর্থে হোমারের মহাকাব্য, শেক্সপীয়রের নাটক, রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো ভালো রচনা, সবই ক্লাসিক। যখন এই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন লাতিন 'classicus' কথাটাই মনে থাকে, যার অর্থ 'highest Mark' বা উচ্চ মানের। এই অর্থে ভালোজাতের রোমান্টিক রচনাকেও ক্লাসিক বলা যেতে পারে। যেমন ঃ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক, 'গোরা' উপন্যাস, 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ক্লাসিক বলে গণ্য হতে পারে। ক্লাসিকাল মিউজিক (ধ্রুপদী সংগীত) কথাটায় যে ক্লাসিক শব্দটা পাচ্ছি তা দু'রকমের অর্থ মনে আসে। এক অর্থে বুঝি, ধ্রুপদী সংগীত হল সেই সংগীত যার সঙ্গে রোমান্টিক মেজাজের গানের পার্থক্য আছে। অন্য অর্থে বুঝি, ক্লাসিকাল মিউজিক হল 'high class' মিউজিক।

যাই হোক, আমাদের প্রথমেই স্মরণে রাখতে হবে যে রেনেশাঁসের সময় থেকে শব্দটির জন্ম। শব্দটির জন্ম দুটি লাতিন শব্দের মিশ্রণ থেকে। একটি হল ক্লাসিকাস যার অর্থ উচ্চশ্রেণি এবং অপরটি ক্লাসিস, যার অর্থ হল 'at school' বা স্কুলের শ্রেণিতে। আসলে মনে করা হত যে গ্রিক এবং লাতিনেই প্রথম শ্রেণির সাহিত্যরচনা করা হয়ে থাকে এবং সেই সব সাহিত্য স্কুলের শ্রেণিকক্ষে পড়ানো হয়। আমাদের কিন্তু মেজাজের দিক থেকে ক্লাসিক বা ক্লাসিকাল কথাটা বুঝে নিতে হবে।

ক্লাসিক আদর্শ ঃ প্রাচীন এথেন্স - এর আনন্দনীয় স্থাপত্যকীর্তি 'পার্থেনন'। এই মন্দিরটি ছিল এথেন্স এর সমতল থেকে ২৬০ ফিট উঁচুতে তৈরি এক বিরাট পাথরের উপর স্থাপত্যকর্ম। এই মন্দিরের প্রতিটি অংশ

পরবর্তী অংশের সঙ্গে ছিল সুসমঞ্জস্য। প্রাচীন গ্রিকদের এই স্থাপত্যকর্মে এমন দুটি সত্য ধরা পড়ে যার নিরিখে শিল্প সাহিত্যকেও বিচার করা যেতে পারে, সত্য দুটি হল ঃ ১) একটি অখণ্ড সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ হবে সমগ্র অংশ। ২) অংশ ও সমগ্রের মধ্যে থাকবে যথার্থ অনুপাত। ক্লাসিক সৃষ্টির প্রতীক রূপে আমরা একটা Circle বা বৃত্তের কথা ভাবতে পারি। বৃত্তের কোনো অংশকেই ইচ্ছেমতো কমানো বা বাড়ানো যায় না তার পূর্বের সংগতি বজায় রেখে। গ্রিকদের শিল্পকর্মের এই যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল তা তাদের জীবনে সত্য ছিল না। বোধহয় জীবনে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উল্লাস ভোগ করে তারা বুঝেছিল এর নিরর্থকতা। তাই তাদের শিল্পকর্মে একটা সীমাশাসন থাকতই। পার্থেনন বা যে কোনো ক্লাসিকাল শিল্প আসলে এমন সৃষ্টিকর্ম যার মধ্যে আছে পরিমিতিবোধ, ঐক্য এবং সামগ্রিকতার মূর্ত প্রতীক। ঐহিকতা, মানবিকতা, বাহ্যরূপসৌন্দর্যে দৃষ্টির নিবদ্ধতা, প্রশান্তি ও ঐতিহ্যানুবর্তিতাই হচ্ছে ক্লাসিকাল শিল্পের লক্ষণ এবং ক্লাসিকাল বিচারপদ্ধতিও এসবের সঙ্গে যুক্ত। যার উজ্জ্বল নমুনা অ্যারিস্টটলের 'পোয়াটিকেস' এবং হোরেসের 'আর্স পোয়াতিকায়' (Ars Poetica)।

অ্যারিস্টটলে গুরু প্লেটো কাব্য-সাহিত্যের আনন্দদায়কতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে এক শ্রেণির কবি-সাহিত্যিককেই তাঁর আদর্শরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। প্লেটো মনে করতেন, মহৎ কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আসে আদর্শ লোক থেকে। এই আদর্শজগতের প্রতিবিম্বিন ঘটে বাস্তবে এবং বাস্তবের সত্যই প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যে। যেহেতু, সাহিত্যিক আদর্শজগতের পরবর্তী স্তরকে প্রতিবিম্বিত করেন। তাই সাহিত্যে প্রকৃত সত্য কখনও রূপ পায় না। প্লেটো তার এই ধারণা থেকেই কবিদের মিথ্যার সেবকরূপে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। একটি আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার উপযোগী হয়ে উঠুক সাহিত্য-শিল্প-এই ছিল প্লেটোর কামনা। আদর্শায়ন ছিল প্লেটোর কাব্য সাহিত্য সম্পর্কিত ক্লাসিকাল, ধারণার বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, বা সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণাতেও প্লেটো আদর্শের অনুরাগী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিশেষ অপেক্ষা নির্বিশেষের উপাসক। ক্লাসিকাল সাহিত্যাদর্শও নির্বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি যে অ্যারিস্টটল গুরু প্লেটোর মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন এবং সাহিত্যকে আনন্দদায়ক বলে গ্রহণ করেছিলেন তিনিও ট্রাজেডি তথা সাহিত্যের উপাদান রূপে তাকেই স্বীকার করেছিলেন যার মধ্যে সম্ভাব্যের ইঙ্গিত আছে 'Not what has happened, but what may happen according to the law of probablity.' এই সম্ভাব্যতা হল কার্যকারণের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে যা ঘটেছে তা সঙ্গে অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে তার একটি অনিবার্য সম্পর্ক থাকে। পোয়েটিকস-এ অ্যারিস্টটল এই সম্ভাব্যতার উপরে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই ইতিহাসের তুলনায় সাহিত্যকে 'more philosophical and higher than History' বলেছিলেন। সাহিত্য বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষে সার্বভৌমকে মিথ্যার কারবারি ভাবতেন, শিষ্য অ্যারিস্টটল সেখানে সাহিত্যিককে মনে করতেন সূক্ষ্মতর ও মহত্তর সত্যের রূপকার। সাহিত্যের নির্বিশেষ লক্ষ্য যেমন অ্যারিস্টটলের বিচার্য ছিল, তেমনি সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা-ট্রাজেডি ছিল তাঁর বিশেষ আলোচ্যবস্তু। ট্রাজেডিকে তিনি প্রথমে সম্পর্কিত করেন যাবতীয় শিল্পের সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে। তিনি যাবতীয় শিল্পে যে-নির্বিশেষ লক্ষণটি দেখেছিলেন তা হল 'মাইমেসিস' বা অনুকরণ। এই অনুকরণ শব্দটিকে কেন্দ্রে রেখেই তিনি ছিলেন ট্রাজেডির সংজ্ঞা। ট্রাজেডি নামক বিশেষ শিল্পধর্মকে বিভক্ত

করলেন ছ'টি উপাদানে। -কাহিনীবৃত্ত, চরিত্র, মনন, ভাষা, সংগীত ও দৃশ্যসজ্জা। এই ছ'টিই হল বহিরঙ্গ উপাদান। ক্লাসিকাল সাহিত্যসমালোচনার একটি মৌলিক লক্ষণ-ই হল বহিরঙ্গের রূপবিচার।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির কাহিনীবৃত্ত আলোচনায় জোর দিলেন Unity বা ঐক্যের উপর। পার্থেননের শিল্পকর্মের সঙ্গে অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ট্রাজেডির সংজ্ঞার মিল এখানে যে, উভয়ক্ষেত্রে অংশ এর সঙ্গে সমগ্রের একটি নিবিড় ঐক্যের সন্ধান মেলে। অংশ সমগ্রেরই অঙ্গীভূত, সুতরাং অবিচ্ছেদ্য। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, ট্রাজেডির কাহিনীর শুরু - মধ্যভাগ সমাপ্তি কার্য-কারণের যোগসূত্র পরস্পরের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কে যুক্ত। অ্যারিস্টটল কার্য-কারণের ঐক্যের ব্যাপারটির উপরই জোর দিয়েছিলেন বেশি। তা ছাড়া বলেছিলেন যে, কাহিনীর বিস্তার হবে সূর্যের একতার আবর্ত্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কোরাসের সর্বক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অভিনীত হতে হবে কাহিনীকে। একটি ক্লাসিকাল ভাস্কর্য বা স্থাপত্যে যেমন প্রতিটি অংশের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়, ক্লাসিকাল সাহিত্যকর্মেরও তাই। সাহিত্যবিচারের সময় সমালোচককে দৃষ্টি রাখতে হয় এই সামগ্রিকতার দিকে। অ্যারিস্টটল যে প্লটকে ট্রাজেডির 'আত্মা' বলে অভিহিত করেছিলেন, তার অন্যতম কারণ। সম্ভবত কাহিনীর ভিতরকার totality বা Unity র বোধ। সার্থক প্লট থেকে ঘটনার কোনো অংশকে বর্ণনা করা যায় না অথবা প্লটের সঙ্গে যোগ করা যায় না নতুন কোনো ঘটনা।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডি তথা শিল্প-সাহিত্যের জগতে ইহজগতের আদর্শায়িত রূপায়ণ-লক্ষ করেছিলেন। শুধু প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে নয়, চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রেও একই সূত্র তিনি কামনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ট্রাজেডির চরিত্রকে হতে হবে বাস্তবানুগ, যথাযথ, সদৃশ ও সুসংগত। ট্রাজেডির নায়কের পতনের কারণ তাঁর চরিত্রের কোনো প্রবণতার সীমাতিক্রমণ। নায়ক চরিত্র বাস্তবের রক্তমাংশের মানুষের মতোই হবে না। অতি ভালো, না অতি মন্দ। প্রাচীন গ্রিক নাটকের Dues ex machina অ্যারিস্টটল উপেক্ষা করেন নি, কারণ সেকালে জটিল পরিস্থিতি থেকে পরিণতিকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েই মঞ্চে আবির্ভূত হতেন অলৌকিক চরিত্র। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ট্রাজেডি হবে 'imitation of men in action' ট্রাজেডি মানুষের অনুকরণ—মানুষের কর্মের অনুকরণ। প্রাচীন গ্রিক ক্লাসিকাল সাহিত্য তাত্ত্বিক অ্যারিষ্টটল যেমন আদর্শায়িত জীবনের রূপায়ণের কথা বলেছিলেন, তেমনি বাস্তব সম্পর্কশূন্য নিছক কাল্পনিক জীবনসত্যের কথাও ভাবতে পারেন নি। চরিত্র এবং প্লট—ট্রাজেডির এই দুই মুখ্য উপাদানকেই অ্যারিস্টটল বেঁধেছিলেন পূর্বাপর সংগতির জোরে। ক্লাসিকাল সাহিত্য বিচার যে মূলত ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত—অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স এই ধারণাতেই পৌঁছে দেয়।

অ্যারিস্টটল সাহিত্যের ভাষার মধ্যে অলংকারের ব্যবহার পছন্দ করতেন। কিন্তু 'মেটাকোর' বা রূপক অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা কালে বলেছিলেন যে, অতিরিক্ত অলংকারের ব্যবহার বর্জনীয় কারণ তা দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করতে পারে। ..... সাহিত্যের সমালোচনার সম্পর্কে আলোচনা কালে অ্যারিস্টটল বললেন যে, তাঁর পূর্বকাল পর্যন্ত সমালোচকেরা কোনো সাহিত্যকর্মের মধ্যে খুঁজে পেতেন বিশেষ কতকগুলি ত্রুটি, যেমন ঃ অস্বাভাবিকতা, নির্বুদ্ধিতা, অনৈতিকতা, ভ্রান্তি ও পরস্পর বিরোধিতা। তিনি শিল্পকে চেয়েছিলেন শিল্পরূপেই বিচার করতে। অ্যারিস্টটল নিঃসন্দেহে সমালোচনার জগতে ক্লাসিকাল পদ্ধতির প্রবর্তক যিনি অখণ্ড

সীমারেখার দ্বারা সমগ্রকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং অংশ ও সমগ্রের আনুপাতিক সম্পর্কে ছিলেন আস্থাশীল।

ইতালির হোরেস (খ্রিঃ পূর্ব ৬৫ অব্দ থেকে খ্রিঃ পূর্ব ৮) ও ছিলেন সাহিত্যবিচারে ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তিনি অ্যারিস্টটলের পন্থায় 'মহিযেসিস' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নি ঠিকই, কিন্তু বলেছিলেন একজন অভিজ্ঞ কবির উচিত মানবজীবন ও মানবচরিত্রকে আদর্শরূপে দেখা এবং সেখান থেকে এমন ভাষার সন্ধান করা যাবে জীবনসত্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু হোরেস কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দুটি পৃথক মতাদর্শকে একীভূত করে উত্তরকালে রেনেসাঁসের সাহিত্য সমালোচকদের আদর্শ রূপে গণ্য হোন। তিনি বলেন, 'কবি লক্ষ্য রাখেন উপকার বা আনন্দদানের দিকে অথবা আনন্দের মিশিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি পেয়েছেন সকলের সমর্থন, কারণ তিনি পাঠককে দিয়েছেন আনন্দ, যখন তিনি নির্দেশ দিচ্ছিলেন'। হোরেসের মনের মধ্যে গ্রিক আদর্শ ছিল বদ্ধমূল, তাই তিনি বলেছিলেন, 'you must give your days and nights to the study of Greek models' এই গ্রিক মডেল নিজেও অনুসরণ করেছিলেন বলে হোরেস 'Organic Unity' র প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং উপযুক্ত ভাষা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনকে দিয়েছিলেন অগ্রাধিকার। অ্যারিস্টটল বহুক্ষেত্রে তুলনা করেছিলেন চিত্রের সঙ্গে। হোরেসও বলেছেন, 'A poem, is like a painting' । হোরেস কল্পনাশক্তির সামর্থের ওপর জোর দেন নি কিন্তু বিষয়নির্বাচন ছাড়াও জোর দিয়েছিলেন ভাবনার উপর এবং তিনি মনে করতেন যে মানুষ যথাযথ বিষয় নির্বাচন করতে পেরেছে তার কখনও ভাষা বা শব্দের অভাব হয় না। ভাষার সুনিপুণ বিন্যাসের জন্যই পুরোনো পরিচিত শব্দে লাগে নতুনত্বের ছোঁয়া। অ্যারিস্টটল পরিচিত ভাষার মধ্যে অপরিচয়ের ছোঁয়া আনার জন্যই 'মেটাফোর' ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কবি-সমালোচক হোরেস উপমার আশ্রয় নিয়ে বললেন। যেমন করে গাছ বৎসরান্তে পাতা ঝরিয়ে ফেলে, জন্ম দেয় নতুন পাতার, তেমনি কালে কালে পুরোনো শব্দ শেষ হয়ে যায় আসে নতুন শব্দ। একথাই যেন ভারতীয় আলংকারিকেরাও বলেছিলেন। আলংকারিক আনন্দবর্ধন বলেছিলেন, গাছের পুরোনো পাতা খসে নতুন পাতা একে যেমন গাছটাকেই নতুন বলে মনে হয়, তেমনি কাব্যের ক্ষেত্রেও পুরোনো শব্দ চলে গিয়ে নতুন শব্দ একে কাব্যকেও নতুন মনে হয়। সাহিত্যলোচনায় ভারতীয় আলংকারিকেরাও ছিলেন ক্লাসিকাল আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁরা শব্দ, অর্থ, অলংকার, রীতি প্রভৃতি বাহ্য উপাদানে যেমন মনোযোগী চিলেন, তেমনি ছিলেন শব্দ-নির্ভর ধ্বনি বা ব্যঞ্জনায় এবং বিভাবাদি উপাদান নির্ভর রসের উপর। খণ্ড থেকে অখণ্ডে, খণ্ডের বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যে ছিলেন বিশ্বাসী। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচারে 'সামঞ্জস্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-প্রসঙ্গ। প্লেটো ইহজগতের প্রকৃত সুন্দরের সঙ্গে অলৌকিক আদর্শজগতের সামঞ্জস্য সন্ধান করেছিলেন। অ্যারিস্টটল সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় সন্ধান করেছিলেন order (শৃঙ্খলা), symmetry (সামঞ্জস্য), এবং Definiteness (স্পষ্টতা)। শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য-স্পষ্টতার সমন্বয়েই তো প্রাচীন পার্থেনন। প্রাচীন গ্রিকেরা খুঁজেছিলেন সীমার মধ্যে Perfection এবং তাঁদের কল্পনার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকত যুক্তির। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার এই কথাগুলিই মুখ্য।

১৮.৩ নব্য ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার

নব্য ক্লাসিক (Neo-classic)—ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচারের মূলসূত্রগুলি উত্তরকালে ব্যবহৃত হয়ে গড়ে

তুলেছিল নব্য ক্লাসিক সাহিত্যাদর্শ। ইংরেজি সাহিত্যে, বেন জনসন, ড্রাইডেন, পোপ, এডিসন, স্যামুয়েল জনসন প্রমুখ নিও-ক্লাসিক রূপে পরিচিত। এঁদের কিছু বৈশিষ্ট্য হল ঃ

১. Traditionalism বা ঐতিহ্যবাদে বিশ্বাস, নতুন কিছু আবিষ্কার অনাস্থা এবং ক্লাসিকাল (বিশেষত রোমান) লেখকদের আদর্শকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরা।

২. 'সাহিত্য' শিল্পকলার একটি অংশ। যদিও সৃষ্টির জন্য অন্তর্গত একান্ত প্রয়োজন। তথাপি দীর্ঘ পঠন-পাঠন ও অভ্যাসের উপর যেমন এর নির্ভরতা তেমনি পূর্ব দৃষ্ট সাফল্যের নিরিখেই সাহিত্যবিচার্য। কারিগরি দক্ষতা, শুধি, বিস্তরের দিকে মনোযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে নব্য-ক্লাসিকের আদর্শ ছিলেন হোরেস। তবে তাঁরা প্রতিভার স্বাভাবিক দান এবং শৈল্পিক সামর্থ্যক আবিষ্কার করেননি। নব্যক্লাসিকেরা মনে করতেন যে, মহাকালের বিচারে যে সব সাহিত্যস্রষ্টার রচনা স্বীকৃতি লাভ করেছে বা উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের রচনা রীতির নিয়মাবলি (যদি কিছু থাকে) তবে তা অনুকরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অ্যারিস্টটলের ট্রাজেডি তত্ত্বের যাঁরা ত্রয়ী-ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরাও এই নব্য ক্লাসিক মতাদর্শের প্রচারক।

৩. সামাজিক সংগঠনের মধ্যে একমাত্র মানুষই, নব্য-ক্লাসিকদের কাছে কাব্যিক বিষয়ের প্রাথমিক উপাদান। এঁদের মতে, সাহিত্যে অনুকরণের বিষয়বস্তু হল মানুষ। নিও-ক্লাসিক মানবিকতার আদর্শ অনুযায়ী, শিল্পের সার্থকতা শিল্পে নয়, মানুষে অনুসন্ধেয়।

৪. বিষয়বস্তুকে এবং শিল্পের আবেদন সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষের সাধারণ-ধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'যথার্থ বুদ্ধি মানুষের চিন্তায় এসেছে, কখনও প্রকাশিত হয়নি' বলেছেন পোপ। কাব্য-সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল, মানুষের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিকে নতুন এবং যথাযথ রূপে প্রকাশিত করা। মানুষের সাধারণ বোধ ও বুদ্ধিকে নতুন এবং নিখুঁতভবে প্রকাশ করার মধ্যেই তাদের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব প্রমাণ হবে। উদাহরণ স্বরূপ এঁরা বলেছেন যে, শেক্সপীয়রের নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাসের প্রাচীন কাহিনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে, অথচ শেক্সপীয়রের তাঁর নাটকে প্রাচীন বিষয়বস্তুকে এমন রূপ দান করেছেন যার ফলে তা কালোত্তীর্ণ মহিমা অর্জন করেছে।

৫. নিও-ক্লাসিক দর্শনে ও সাহিত্যে, মানুষের অহমিকা, নৈসর্গিক ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার বাসনা প্রভৃতির সমালোচনা করে মধ্যপন্থায় মানবিক ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দিকে আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের শিল্প-সাহিত্য কর্মকে একটি সীমার মধ্যে শাসন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। নিও-ক্লাসিক যুগের কবিরা মহাকাব্য এবং ট্রাজেডির প্রশংসা করেছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁরা নিজেরা লিখেছেন প্রবন্ধ, 'কমেডি অব ম্যানার্স এবং বিশেষত Satire বা শেষ। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা বিষয়, রূপ ও ভাষার কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।

নিসর্গ প্রকৃতি বা আদর্শকে অনুকরণ করাই নব/-ক্লাসিকদের মূল কথা। জনসন বলেছেন, কোনো সেরা কবির শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অনুকরণ করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৌমাছি যেমন ভাবে মধুসংগ্রহ করে মৌচাক গঠন করে, পূর্বাদশ থেকে সাহিত্যের উপাদান সেইভাবেই সংগ্রহ করবেন উত্তরকালের লেখকরা। নিও-ক্লাসিক

সেইজন্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'মেমারি' বা স্মৃতিশক্তির উপর। অনুকরণ, অভ্যাস, পাঠ এবং অতঃপর শিল্প সৃষ্টি এই ছিল এঁদের মতে মূল কর্ম। জনসনই ইংরেজ সাহিত্যে প্রথম নব্য-ক্লাসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন, পরে এসেছিলেন ড্রাইডেন। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে কর্ণেই ছিলেন নব্য-ক্লাসিক ; যিনি অ্যারিস্টটল কথিত সম্ভাব্যতা বা probablity কে ব্যাখ্যা করেছিলেন সাদৃশ্যের সম্ভাব্যতা বলে এবং necessity-কে নাটকীয় প্রয়োজনীয়তার আবশ্যিকতা বলে। সপ্তদশ শতকে ড্রাইডেন বলেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনো নাটক, আসলে নিসর্গকে আদর্শায়িত করে অতঃপর তার রূপায়ণ। নাটক কতকগুলি মানুষের বিচ্ছিন্ন সংলাপ নয়—একটি সম্পূর্ণাবয়ব শিল্পকর্ম। অ্যারিস্টটলের 'প্লট' - আলোচনায় যে-ঐক্যের কথা আছে ড্রাইডেন, কর্ণেই এবং একইসময় রাসিন তা উত্থাপন করেন। হোরেসের 'আর্তসপোয়োতিকার' ঢঙে আলেকজান্ডার পোপ লেখেন 'Essay on criticism' কবিতার ছন্দে পোপ কাব্য-সাহিত্যে নিসর্গের ভূমিকা ব্যাখ্যা করলেন। অষ্টাদশ শতকে যোসেফ এডিসন দার্শনিক লকের পন্থায় অগ্রসর হয়ে Imagination শব্দটির ব্যাখ্যা করেন। এডিসন প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে অ্যারিষ্টটলীয় তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন আনন্দদায়ক বস্তুর অনুকরণ অতৃপ্তির বস্তুর অনুকরণের থেকে অধিকতর আনন্দদায়ক। এডিসন, সাহিত্যের আনন্দের কারণ হিসেবে বলেছিলেন, অভিজ্ঞতা-নির্ভর বস্তুর নতুন রূপ দর্শন এবং তাকে সুন্দর মূর্তিতে দর্শন এই দুটির কারণে সাহিত্য হয়ে ওঠে আনন্দময়। অ্যারিষ্টটল যেমন সাহিত্যকে তুলনা করেছিলেন ছবির সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নিও-ক্লাসিক হোরেস এবং সপ্তদশ শতকের ড্রাইডেন ও ফ্রেসিংও তাই করেছিলেন। ড্রাইডেন লিখেছিলেন—এমন প্রবন্ধ যার শিরোনাম ছিল 'Parallel Between Poetry and Painting' ছবি ও কবিতা উভয়েরই অনুকরণের বিষয়বস্তু 'মানুষ'। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি কবিতার উপর অনেকে লক্ষ্য করেছেন চিত্রের প্রভাব। অষ্টাদশ শতকের লেসিং এর অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য ও চিত্রের সম্পর্ক। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক আলোচনা শুরু হল। এই সময় কাব্য ও সংগীতের সম্পর্ক তিনদিক থেকে নির্ণীত হয়ে থাকে—১) টেকনিক্যাল এবং ফর্মল (কাব্যে প্রধান হল ভাষা এবং সংগীতের সুর)। ২) অনুকরণ, ৩) প্রকাশ ..... বস্তুত সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক, সাহিত্যের সঙ্গে নিসর্গের সম্পর্ক, সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রভৃতি নিয়ে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন ক্লাসিকাল আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন নব্য-ক্লাসিকোর। নব্য-ক্লাসিকেরা উইট (বুদ্ধি), যাজমেন্ট (বিচার) ও রিজন (যুক্তি) এই তিনকে সর্বদাই শিল্প সাহিত্যে সৃষ্টি ও বিচারের নিরিখ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

১৮.৪ রোমান্টিক সমালোচনা

রোমান্টিক কাব্য-কবিতা রোমান্টিক সাহিত্য তত্ত্বভাবনা তথা নান্দনিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিকরূপে যাঁকে চিহ্নিত করা হয় তিনি প্রথম খ্রিষ্টাব্দের গ্রিক দার্শনিক লঞ্জাইনাস বা লঙ্গিনুস (Longinus) । তিনি লিখেছিলেন 'On The Sublime' নামে বই। প্রকৃত Sublime কী তার উত্তরে লঞ্জাইনাস বলেছিলেন, অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা প্রকৃত Sublime আমাদের অন্তরকে তুলে ধরে। প্রকৃত

Sublime মানুষকে সীমার শাসন থেকে মুক্তি দিয়ে চিরন্তন আনন্দ দিয়ে থাকে। লঞ্জাইনাস বলেছেন, 'ইমেজ' হল একটি মানসিক বোধ, এই বোধ থেকে জন্ম নেয় ভাষা এবং সেই ভাষা পাঠকের ভাবজগতে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করে যাতে মনে হয় শ্রোতা বা পাঠক বর্ণিত বিষয়বস্তুকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে 'The True Sublime' সম্পর্কে আলোচনার সময় লঞ্জাইনাস বললেন, যথার্থ 'সাবলাইমে'র অনুভূতি পাঠককে নিয়ে যায় লেখকের স্তরে। তাঁর বিভব সৃষ্টি হয় স্রষ্ট-শোভন অহংবোধ। লেখকের সৃষ্টিকালীন ভাবাবেগের স্বরূপ লেখকই ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তা পাঠক অনুমান করতে পারলেও কিছুতেই অনুভব করতে পারেন না। লঞ্জাইনাস বলেছেন, যে-লেখা পাঠককে যেভাবে স্পর্শ করে না এবং পাঠকের অন্তরেও প্রতিক্রিয়া জায়গায় না তা কোনভাবেই 'Sublime' নয়। অর্থাৎ যাকে আমরা চিরায়ত রচনা বলে থাকি তাকেই লঞ্জিনুস বলতে চেয়েছেন 'Sublime'। ত্রিশসংখ্যক পরিচ্ছেদে তিনি আরও বললেন, চিন্তা এবং ভাষা পরস্পর সাপেক্ষ। লঞ্জাইনেসের ভাষায় 'words finely used are in truth the very light of thought' অর্থাৎ সুন্দর করে ব্যবহার করা ভাষায় চিন্তার আলো ঠিকরে পড়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভাষার কাজই হল পাঠককে ভাষাতীত লোকে পৌঁছে দেওয়া। লঞ্জাইনাস মানতেন যে, কবিতার প্রতিক্রিয়া যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। কাব্যপাঠে পাঠকের চিত্ত লোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি মনে করতেন যে, কাব্য কবিতার কাজ পাঠকের মনকে উদ্দীপিত বা আলোকিত করা এবং তা বিচারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। লঞ্জাইনাস বললেন, 'In general we may consider the passages which always please, and please all readers, Contain the beauty and truth of the sublime' অর্থাৎ যে সমস্ত রচনাংশ আমাদের সমস্ত পাঠকদের তৃপ্ত করে তার মধ্যেই এর সত্য ও সৌন্দর্য।

দীর্ঘকাল পরে রোমান্টিক সাহিত্যদর্শনের ধারা নতুন করে প্রবাহিত হতে শুরু করে ইমানুয়েল কান্ট-এর সময় থেকে। কান্ট মনে করতেন, সৌন্দর্যের বিচার বিশ্বজনীন এবং সব মানুষের ক্ষেত্রেই এক। তিনি বললেন, একমাত্র জ্ঞানই অপরের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। সেই কারণে সাহিত্যকে এমন ভাবে রূপ দিতে হয়, যাতে তা অপরের কাছে জ্ঞেয় হয়ে ওঠে। কান্টের সেই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিল আধুনিক রূপবাদ। কান্টের দর্শন থেকে জন্ম হয় আর্টবাদেরও। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করে নিলে প্রতিভা নামক অন্তর্গত শক্তিকে। কান্ট বললেন, মানুষকে যা তৃপ্ত করে তা আনন্দদায়ক, যা আনন্দেয় তাই সুন্দর যা তার স্বীকৃত হয় তাই মঙ্গল। মনুষ্যতর প্রাণীরও তৃপ্তির বোধ আছে, কিন্তু মানুষের কাছে সৌন্দর্যের বোধ। কান্ট বললেন, যে তৃপ্তির মধ্যে আমাদের কামনা জড়িয়ে থাকে না তাকে এককথায় বলা যায় 'subjective university' বা চিন্ময় বিশ্বজনীনতা। যেহেতু সৌন্দর্যের বিচার করে 'মন' ; সুতরাং এমন কোনো নিয়মকানুন নেই যার দ্বারা সৌন্দর্যের বিচার সম্ভব। কান্ট আনন্দ ও কল্যাণের সঙ্গে সৌন্দর্যকে মিশিয়েছিলেন। তদুপরি সৌন্দর্য ছিল তাঁর কাছে উদ্দেশ্যহীন। সুন্দর সৃষ্টি করে 'প্রতিভা'।

একদা প্লেটো, শিল্প সাহিত্য ও সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা অলৌকিক শক্তির প্রভাবের কথা ভেবেছিলেন। প্লেটো বিশ্বাস করতেন, যাবতীয় সৃষ্টির প্রেরণা নেমে আসে ঊর্ধ্বতম পরম সত্যের কাছ থেকে। সেই সত্য প্রতিবিম্বিত হয় বস্তুজগতে এবং অতঃপর বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে সাহিত্যে। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল সাহিত্য

সৃষ্টির প্রেরণা সন্ধান করেছিলেন অনুচিকীর্ষার মধ্যে। মানুষের অন্যতম প্রবণতা হল অনুকরণ করা। অনুকৃত বস্তুররূপদর্শনে আনন্দ পায় সে। কান্ট, মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে দেখলেন 'প্রতিভা' নামক এক অন্তর্নিহিত শক্তির প্রাধান্য। তাঁর মতে, 'প্রতিভা' যেমন অন্তর্নিহিত শক্তি তেমনি তা মৌলিক ব্যাপারও। মৌলিকতাই তার প্রথম উপাদান। এই মৌলিকতার জন্যই বর্হিজগতে যে বস্তু অসুন্দর শিল্প সাহিত্যে তাই হয়ে ওঠে সুন্দর। এই মৌলিকতার সঙ্গে যুক্তি হয়ে আছে শিল্পী বা প্রাতিভজ্ঞান। কান্ট রোমান্টিক সাহিত্য দর্শনকে দিয়েছিলেন, কল্পনাতত্ত্ব, রূপকৈবল্যতত্ত্ব, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্ব, মৌলিকতা, প্রাতিভজ্ঞান এবং বিশ্বজনীনতার বোধ। জার্মান দার্শনিক শিলিং, শিলার এবং ইংরেজ দার্শনিক স্পেন্সার কান্টীয় নন্দনতত্ত্বকে বিস্তার দান করেছিলেন। শিলিং, দর্শন ও শিল্পের সম্পর্ক আলোচনা করে বললেন, দর্শন যখন বস্তুর স্পর্শ পায় তখন হয় সাহিত্য, আর সাহিত্য যখন বস্তুর সম্পর্ক বিরহিত হয় তখন হয়ে পড়ে দর্শন।

আর্টকে তিনভাগে ভাগ করলেন হেগেল-ক্লাসিকাল, রোমান্টিক ও সিম্বলিক। হেগেলের মতে, ক্লাসিকাল আর্টের দৃষ্টান্ত হল ভাস্কর্য। তিনি মনুষ্যরূপকেই ক্লাসিকাল বলে গণ্য করেন। স্থাপত্য হল সিম্বলিক আর্টের নিদর্শন। আর রোমান্টিক আর্টে 'ফর্ম' ও 'আইডিয়া' শিল্পকর্মে 'কর্ম' টাই চূড়ান্ত নয়। শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের অন্তর। সিম্বলিক আর্টে প্রাধান্য পায় 'আইডিয়া' বা কন্টেন্ট - এর অসাধারণ মিলন ঘটে। 'গান' এবং কবিতা হল এই গোত্রের শিল্প। কান্ট যেমন কবিতাকে সর্বোত্তম শিল্পকর্ম বলেছিলেন, হেগেলও তাই বললেন। হেগেল বললেন, কবিতা হল মনের এক বিশ্বজনীন শিল্পকর্ম। কবিতা মুক্ত। কবিতা স্থান-কালতীত ভাবাবেগকে ইহগ্রাহ্য রূপ দান করে থাকে। কবিতা হল যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে উত্তম। যাবতীয় সৌন্দর্য সৃষ্টিতে প্রয়োজন হয় যে কল্পনার, কবিতা সেই কল্পনাকে সার্থক ইহগ্রাহ্য রূপ দিয়ে থাকে। কাব্য-কবিতা, হেগেলের মতে, অসীমকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে। ১৭৯৮-এ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ একসঙ্গে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' প্রকাশ করলেও দু'জনের পথ যেন দুটি পৃথক দিকে নির্দিষ্ট হল। ওয়ার্ডওয়ার্থের কাছে নিসর্গ প্রকৃতি তথা অতিপরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের ভাবব্যঞ্জনা ছিল প্রধান আর কোলরিজ অতিপরিচিতের মধ্যে টেনে আনতে পারতেন অলৌকিকতার রোমাঞ্চ। ওয়ার্ডওয়ার্থ মুখের ভাষাকে করে তুলতে চেয়েছিলেন চিরকালের কাব্যভাষা। অপরপক্ষে কোলারিজ মধ্যযুগীয় বাতাবরণে রচনা করলেন 'ক্রিসটারেল', রহিম অব দি অ্যানুসিয়েন্ট মেরিনারে'র মতো কবিতা। কাব্যের ভাষা, কাব্যের কল্পনা, সম্পর্কে এই রোমান্টিকদের স্বীকৃতি পাওয়া গেল শেলীর 'A defence of peotry' তে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Lyrical Ballads' এর মুখবন্ধে এবং কোলরিজের 'Biographia Liferaria'-তে।

অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিকাল কবিদের পন্থা বর্জন করে শেক্সপীয়র অনুরাগী জীউস বললেন যে কবিতা রচনার প্রথম প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে 'কল্পনা'। কবি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে এই কল্পনার দ্বারাই এক একটি কবিতার মূর্তিতে তুলে ধরেন। কীটস-এর মতে, কল্পনা যাকে সুন্দর বলে স্বীকার করে নিয়েছে তা-ই সত্য ; বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাক বা না থাক। এই 'কল্পনা' এমন একটি শক্তি যার সাহায্যে সৃষ্ট কবিতাকে মনে হয় বৃক্ষে নবপত্রাদ্গমের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক। কাব্য সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তবে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন অনুভূতির মৌহতিক অসংযত প্রকাশই কবিতা নয়। কাব্যের জন্ম

'নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন' থেকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন'-এর মধ্যে পার্থক্যের ওপরেও আলোকপাত করেছে। তবে 'কল্পনা' ও 'ফ্যান্সির' মধ্যে পার্থক্যরেখা ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেভাবে টেনেছেন কোলারিজ সেভাবে টানেন নি। কোলারিজ খানিকটা কান্টের পথ অনুসরণ করেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন, 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন' হল একই কল্পনাশক্তির দুটি স্তর মাত্র। অপরপক্ষে কোলারিজ কল্পনাকে তিনভাগে ভাগ করলেন কান্টের মতোই। কান্ট বলেছিলেন, কল্পনা হল ঃ 'Productive, Re-Productive' এবং Aesthetic আর কোলারিজ বললেন কল্পনা হল ঃ Fancy, Primary imagination এবং Secondary imagination। দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্য পদবিতে উন্নীত করতে চেয়ে বলেছিলেন যে, কবিতার ভাষা হল 'a selection of the real language of man or the very language of man and that there was no essential difference between the language of prose and that of poetry'। কোলারিজ বললেন, মানুষের জ্ঞান, ক্ষমতা ও অনুভূতির গভীরতা অনুযায়ী ভাষা পৃথক হয়। একই শ্রেণি বা ভিন্ন শ্রেণির দুটি মানুষ কখনও এক ভাষা ব্যবহার করে না, যদিও শব্দ, শব্দবঙ্গা সবই এক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ গদ্য ও কবিতার মধ্যে ভেদরেখা মুছে দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু গদ্য ও কবিতার ভাষাগত বিভিন্নতা কোলারিজ স্পষ্টতই স্বীকার করলেন। কবি ব্যবহার করেন ছন্দ, ছন্দ গড়ে ওঠে শব্দ ব্যবহারের কৌশলের দ্বারা। সমালোচক হিসেবে কোলারিজকে বলা হয় Impressionist Romantic।

এইভাবে লঞ্জাইনাস থেকে শুরু করে কোলারিজ-ওয়ার্ডসওয়ার্থ পর্যন্ত বিভিন্ন সমালোচকদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল রোমান্টিক সাহিত্যরীতি। ক্লাসিকাল মতবাদীদের সঙ্গে রোমান্টিকদের পার্থক্য এইখানে যে, ক্লাসিক ও নব্য-ক্লাসিকদের কাছে 'রূপ'-'বাহ্যরূপ' প্রধান এবং তাঁরা সন্ধান করেন সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা, পরিমিতি। রোমান্টিকেরাও 'কর্ম'-এর উপর গুরুত্ব না দেন তা নয়, তবে তাঁরা রূপের অন্তরস্থ 'আত্মা'-কে খুঁজে করেন। ক্লাসিকাল মতবাদীদের কাছে মানুষের মূল্য মানুষ হিসেবে আর রোমান্টিকেরা সন্ধান করেন আত্মাকে। ক্লাসিকেরা চান শান্তি, রোমান্টিকেরা চান নিত্য নতুন রহস্যের আবিষ্কার। ক্লাসিকেরা পছন্দ করেন ঐতিহ্য, রোমান্টিকেরা পছন্দ করেন নবীনত্ব। রোমান্টিক আর্ট হল বিস্ময়ের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিশ্রণ, জিজ্ঞাসার সঙ্গে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার সংযোগ। এইখানে ক্লাসিকাল রচনা থেকে রোমান্টিক রচনা পৃথক হয়ে পড়ে।

১৮.৫ বস্তুবাদী সমালোচনা

শিল্প-সাহিত্যে 'বাস্তব' শব্দটি এসেছে দর্শন থেকে। দর্শনে এর ব্যবহারে কখনো 'শেমিনালিজম্' বা কখনো আইডিয়া লিজমের বিপরীতার্থে। শিলার এবং শ্লেগেল, এই দুই দার্শনিক অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শিল্প সাহিত্যে 'external reality' অর্থে 'realism' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সাহিত্যে শব্দটিকে তেমনভাবে কাম্য মনে করেননি। নতুবা ১৭৯৮-এর একটি চিঠিতে শিলার গ্যেটেকে লিখতেন না যে - রিয়ালিজম্ - এর প্রতি আসক্তি থেকে কেউ কবি হন না। আসলে যেহেতু realism বলতে তখন external reality-র হুবহু অনুকরণ বোঝান হত তাই সাহিত্যে এই শব্দের অনুপ্রবেশের তাৎপর্য শিলার-এর কাছে খুব সুখদায়ক মনে হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে ভাববাদী রোমান্টিকদের কাছে 'realism' শব্দটি বাহ্যবস্তুর অনুকরণ ছাড়া কিছু ছিল না। এই অর্থেই 'বাস্তব' শব্দটিকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো

আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে'। কিন্তু সত্যিই কি আর্টের মধ্যে বাস্তবতা প্রবেশ করলে তার অন্তরের রস নিঃশেষ করে ফেলে ? এই উত্তরে বলা যায় যে, বাস্তবতা আর্টের অন্তরের রস নিঃশেষ করে না ফেলে আর্টকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং তার প্রমাণ বিগত এক শতকের বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

'External reality'- ই যদি সাহিত্যের 'বাস্তব' হয় তাহলে বিষয়টাই হয় বাস্তববাদী সাহিত্যের আধার, বিষয়ীর কোনো মর্যাদা থাকে না সেখানে। কিন্তু এমন সাহিত্য বা শিল্পের অস্তিত্ব কি সম্ভব যেখানে বিষয়ীর কোনো ভূমিকা থাকে না ? হয়তো রোমান্টিক কাব্য 'বিজয়ী' প্রধান 'বিষয়' গৌণ। কিন্তু এর অর্থ এই হয় যে, রোমান্টিক কাব্যে বিষয়ের এবং বাস্তববাদী সাহিত্যে বিষয়ীর কোনো মূল্য নেই। তাই যদি হয় তাহলে রোমান্টিক কাব্যে শুধু কবির অলীক কল্পনা, এবং বাস্তববাদী সাহিত্য হল কতকগুলি বাস্তব ঘটনার সমাহারমাত্র। কিন্তু সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, একথা সত্য নয়। কি রোমান্টিক, আর কি বাস্তববাদী কোনো সাহিত্যই 'মনের পরশ' ছাড়া রচিত হয় না। এইখানেই ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে চিত্রকরের মৌলিক পার্থক্য। শিল্পী, তিনি যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, বস্তুজগৎ থেকে বিষয় গ্রহণ করেন মনের নির্বাচন দক্ষতা দিয়ে এবং তাকে যখন শিল্পমূর্তিতে স্পষ্ট করে তোলেন তখন 'মন'-ই তাঁর প্রধান সহায়। সুতরাং জগতের উপর মনের কারখানা, মনের উপর বিশ্বমানের কারখানা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি সেই উপরতলা থেকে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বাস্তববাদীদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। বাস্তববাদী রুশ-দার্শনিক বেলিনস্কির মুখে গত শতকের প্রথমার্ধে শোনা গিয়েছিল ঃ 'Fidelity to nature is not the be all and end all of art' ... ... 'The truth is that imagination in art plays the most active, the leading role.'। লেখকের কল্পনা, মর্জি, যুক্তিবুদ্ধির খুবই মূল্য স্বীকার করতেন তিনি, যেহেতু শিল্পের জগৎ ছিল তাঁর কাছে নতুন সৃষ্ট এক জগৎ—'Art is the representation of reality, the republicated, or, as, it were, newly Created world.'। এই নতুন জগতে, তাঁর মতে, সত্যের সঙ্গে কল্পনার, বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের কোনো দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তো নেই-ই, বরং তারা পরস্পরের সহযোগী। শিল্প সাহিত্যের জগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতের পারস্পরিক বৈপরীত্যকে একটি স্বীকৃত সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন ভাববাদীরা। বিজ্ঞানের জগৎ তাঁদের কাছে ভাবনা ও চিন্তার জগৎ, বস্তুর জগৎ, অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের জগৎ ভাব ও আবেগের জগৎ তথা কল্পনার জগৎ। কিন্তু বেলিনস্কির মতে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পার্থক্য ভাব ও ভাবনায় পার্থক্য নয়, এই পার্থক্য রূপায়ণপদ্ধতিগত। সাহিত্যের কাজ প্রদর্শন, বিজ্ঞানের কাজ প্রমাণ। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল '... ... art and science are equally indispensible, and neither Science can replace art nor art replace Science,' (Ibid, P-432)। এখন প্রশ্ন হল বিজ্ঞানের এই ক্রমোন্নতির দিনে মানুষ যখন চিরকালীন বিশ্বাস ও ভরসার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে বস্তুজগৎকে অবলম্বন করতে শুরু করেছে তখন একজন শিল্পীর ভূমিকা কী হবে ? তিনি কি কল্পলোকে বিশ্রাম করবেন, না কি সুখ-দুঃখ ভরা যে বাস্তবজীবন তাকে গ্রহণ করবেন ? আসলে মনে রাখতে হবে যে, একজন শিল্প তাঁর দেশ-কালের সন্তান। ফলে শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্যের জোরে তিনি তাঁর সমকালকে অস্বীকার করতে পারেন না। পারেন না যুগের চাহিদাকে বিসর্জন দিতে। যেহেতু তাঁর কাল ও পরিবেশ থেকে শিল্পী তার প্রাণের রস সঞ্চয় করে থাকেন, সুতরাং সেই কাল ও পরিবেশকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

যাঁরা চিরন্তন-সাহিত্যের কথা বলেন তাঁদের প্রধান যুক্তি হল—স্থান বা যুগের পরিবর্তন হলেও মানবপ্রবৃত্তি যেহেতু অপরিবর্তনশীল এবং মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রই সাহিত্যের উপজীব্য অতএব ক্ষণ-চঞ্চল সমস্যাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করলে সে সাহিত্য চিরজীবী হতে পারে না। শেক্সপীয়ার বা কালিদাস চিরন্তন সাহিত্যের স্রষ্টা, যেহেতু কোনো বিশেষ দেশকালের স্পর্শ লাগেনি তাঁদের সৃষ্টিতে। কিন্তু এ যুক্তি খুব কঠোর ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। স্রষ্টা হিসেবে কালিদাস বা শেক্সপীয়ার বা কালিদাস চিরন্তন সাহিত্যের স্রষ্টা, যেহেতু কোনো বিশেষ দেশকালের স্পর্শ লাগেনি তাঁদের সৃষ্টিতে। কিন্তু এ যুক্তি খুব কঠোর ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। স্রষ্টা হিসেবে কালিদাস বা শেক্সপীয়ার তাঁদের যুগের সন্তান, এই হচ্ছে সত্য। বিক্রমাদিত্যের কাল বা এলিজাবেথীয় যুগ দ্বিতীয় একজন কালিদাস বা দ্বিতীয় একজন শেক্সপীয়ার দেয়নি বলেই যে এঁরা দেশ-কালের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত তা অবশ্যই নয়। দ্বিতীয়তঃ মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি শাশ্বত হলেও তাদের প্রকাশ চিরকাল এক নয়। সমাজের সঙ্গে ব্যাষ্টির সম্পর্ক নিত্য পরিবর্তনশীল। সমাজের সমস্যা ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যে-অবস্থায় মূলবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, বঞ্চনা ও শোষণের স্বরূপ বদল হয়েছে সেই অবস্থান সাহিত্যের বিষয়বস্তু, জীবন সম্পর্কে সাহিত্যিকদের বোধ নিশ্চয়ই প্রাচীন কোনো আদর্শে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। রুশযুগ ও পরিবেশের সন্তান হিসেবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিত্য নতুন সমস্যা সাহিত্যিক অঙ্গীকার করতে বাধ্য। বস্তুবাদী দার্শনিক চেরনিশেভস্কি ও ডোব্রোলিউবফ বলেছিলেন, বাস্তবজীবনে যার অস্তিত্ব নেই, সাহিত্যে তা কদাপি রূপায়িত হবে না। সাহিত্য হবে প্রচারের মাধ্যম এবং কেমনভাবে এই প্রচারকার্য সম্পন্ন হয় তার উপর নির্ভর করে সাহিত্যের মর্যাদা। এখন প্রশ্ন হল, বাস্তবের কোন্‌টি শিল্পী গ্রহণ করবেন এবং কোন্‌টি বর্জন করবেন ? এর উত্তরে বলা যায়, মানুষের জীবনের মূল-সমস্যা কেন্দ্রীভূত যেখানে, শিল্পীর সৃষ্টির উপাদানও সেখানেই মিলবে। মানুষের প্রবৃত্তিগুলি স্থান কালোত্তীর্ণ। সুতরাং মানব-সম্পর্কের বিকাশ বিষয়ে সচেতন শিল্পীরা চিরকালই দেশকালোত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। কিন্তু সংশয়বাদীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারেন যে, দেশের গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছেন বলে কালের গণ্ডি অতিক্রম করতে তাঁরা পারবেন নি ? এর উত্তরে বলা যায় যে, শতাব্দীর বাধা ভেঙেছেন এঁরা, একালের পাঠকেরাই তার প্রমাণ। তবে যেহেতু ভবিষ্যতের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় তখন সংশয় করাটাও নিরর্থক। কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সমালোচনা করে বাস্তববাদী সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, বঞ্চিতের সংগ্রামী ছবি এঁকেছেন। তার জন্যই আগামীকাল স্মরণ করবে তাঁদের।

শুধু বিষয়ের গুণে কেউ শিল্পী নন, 'দৃষ্টি' ও 'সৃষ্টি'—এই দুই-এ মিলে তবে একজন শিল্পী হন। ১৮৩১-এ ফরাসি বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক বালজাক বলেছিলেন,—বই লেখার আগে লেখককে হতে হবে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ ও রূপায়ণে দক্ষ, মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি ও অনুভূতির সঙ্গে সুপরিচিত এবং গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারী। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও রূপায়ণ দক্ষতা এই তিনটি উপাদানের উপরই লেখকের সাফল্য নির্ভর করে বলে মনে করতেন বালজাক। স্তাঁদালও উপন্যাসকে শুধু বাস্তব ঘটনার সমাহার রূপে দেখেন নি। তাঁর মতে, উপন্যাস হচ্ছে এমন একখানি 'আরশি' যেখানে নীল আকাশ ও 'কর্দমাক্ত পথ' দুই-ই স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় পুশকিন, স্তাঁদাল, বালজাক ও ফ্লোব্যার থেকে আরম্ভ করে হেনরি জেমস্ পর্যন্ত বা তার কোনো বাস্তববাদীই শুধু 'কর্দমাক্ত পথ-এর

রূপ ফুটিয়ে তোলেন নি তাঁদের সাহিত্যে। অথচ ভাববাদীরা বাস্তববাদীদের সম্পর্কে একথাই বলেন যে, এঁদের কাছে ফুল অপেক্ষা কদম বাস্তব, যা নীচে থাকে তা তত বাস্তব। আসলে বাস্তবাদীরাই প্রথম নীচুতলার মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সক্ষম হয়েছিলেন সামাজিক উৎপীড়ন ও শোষণের ক্লেদাক্ত ছবি তুলে ধরতে, তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এই অভিযোগ। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, ফ্রান্সে যখন স্তাদাঁল বালজাকের যুগ তখন ফ্রান্সে গৌরবময় অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে, শুরু হয়েছে অবক্ষয়ের পালা। এই পরিস্থিতিতে লেখকেরা বিরক্তিসহ সমকালের দিকে তাকালেন, নিজেদের লেখনীকে ব্যবহার করলেন সামাজিক অধঃপতনের অস্ত্ররূপে। পূর্বসূরীদের মতো আত্মজৈবনিক রচনা না লিখে ফুটিয়ে তুললেন পুঁজিপতিদের সুতীব্র অর্থলালসা, চারিত্রিক অবিশুদ্ধতা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি ও গোপন ব্যভিচারের ছবি। বালজাক তাঁর বিখ্যাত 'ড্রোল স্টোরিজ'-এ বিত্তবান পরিবারের মানুষগুলো চরিত্রের বিভিন্ন দিকের দৈন্যকে ফুটিয়ে তুললেন নিপুণ সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে। ডাস্টয়েভস্কির 'Crime and Punishment' ফ্লোব্যার এর 'বাদাম বোভারি' প্রভৃতি রচনায় ধনতন্ত্রের কুফলের ছবি আছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কথিত 'মানবচরিত্রের দীনতা' হার্বার্টরীড কথিত 'aspect of life ... ... least flattering to human dignity' বালজাক প্রমুখের উপন্যাসে আপাতভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্তাদাঁলেরে জুলিয়েঁ শেরেল, বালজাকের Raphael প্রমুখ তাঁদের মুক্ত হৃদয় ও আদর্শবোধ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছে ধনতন্ত্রের অনিবার্য কুফলের বিরুদ্ধে। বালজাক জানতেন অভিজাতদের কথা, নয়া বিত্তবান শ্রেণির কথা। তাই ধনতন্ত্রের ধ্বংসকে অনিবার্য জেনেছিলেন, সহানুভূতি প্রকাশ করেছিএলন শ্রমজীবীর প্রতি।

যে পদ্ধতিতে ফ্রান্সে বাস্তবজীবন-সমস্যাকে রূপায়িত করেছিলেন বালজাক প্রমুখ শিল্পীরা, সেই একই পদ্ধতি রুশ-সাহিত্যে ব্যবহার করলেন পুশকিন-গোগোল-আলেকজান্দার এবং কিছুটা অন্যরকম বললেও লিও-তলস্তয়, আর ইংরেজি-সাহিত্যে ডিফেন্স ও হেনরি জেমস্ প্রমুখ। পুশকিন বিশ্বাস করতেন পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই মানবচরিত্র গড়ে ওঠে ; আর তাই তিনি তাঁর নায়কের কারণ সন্ধান করেছিলেন সামাজিক ঘটনার মধ্যে। পুশকিন কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে লিখলেন The Cap। এই উপন্যাস লেখার সময় তিনি যথার্থ বাস্তববাদীর দৃষ্টি নিয়ে কাজান, ওরেনবার্গ, আরও বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অর্থাৎ জীবনকে বাস্তবতার পটে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন। গোগোলের রচনার যথাযথতা, অস্টোভস্কির দাসত্ব বিরোধী-জীবন-মুক্তি-কামনা, এঁদের সমাজ জীবনের সঠিক বিশ্লেষণ দক্ষতা ও সাহিত্যের বর্ণনায় বাস্তবানুগত্য প্রমান করে। টলস্টয় এঁদেরই মতো ধনতন্ত্রের সমালোচক। ফরাসি ও রুশ সাহিত্যে বাস্তববাদীরা যেভাবে সমালোচনা করেছিলেন, সেই পদ্ধতিতেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা তুলে ধরেছেন 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'বিল্ক হাউস' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা চার্লস ডিফেন্স।

এখন উনবিংশ শতকের ফরাসি, রাশিয়া ও ইংরেজি সাহিত্যের বাস্তববাদীদের যে স্বভাবধর্ম তাঁদের সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল ঃ

ক) বিশ্লেষণ-প্রবণতাই এঁদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

খ) ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের দ্বন্দ্ব এঁদের সকলের রচনারই উপজীব্য বিষয়।

গ) শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন এরা।

ঘ) ধনতন্ত্রের চাপে ব্যক্তিহৃদয়ের যন্ত্রণার ভাষ্যকার এই বাস্তববাদীরা।

ঙ) বর্ণনায় যথাযথতা বজায় রাখতে চেয়েছেন সকলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোটামুটি তত্ত্বগতভাবে বাস্তববাদীরা এই সত্য মানতেন যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে বাস্তবজীবন কেন্দ্রিক, সমস্যা হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সম্পর্কিত, চরিত্র হবে সজীব প্রাণবান। লেখক হবেন জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তাঁর বর্ণনা হবে যথাযথ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই বাস্তববাদীরা জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকটের ছবি তুলে ধরলেও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত দেন নি। বালজাক স্পষ্টই মনে করতেন এই পরিবর্তন উপরের কোন শক্তি দ্বারা সাধিত হবে। ব্রান্ট এবং ডিফেন্সও পরিবর্তন চেয়েছেন, কিন্তু এঁরা কেউই সমাজের স্থিতাবস্থার পরিবর্তন কামনা করেন নি। এই জাতীয় বাস্তববাদীদের গোর্কি 'Critical realists' নামে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই বাস্তবতার চিত্র ফুটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের মতো মহান শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক, তাই জীবনের গোড়ার দিকে সাহিত্যে কোনো রকম বাস্তবতার অনুপ্রবেশককে সহ্য করেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে শুধু আপত্তি তুলেছিলেন বাস্তবের নামে জঘন্যতার আমদানির বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশিতে' বাস্তবজীবন-সমস্যার রূপ দিয়েছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের মতো এবং 'যোগাযোগ' মধুসূদনের মতো বাস্তব চরিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন তাই রক্তকরবীতে যক্ষপুরীর বঞ্চিত মানুষগুলিকে একটি বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে না দেখিয়ে রাজারই ভিতর থেকে জাত ভূমিকম্পে তার আত্মার জাগরণ দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও আছে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজের দীর্ঘকালীন অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং বঞ্চনা ও শোষণের বেদনাদায়ক আলেখ্য। কিন্তু শরৎচন্দ্রও সত্যের প্রতিলিপিকর মাত্র, সমাজ-মুক্তির পথ প্রদর্শক নন। আর তারাশঙ্কর দেখেছেন প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের তিরোধান, কলকারখানাভিত্তিক ধনতন্ত্রে প্রসার। তিনি ধনতন্ত্রের সমালোচক ; কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন অতীতে সামন্ততন্ত্রের জন্য। 'Critical realists' রা অনেকেই এই পশ্চাদমুখীনতার ত্রুটিতে ভুগেছেন ; শুধু তারাশঙ্কর নন। বালজাকও অভিজাততন্ত্রের রুচির সমর্থক ছিলেন। এঁরা জীবনসমস্যার সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়েছে তার মধ্যেও কিছুটা পশ্চাদ্‌পরতা। ধনতান্ত্রিকেরা তাঁদের পুঁজির বিকাশে সবচেয়ে সহায়তা পেয়েছে বিজ্ঞানের কাছে, যন্ত্রের কাছে। কিন্তু কলকারখানায় শ্রমজীবী মানুষগুলি শুধু যন্ত্র-দাসেই পরিণত হয়েছে। ফলে মানুষে মানুষে তৈরি হয়েছে একধরনের বিচ্ছিন্নতা alienation, বা এই alienation ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই অনিবার্য অভিশাপ। এই অবস্থার পরিবর্তন যদি হয় তো তা আসবে শ্রমিকদের তরফ থেকেই। কিন্তু Critical realist বা কৃষক বা শ্রমিকদের দুঃখ সহানুভূতি প্রকাশ করলেও এদের শক্তির বিস্ফোরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই যক্ষপুরীর কাওয়াল, বিশু শুধু সংখ্যা, নামহীন সংখ্যার দল, তারা রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি নয়। শরৎচন্দ্রের গফুর সেই অত্যাচারিত কৃষক সে বিচারের আশায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়।

যদিও তিনি রসবস্তুকেই সাহিত্যের নিত্যবস্তু বলে ঘোষণা করে 'লোকহিত' প্রবন্ধটিতে সামাজিক দায়ভার থেকে সাহিত্যিককে মুক্তি দিয়েছিলেন। তথাপি তাঁর কিছু নাটক, কবিতা বা গল্প কিন্তু বস্তুজীবনের প্রতি তাঁর

ঔদাসীন্য প্রমাণ করে না। আসলে বাস্তবকে অস্বীকার করে কেউই সাহিত্যিক তথা মহৎ সাহিত্যিক হন না। আবার বস্তুর দর্পণ রূপেও 'সাহিত্যও' হয় না। স্রষ্টা এবং সমালোচকের পৃথক দুটি সত্তার অভিন্ন মিলন ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বস্তুকে স্বীকার করেও চৈতন্যের সর্বব্যাপী কর্তৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি ভাববাদীরূপে পরিচিত। তিনি সাহিত্যকে সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং আনন্দদায়ক উপায় বলেই মনে করেন। সাহিত্য হল তাঁর কাছে অপ্রয়োজনের আনন্দ। অর্থাৎ সাহিত্যের আনন্দের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের লাভ বা ক্ষতির কোনো সংযোগ নেই। শুধু ব্যক্তি নয়, কোনোরকম সামাজিক লাভ-ক্ষতির সঙ্গেও সাহিত্যের সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন নি। বস্তুবাদী সাহিত্যতত্ত্বের সামাজিক উপযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্র-বিরোধীরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বস্তুতন্ত্রহীনতা এবং লোকহিত সাধনে তাঁর অমনোযোগের দিকটি নিয়ে বিশদ সমালোচনা করেছেন। এই কটাক্ষপাতকে লক্ষ্য করে কবি ১৩২১ এর 'বাস্তব' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, 'উপরন্তু লোকশিক্ষার কী হইবে। সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যিকের নহে।' পরে 'লোকহিত' প্রবন্ধে এই কথাটিই আরও স্পষ্ট ভাষায় জানালে 'আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পরি না।' তথ্য ও সত্য প্রবন্ধে কবি বলেছেন, 'তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।' প্রকাশ বলতে তিনি প্রকাশিত সাহিত্য রূপকে বোঝাচ্ছেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য হল তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশিত রূপই হচ্ছে সাহিত্য। বস্তুবাদীরাও মনে করেন যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যের সংকলন মাত্র নয়। বস্তুবাদী হাওয়েলস মনে করেন, সাহিত্য জীবনের ঘটনাবলীর 'মানচিত্র' নয়, বর্ণনয় 'চিত্র'। রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদীদের এভাবে বোঝেননি। তাঁর বিশ্বাস, বস্তুবাদীরা বিশুষ্ক প্রেমহীন বাস্তব জীবনের ঘটনা রূপায়ণেই অধিক মনোযোগী। আসলে বাস্তববাদীদের সাহিত্যদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার একটি প্রধান কারণ হল, সাহিত্যের উপযোগিতার প্রশ্ন। বস্তুবাদী-সাহিত্য হল উদ্দেশ্য-প্রধান সাহিত্য একথা ধরে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বাস্তব ব্যবহারের যার মূল্য নেই যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলা, রসকলায়।' কিন্তু প্রয়োজনের বিষয় নিয়ে কেন সাহিত্য লেখা সম্ভব নয় ? প্রতিদিনের সংসার যার ঠাঁই সাহিত্যের ভোজে তার ঠাঁই হবে না কেন ? রবীন্দ্রনাথ তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা' কে যতই sickly বই বলুন না কেন বিশ্বের তাবৎ রসিকেরা তা মানেন না। আসলে রবীবন্দ্রনাথ রোমান্টিক বলেই মনে হয়, বস্তুবাদীদের সাহিত্যদর্শনের মূলে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। পৃথিবীতে এমন অনেক বস্তুবাদী সাহিত্যে আছে যার মূল্য কম নয়। গোর্কির 'মাদার' কি উন্নত শিল্পকর্ম নয় ? তা কি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে আনন্দ দেয় না ? নিশ্চয়ই দেয়, কিন্তু রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনের কথা ভেবেই বস্তুবাদী সাহিত্যকে মেনে নিতে পারেননি।

১৮.৬ অবয়ববাদী সমালোচনা

সাংগঠনিক পদ্ধতির সমালোচনার একটি শাখা হল structuralism বা অবয়ববাদ। তোদেরভ বলেছেন, structural criticism বা অবয়ববাদী সমালোচনা কথাটাই স্ব-বিরোধিতায় ভরা। সমালোচকের কাজ যদি হয় কোনো রচনার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা মাত্র, স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি সেখানে ওই রচনার অন্তর্লীন সংগঠন ও নিয়মবন্ধ রূপারোপের প্রক্রিয়াটিকেই দেখিয়ে দেয়। এই পদ্ধতি দেখায় যে কতকগুলি নীতি, সংগঠন, শৃঙ্খলার পারস্পরিক

যোগাযোগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট একটি বাঙ্‌নির্মিতির জন্ম দেয়। অর্থাৎ সাহিত্য-প্রকাশিত প্রকট রূপ এবং তার এই রূপের সামগ্রিক সংগঠনে কী করে পৌঁছানো গেছে তার প্রচ্ছন্ন সূত্রগুলিকে অধিকারকেই স্ট্রাকচারাল সমালোচনার মূল লক্ষ্য। সে অর্থে স্ট্রাকচারাল তত্ত্ব সমালোচনা নয়, সন্ধান ও আবিষ্কার। স্ট্রাকচারালিস্ট সমীক্ষক যে-রচনাটিকে নির্বাচন করেন, তার সৌন্দর্য বা সাহিত্যিক মূল সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে, তা তিনি ধরেই নিয়ে থাকেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হল, রচনাটির নানা উপাদানের নির্বাচন, বিন্যাস, সংস্থাপন ও সমন্বয়ের মধ্যে তার কোন ভিত্তি আছে কিনা তাই সন্ধান করা। তা-ই স্ট্রাকচারালিজম্‌-কে কেউ বলেছেন একটি জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের মতে, 'অবয়ববাদ' কাব্যবিচারের কোনো তত্ত্ব বা প্রণালী নয়। এই মতবাদের অন্যতম সমর্থক ক্লদ লেভি স্ট্রস (Claude Levi Strauss) যিনি বলেছিলেন, কাব্য কবিতা থেকে যে নান্দনিক অনুভূতির জন্ম হয় তার মূল থাকে আবয়বিক শৃঙ্খলা। স্ট্রাকচারালিস্ট বা অবয়ববাদীরা সাহিত্য বলতে বোঝেন, ভাষার একটি বিশেষ নির্মিতি। এই 'ভাষা' কথাটিকে তাঁরা বুঝতে গিয়ে অবশ্যই বুঝে নেন, দৈনন্দিন ভাষার সঙ্গে কাব্যভাষার পার্থক্যের সূত্রটা কোথায় ? তাঁরা বলেন, দৈনন্দিন ভাষার লক্ষ্য হল 'জ্ঞাপন' বা জানানো এবং সাহিত্যিক ভাষার লক্ষ্য হল 'প্রকাশ'। সাহিত্যির ভাষা 'highly organized'। একজন অবয়ববাদীর কাজ ভাষার ওই Organisation-এর রহস্য বিশ্লেষণ। তাঁরা লক্ষ্য করবেন, কীভাবে ধ্বনিগত, পদগঠনগত, বাক্যগত উপাদানগুলি নির্বাচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। কোথায় তাদের মধ্যে বিরোধ, দূরত্ব বা ঐক্য এবং অংশগুলি কীভাবে গড়ে তুলছে সমগ্রকে। একজন শৈলী-বিজ্ঞানী যতটা নিরাসক্তভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন অবয়ববাদী তা মনে করেন না। তাঁরা জানেন, বিষয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কখনো কখনো বিষয়কে ছাড়িয়ে ভাষা দীপ্ত হয়ে ওঠে। কবিতা বা সাহিত্যের ভাষার মূল নীতি হল ভাষার মূল সংগঠন থেকে কিছুটা সরে আসা। ভাষার মধ্যে স্বাভাবিক যে মৌলিক শৃঙ্খলা থাকে সেই শৃঙ্খলা থেকে সরে এসে পূর্ব প্রত্যাশিত নীতি-বিযুক্ত একটা স্বতন্ত্র রীতি গড়ে তোলাই কবির কাজ। অবয়ববাদী মনে করেন, কবিতা, গল্প, উপন্যাস যাই হোক তাঁর organization বা সংস্থান সংগঠনের মূল উপাদান ও নীতিকে আবিষ্কার করা তাঁদের একটা বড় কর্তব্য। structure বলতে বুঝতে হয়, আলোচ্য সাহিত্য কর্মের অনেকগুলি অঙ্গ আছে। যেমন, একটা কবিতা। কবিতাটিকে যদি বলি 'অঙ্গী' তাহলে তার দু/চার/পাঁচ যতগুলি স্তবকই থাক, সে হল অঙ্গীর অঙ্গ। অবয়ববাদীর কাজ হল অঙ্গগুলির ভিতরে পারস্পরিক সম্পর্কের যে বিন্যাস আছে তার রহস্য আবিষ্কার। আবার স্তবক রচিত হয় পঙ্‌ক্তি দিয়ে, পঙ্‌ক্তি গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। অবয়ববাদীরা কাজ স্তবকের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্‌ক্তি, শব্দ-এসবের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর থেকে সৌন্দর্যের রহস্যটি আবিষ্কার। শব্দ তো শব্দই, তার নিজের অর্থ, ইঙ্গিতদানের সামর্থ্য ইত্যাদি আছে। কিন্তু যখনই সেই শব্দ বসে অন্য শব্দের পাশে তখন একটা relation বা সম্পর্ক ঘটিত পরিচয় নতুন হয়ে দেখা দেয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ 'এক বিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল/এ তাজমহলে' — এই তিন পঙক্তি মিলে একটা অখণ্ড ভাব প্রকাশ পেল এবং ভাবটা পাঠক মনকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিতেও সমর্থ। একথা মনে রেখেই বলা যায় 'কালের' পাশে 'কপোলতলে' যেমন Relational Identity তে বলা, তেমনটি আসত না অন্য কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে। প্রিয়ার 'কপোল' বর্ণনা করতে গিয়ে ইংরেজ কবি যে বলেছেন 'like a red red

rose' তিনি 'red' শব্দটি পরপর দু'বার ব্যবহার ভুলবশত নয়। এই দ্বিরুক্তির মধ্যেই রস-রহস্যটি লুকিয়ে আছে। শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হল - এ ধরনের পরিসংখ্যান জানিয়ে শৈলীবিজ্ঞানীর কাজ শেষ হলেও অবয়ববাদীর হয় না। তিনি সমগ্র রূপের কথাটা মনে রেখে সংগঠক উপাদান সমূহের আলোচনা করেন, খোঁজেন কীভাবে এবং কতটা রূপান্তরিত হয়েছে পুরাতন উপাদান। কবি একজন কৌশলী ব্যক্তি। তিনি ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া উপাদানগুলিকেই কৌশলে সাজিয়ে তোলেন না, সৃষ্টি ও করেন। 'উপাদান' ও 'উদ্দেশ্য' দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন যে অবয়ব, সমালোচকের কাজ তাকেই সন্ধান। সেই সন্ধান চালিয়েই তিনি লক্ষ্য করেন যে, কবিতাটির বাইরে যে গঠন তার ভিতরে গোপনে কাজ করেছে অন্য বহুগার ধরে আসা কোনো গঠন অবয়ববাদীরা কাব্যে সাংগঠনিক সমালোচনাতত্ত্বে একটি সীমা স্পর্শ করলেও প্রশ্ন উঠেছে 'অবয়ববাদের পরে কী আছে? সুতরাং সাহিত্যবিচারের এটাই শেষ কথা নয়।'

১৮.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১। প্রতিভা কয় প্রকার ও কী কী?

২। 'কারয়িত্রী' এবং 'ভাবয়িত্রী' প্রতিভা কাকে বলে?

৩। 'সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ নয়'—কে বলেছেন?

৪। সাহিত্যবিচারে শ্রেষ্ঠ উপায় কী? — বুঝিয়ে বলুন।

৫। 'ক্লাসিকাল' শব্দটি কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে?

৬। দুটি ক্লাসিক আদর্শের নাম করুন।

৭। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

৮। ক্লাসিকালবিচার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করুন দুটির গ্রন্থের নাম করুন।

৯। অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের নাম কী?

১০। 'আর্স পোয়েটিকা' কার রচনা?

১১। সাহিত্য সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা কী?

১২। প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার পার্থক্য কোথায়?

১৩। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচারক হিসেবে অ্যারিস্টটলের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।

১৪। অ্যারিস্টটল সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় কীসের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১৫। ক্লাসিকাল সাহিত্যচর্চার সম্পর্কে হোরেসের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করুন।

১৬। কয়েকজন নব্য-ক্লাসিক সমালোচকের নাম করুন।

১৭। নব্য-ক্লাসিক সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৮। আলেকজান্ডার পোপের গ্রন্থটির নাম কী ?

১৯। সপ্তদশ শতকের একজন নব্য-ক্লাসিক সাহিত্য বিচারকের নাম করুন।

২০। 'Parallel Between Poetry and painting' প্রবন্ধটি কার লেখা ?

২১। নব্য-ক্লাসিকেরা শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি ও বিচারের ক্ষেত্রে কোন্ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন ?

২২। রোমান্টিক আদর্শের ব্যাখ্যা করুন।

২৩। ক্লাসিকাল সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে রোমান্টিক সাহিত্য-শিল্পের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৪। রোমান্টিকেরা তাঁদের রচনার প্রেণা সংগ্রহ করেছিলেন কোন্ কোন্ উপাদান থেকে ?

২৫। 'গোথিক' কীসের প্রতীক ?

২৬। 'The Rime of the Ancient Marnier' কার লেখা ?

২৭। প্রথম রোমান্টিক নন্দন তাত্ত্বিকের নাম কী ? তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম কী ?

২৮। লঙ্গাইনাসের বক্তব্যটি সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

২৯। 'sublime' কী — ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৩০। আধুনিক রূপবাদের জনক কে ?

৩১। কান্ট 'subjective universality' বলতে কী বুঝিয়েছেন ?

৩২। রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে কান্টের দর্শনকে ব্যাখ্যা করুন।

৩৩। হেগেল আর্টকে কয়ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং কী কী ?

৩৪। 'গান' এবং 'কবিতা' কোন্ ধরনের শিল্প ?

৩৫। হেগেল 'কবিতা' কে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন আলোচনা করুন।

৩৬। রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিকদের কাছে 'কল্পনার' স্থান কোথায়—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৩৭। 'কল্পনা' সম্পর্কে কান্ট ও কোলারিজের বক্তব্য আলোচনা করুন।

৩৮। 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্' কার রচনা ? এই গ্রন্থের সম্পাদক কারা ?

৩৯। 'A defence of Poetry' কার লেখা ? এখানে কোন বিষয় আলোচিত হয়েছে ?

৪০। কোলরিজের কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থটির নাম কী ?

৪১। কাব্যভাষা সম্পর্কে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করুন।

৪২। একটি রোমান্টিক প্রেমের কাব্যের নাম করুন।

৪৩। 'The Eve of St. Agnes' কার লেখা ?

৪৪। অবয়ববাদী সমালোচনা কাকে বলে ?

৪৫। একজন অবয়ববাদী সমালোচকের নাম করুন।

৪৬। একজন অবয়ববাদী সমালোচকের কাজ কী ? — আলোচনা করুন।

৪৭। বস্তুবাদী সাহিত্য বলতে কী বোঝেন।

৪৮। কয়েকজন বস্তুবাদী দার্শনিকের নাম করুন।

৪৯। বস্তুবাদী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরুন।

৫০। 'Critical realist' কথাটি কে ব্যবহার করেছেন ? 'Critical realist' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন ?

৫১। রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী সাহিত্যকে গ্রহণ করতে পারেননি কেন ?

৫২। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যকে' কীসের প্রকাশ বলে মনে করতেন ?

৫৩। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস্তববাদীদের বিরোধটা কোথায় বুঝিয়ে বলুন।

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. কাব্যতত্ত্ব; অ্যারিস্টটল; মূল গ্রীক থেকে বঙ্গানুবাদ - শিশিরকুমার দাস
2. 'Poetics' - L. Golden (translation)
3. An Essay of Dramatic Poesy - Dryden, (English Critical Texts.)
4. An Essay on Criticism - Alexander Poper (English Critical Texts.)'
5. শৈলী-বিজ্ঞান - ড. অপূর্ব কুমার রায়।
6. সাহিত্যবিচার ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ - ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়.
7. কাব্যজিজ্ঞাসা - অতুলচন্দ্র গুপ্ত
8. A Defence of poetry - Shelley
9. Biographia Literaria - Colridge
10. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিচার; দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা
11. সাহিত্য-বিবেক - ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।
12. গঠনবাদ ও উত্তর -গঠনবাদ এবং পাচ্য কাব্যতত্ত্ব; গোপিচাঁদ নারাঙ, (বঙ্গানুবাদ) সাহিত্য এ্যাকাডেমি, নতুন দিল্লি।
13. A Reader's Guide to Contemporary Literary theory; Seldon, Widderson and Brookar; Pearson Books.